তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম-১
২য় খন্ড

ছায়াশ্বাপদ

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ১৯৮৬

শেষ ডিসেম্বরের এক হিমেল সন্ধ্যা। প্যাসিও প্লেসে এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। হেঁটে যাচ্ছে একটা পার্কের পাশ দিয়ে। এই শীতেও মৌসুমের শেষ কয়েকটা গোলাপ ফুটে আছে। পার্কের পাশে একটা আস্তরবিহীন লাল ইঁটের বাড়ি, সেইন্ট জুডস রেকটরি—গির্জার যাজকদের বাসভবন। রেকটরির ওপাশে ছোট্ট গির্জা, ঘষা-কাচের ভেতর দিয়ে আলো আসছে। ভেতরে বাজছে অর্গান, কখনও উঁচু পর্দায় কখনও একেবারে খাদে নেমে যাচ্ছে সুর। অর্গানের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গলা, তালে তালে সুর করে পবিত্র শ্লোক আওড়াচ্ছে কবিতার মত।

রেকটরি আর গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ছিমছাম নীরব একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা, একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়িটার একপাশে রাস্তার সমতলে কয়েকটা গ্যারেজ। দ্বিতল বাড়ি, প্রতিটি জানালায় পর্দা, বন্ধ কাচের শার্সি। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদেরকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে যেন ভাড়াটেরা।

'এটাই,' বলল কিশোর পাশা, 'তিনশো তেরো নাম্বার, প্যাসিও প্লেস। এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি।'

গ্যারেজগুলোর ডানে পাথরের চওড়া সিঁড়ি, গেটের কাছে উঠে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল খাকি রঙের জ্যাকেট পরা একটা লোক। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালও না, পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সিঁড়িতে পা রাখল কিশোর। উঠতে শুরু করল। ঠিক পেছনেই রয়েছে মুসা আর রবিন।

হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা। লাফিয়ে সরে গেল একপাশে।

থেমে গেল কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, প্রায় উড়ে নিচে নেমে যাচ্ছে একটা কালো কিছু।

'বেড়াল,' সহজ গলায় বলল রবিন।

'প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিলাম!' কেঁপে উঠল মুসা। দু'পাশ থেকে স্কি-জ্যাকেটের দুই প্রান্ত টেনে এনে চেন তুলে দিল। 'কালো বেড়াল!'

হেসে ফেলল রবিন। 'তাতে কি? কুলক্ষণ ভাবছ নাকি?...এস।'

গেটের খিলের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। ওপাশে পাথরের বিরাট চত্বর। মাঝখানে বড় একটা সুইমিং পুল, ওটা ঘিরে লোহার চেয়ার-টেবিল সাজানো। চত্বরের চারপাশে লতাগুল্মের ঝাড়।

গেট খুলল কিশোর। এই সময় জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট, সুইমিং পুলের ভেতরে, লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে।

'এখানে কি চাই!' কিশোরের প্রায় কানের কাছে কথা বলে উঠল খসখসে নাকী একটা গলা।

গেটের পাশেই বাড়ির একটা দরজা খুলে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে এক মোটাসোটা মহিলা। লাল চুল। রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দার দিকে।

'ম্যাগাজিন বিক্রি করতে এসেছ?' আবার বলল মহিলা, 'চকলেট? নাকি সাহায্য চাইতে এসেছ ক্যানারি পাখির এতিম বাচ্চার জন্যে? তা যে-জন্যেই এসে থাক, বিদেয় হও। আমার ভাড়াটেদের বিরক্ত করা চলবে না।'

'মিসেস ডেনভার!'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল মহিলা। চত্বরের দিকে মুখ-করা একটা ব্যালকনি থেকে নেমে এসেছে সিঁড়ি। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ। 'মনে হয়, ওরাই আমার লোক।'

'আমি কিশোর পাশা,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। বয়েসের তুলনায় ভারিক্কি গলা, ভাবভঙ্গি। অপরিচিত কারও সঙ্গে এভাবেই কথা বলে সে। সমান্য পাশে সরে দুই সহকারীকে দেখিয়ে বলল, 'মুসা আমান, রবিন মিলফোর্ড। আপনিই মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক অলিভার?'

'হ্যাঁ,' বললেন বৃদ্ধ। দরজায় দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকালেন। 'আপনাকে দরকার নেই, মিসেস ডেনভার।'

'বেশ!' রাগ প্রকাশ পেল মহিলার গলায়। গটমট করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

'নাকা বুড়ি,' বিড়বিড় করলেন ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। 'ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না। ভেবে বোসো না, এ-বাড়ির সবাই এমনি। তা নয়। আর সবাই খুব ভাল। এস।'

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে ব্যালকনিতে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। কয়েক ফুট দূরে দরজা। তালা খুললেন মিস্টার অলিভার। ছেলেদেরকে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। ছাতের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে পুরানো আমলের বড় দামি ঝাড়বাতি। টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা কৃত্রিম ক্রিসমাস গাছ, চমৎকার করে সাজানো।

'বস,' কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন মিস্টার অলিভার। দরজা বন্ধ করে

তালা লাগিয়ে দিলেন।

'ঠিক সময়ে এসেছ,' বললেন বৃদ্ধ, 'ভাল। আর কোন কাজ নেই তো তোমাদের? মানে, ক্রিসমাস সপ্তাটা কাটানর জন্যে অন্য কোন প্ল্যান নেই তো?'

'কাজ আছে, তবে সময় বের করে নিতে পারব আমরা,' ভারিক্কি ভাবটা বজায় রাখল কিশোর। 'স্কুল খুলবে আগামী হপ্তায়। তার আগেই বেশ কিছু কাজ সেরে নিতে হবে। আপনাকে সময় দিতে পারব।'

কষ্ট করে হাসি চাপল মুসা। কি কাজ, খুব ভালই জানা আছে তার! কয়েকদিন ধরেই মেরিচাচী খুব খাটিয়ে মারছেন তিনজনকে, লোভনীয় পারিশ্রমিক দিচ্ছেন অবশ্যই। কিন্তু ওই একঘেয়ে কাজ আর ভাল লাগছে না তিন গোয়েন্দার। অথচ এমনভাবে বলছে কিশোর, যেন কি সাংঘাতিক জরুরি কাজ পড়ে আছে! নিজেদের দাম বাড়াচ্ছে আসলে।

'তো,' আবার বলল কিশোর, 'কি জন্যে ডেকেছেন? শুনি আগে সব, তারপর বলতে পারব, আমাদের দিয়ে সাহায্য হবে কি না।'

'হবে কিনা!' কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন অলিভার। 'হতেই হবে। মানে, সাহায্য করতেই হবে আমাকে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' হঠাৎ কেঁপে উঠল তাঁর গলা, তীক্ষ্ণ হয়ে এল। 'এখানে যা ঘটছে, আর সওয়া যাচ্ছে না!'

চুপ করলেন অলিভার। উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত করার চেষ্টা করছেন নিজেকে। 'তোমরা তিন গোয়েন্দা, না? এটা তোমাদের কার্ড?' ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরলেন। তাতে লেখাঃ

তিন গোয়েন্দা

? ? ?

প্রধানঃ কিশোর পাশা

সহকারীঃ মুসা আমান

নথিরক্ষক ও গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড

কার্ডটার দিকে একবার চেয়েই মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

'ডেভিস দিয়েছে আমাকে কার্ডটা,' বললেন অলিভার। 'চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। বলেছে, তোমরা গোয়েন্দা। বিশেষ করে, অদ্ভুত রহস্যের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ নাকি বেশি?'

'ঠিক,' স্বীকার করল কিশোর। 'প্রশ্নবোধকগুলো সে-জন্যেই বসিয়েছি। যতরকম আজব, উদ্ভট, অস্বাভাবিক রহস্য ভেদ করতে আগ্রহী আমরা। কয়েকটা রহস্যের সমাধানও করেছি। তো, আপনার অসুবিধেটা কি? না শুনে বলতে পারছি না, সাহায্য করতে পারব কিনা। তবে চেষ্টা অবশ্যই করব। ইতিমধ্যেই আপনার সম্পর্কে কিছু কিছু খোঁজখবর করেছি। আপনি কে, কি, জানা হয়ে গেছে আমাদের।'

'কি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। 'আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছ?'

'নিশ্চয়। মক্কেলের ব্যাপারে খোঁজ নেব না? আপনি কি বলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করে বসল কিশোর।

'আড়ালে থাকতেই পছন্দ করি আমি,' বললেন বৃদ্ধ। 'লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ভাল লাগে না।'

'পুরোপুরি আড়ালে কেউই থাকতে পারে না,' রবিনকে দেখিয়ে বলল কিশোর। 'কাগজপত্র ঘেঁটে লোকের পরিচয় বের করার ব্যাপারে ওর তুলনা নেই। রবিন, মিস্টার অলিভারকে বল কি কি জেনেছ।'

হাসল রবিন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে বটে কিশোর। মনে মনে বন্ধুর প্রতি আরেকবার শ্রদ্ধা জানাল গবেষক। পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই বের করে খুলল। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্ম আপনার, মিস্টার অলিভার! বয়স সত্তর চলছে। আপনার বাবা, মিস্টার হ্যারল্ড অলিভার, বিরাট বড়লোক ছিলেন। অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন আপনার নামে। বাপের সম্পত্তি নষ্ট করেননি আপনি, বহাল রেখেছেন ঠিকমতই। চিরকুমার রয়ে গেছেন। ভ্রমণে প্রচণ্ড নেশা, শিল্পের প্রতি বেজায় ঝোঁক। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন মিউজিয়ম আর দরিদ্র শিল্পীদের দান-খয়রাত করেন। "শিল্পের সমঝদার" বলে আখ্যায়িত করেছে আপনাকে খবরের কাগজগুলো।'

'বড় বেশি বাড়িয়ে লেখে ব্যাটারা,' গজগজ করলেন অলিভার। 'সেজন্যেই খবরের কাগজ নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।'

'কিন্তু ওরা আপনাকে নিয়ে ঘামায়,' বলল কিশোর। 'তবে, খুব বেশি বাড়িয়ে লিখেছে বলে তো মনে হয় না।' ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে রাখা শিল্পকর্মগুলো দেখাল সে।

বেশ বড়সড় একটা শো-কেস রয়েছে ঘরের এক প্রান্তে। তাতে নানারকম দামি সংগ্রহ। তাছাড়া দেয়ালে ঝুলছে চমৎকার সব চিত্র, টেবিলে চীনামাটির তৈরি অসংখ্য মূর্তি। এখানে ওখানে কায়দা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা প্রদীপ, নিশ্চয় ইংল্যাণ্ডের মূরদের কোন প্রাসাদ থেকে এসেছে।

'ওসব কথা থাক,' বললেন অলিভার। 'সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই, এর জন্যে অতিমানব হওয়ার দরকার পড়ে না। কিন্তু এখানে যা ঘটছে, ওসবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

'কি ঘটছে?' জানতে চাইল কিশোর।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালেন মিস্টার অলিভার। পাশের ঘরে তাঁর কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে, আশঙ্কা করছেন যেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ভূতের চোখ পড়েছে আমার ওপর!'

একদৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।

'বিশ্বাস করতে পারছ না?' আবার বললেন অলিভার, 'কিন্তু সত্যি বলছি, ভূতের চোখ পড়েছে। আমি বাইরে গেলেই কেউ একজন এসে ঢোকে এখানে। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে। যেটা যেখানে রেখে যাই, ফিরে এসে আর সেখানে পাই না। একবার দেখলাম, ডেস্কের ড্রয়ার খোলা। চিঠিপত্র অগোছাল।'

'অনেক বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আপনার,' বলল কিশোর। 'ম্যানেজার নেই? নিশ্চয় মাস্টার কী রয়েছে তার কাছে?'

নাক কোঁচকালেন অলিভার। 'ওই নাকা বুড়িটাই আমার ম্যানেজার। তবে চাবি নেই ওর কাছে। তাছাড়া আমার ঘরে বিশেষ তালা লাগিয়েছি। কোন চাকর-বাকর নেই। জানালা দিয়ে ঢোকে না কেউ, আমি শিওর। জানালা খোলা রেখে কখনও বেরোই না। আর খোলা রাখলেও ঢোকা সহজ না। রাস্তা থেকে বিশ ফুট ওপরে রয়েছে ওগুলো। উঠতে হলে উঁচু মই দরকার। এবং সেটা করতে গেলে লোকের চোখে পড়ে যাবেই সে।'

'হয়ত বাড়তি চাবি আছে কারও কাছে,' বলল মুসা। 'আপনি বেরিয়ে গেলেই তালা খুলে...'

হাত তুললেন অলিভার। 'না না, সেটা নয়। আগে শোন সবটা। বেরিয়ে গেলেই যে শুধু ঢোকে, তা নয়।' পুরো ঘরে চোখ বোলালেন তিনি, নিশ্চিত হয়ে নিলেন ছেলেরা ছাড়া আর কেউ নেই। 'কখনও...কখনও আমি ঘরে থাকলেও সে ঢোকে। আমি...আমি...দেখেছি।...ও আসে, যায়, দরজা খোলার দরকারই পড়ে না।'

'কেমন দেখতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

তালুতে তালু ডলছেন অলিভার। অস্বস্তি বোধ করছেন, বোঝা যাচ্ছে। 'পুলিশকে বললে তারাও এ প্রশ্নই করত,' মুখ তুললেন। 'তবে, আমার জবাব বিশ্বাস করত না তারা। সেজন্যেই তাদেরকে ডাকিনি, তোমাদেরকে ডেকেছি। আমি যাকে দেখেছি...সে মানুষ নয়, মানুষের ছায়া বললেই ঠিক হবে। বসে হয়ত কখনও পড়ছি, হঠাৎ অনুভব করি তার অস্তিত্ব। চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাই। একবার দেখেছি হলঘরে। লম্বা, রোগা টিঙটিঙে। কথা বললাম। কোন জবাব দিল না। শেষে চেঁচিয়ে উঠলাম। ফিরেও তাকাল না। সোজা ঢুকে পড়ল আমার কাজের ঘরে। পেছন পেছন গেলাম। নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'কাজের ঘরটা দেখতে পারি?' বলল কিশোর।

'নিশ্চয়। এস।'

মিস্টার অলিভারের পেছন পেছন ছোট একটা হলঘরে এসে ঢুকল কিশোর। ওটা পেরিয়ে এসে ঢুকল বড় আরেকটা ঘরে। ম্লান আলো জ্বলছে। অসংখ্য বুকশেলফ বইয়ে ঠাসা। বড় একটা পুরানো আমলের টেবিল। কয়েকটা চামড়ায় মোড়া পুরু গদিঢাকা চেয়ার। ঘরের এক প্রান্তের দেয়ালে কয়েকটা জানালা, ওটা

বাড়ির পেছন দিক। পর্দা ফাঁক করে তাকাল কিশোর। কাছেই গির্জাটা। অর্গান থেমে গেছে, ছেলেমেয়েদের গলাও কানে আসছে না আর। বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়।

'হলঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া এ ঘর থেকে বেরোনর আর কোন দরজা নেই,' বললেন অলিভার। 'কোনরকম গোপন প্রবেশ পথ নেই। বহু বছর ধরে আছি এ-বাড়িতে, তেমন কোন পথ থাকলে আমার অন্তত অজানা থাকত না।'

'কতদিন ধরে ঘটছে এটা?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'এই যে ছায়ার উপস্থিতি?'

'কয়েক মাস। প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইনি। ভেবেছি, ওসব আমার কল্পনা। কিন্তু আজকাল এত বেশি ঘটছে, আর ওটাকে কল্পনা বলে মেনে নিতে পারছি না।'

অলিভারের দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ছায়ার উপস্থিতি সত্যিই বিশ্বাস করছেন বৃদ্ধ। 'অনেক অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে এ-পৃথিবীতে!' আপন মনেই বিড়বিড় করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'তাহলে কেসটা নিচ্ছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। 'তদন্ত করছ এ-ব্যাপারে?'

'অ্যাঁ!' চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। 'ও হ্যাঁ...আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এখুনি কোন কথা দিতে পারছি না। আগামীকাল সকালে জানাব আপনাকে।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন বৃদ্ধ। এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। বেরিয়ে গেলেন।

এগোতে গিয়েও দ্বিধা করল কিশোর। পা বাড়িয়ে থেমে গেল হঠাৎ। ঘরের ছায়াঢাকা কোণে একটা বুকশেলফের পাশে নড়ে উঠেছে কিছু!

হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোর। 'মুসা!'

'আমাকে ডাকছ?' হলঘর থেকে মুসার কথা শোনা গেল।

'মুসা!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। লাফ দিয়ে এগোল সুইচবোর্ডের দিকে।

এক সেকেণ্ড পরেই মাথার ওপরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। অন্ধকার দূর হয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মুসার কথা, 'কি হল?'

'তুমি...তুমি ওঘরে ছিলে, যখন আমি ডেকেছিলাম!' প্রায় ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ। কেন? ভূত দেখেছ বলে মনে হচ্ছে?'

'মনে হল তোমাকে দেখলাম!' আঙুল তুলে ঘরের কোণ দেখাল কিশোর। 'ওখানে। তুমিই যেন দাঁড়িয়েছিলে!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'হয়ত চোখের ভুল! বুকশেলফের ছায়াই দেখেছি!' বিমূঢ় মুসার পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে চলে এল সে।

বসার ঘরে এসে ঢুকল কিশোর। 'আগামীকাল অবশ্যই যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে,' কিশোরের দিকে না চেয়েই বললেন মিস্টার অলিভার। দরজার তালা খুললেন। পাশে সরে ছেলেদেরকে বেরোনর জায়গা করে দিলেন।

হঠাৎই কানে এল তীক্ষ্ণ শব্দটা। গাড়ির ইঞ্জিনের মিসফায়ারের মত। গুলির শব্দ?

প্রায় লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এল মুসা। ব্যালকনির রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়াল। নিচে শূন্য চত্বর। বাড়িটার পেছনে শোনা যাচ্ছে লোকের চিৎকার। জোরে গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল, পাথরের কোন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে এখান থেকে। বাড়ির পাশের সরু একটা গলিপথ দিয়ে ছুটে চত্বরে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি। গায়ে কালো উইণ্ডব্রেকার, কালো স্কি-হুডে ঢাকা মাথা। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল।

সিঁড়িগুলো যেন উড়ে টপকালো মুসা। গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সবে পথে নেমেছে, সামনে এসে দাঁড়াল একজন পুলিশ। চত্বরের একপাশ ঘুরে বেরিয়ে এসেছে।

'ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে!' বলল পুলিশ। 'থাম এবার, দোস্ত। নইলে গুলি খাবে।'

চত্বরের একই পাশ দিয়ে আরেকজন পুলিশ বেরিয়ে এল। ওর হাতেও রিভলভার। মুসা দেখল, দুটো নলই চেয়ে আছে ওর দিকে। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে। ধীরে, অতি ধীরে মাথার ওপর তুলে আনছে দুই হাত।

দুই

'ডিক,' বলল প্রথম পুলিশটা, দু'জনের মাঝে তার বয়েস কম। 'আমার মনে হয় ও না!'

'কালো উইণ্ডব্রেকার, হালকা রঙের ট্রাউজার!' মুসার আপাদমস্তক দেখছে দ্বিতীয় পুলিশ। 'হয়ত স্কি-হুডটা খুলে ফেলে দিয়েছে!'

'ওই লোকটার কথা বলছেন?' বলল মুসা। 'এদিক দিয়েই গেছে সে। গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছিল, আমি দেখেছি।'

কিশোর আর রবিন পৌঁছে গেল। তাদের পেছনে দাঁড়ালেন মিস্টার অলিভার।

'কাকে আটকেছেন আপনারা?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন বৃদ্ধ। 'গত আধঘন্টা ধরে আমার ঘরে ছিল ছেলেটা।'

সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। ছুটে আসছে পুলিশ পেট্রলকার।

'এস, ডিক,' বলল তরুণ পুলিশ অফিসার। 'খামোকা সময় নষ্ট করছি

এখানে। দুঃখিত, মিস্টার অলিভার।'

ছুট লাগাল আবার পুলিশ দু'জন। ঠিক এই সময় খুলে গেল মিসেস ডেনভারের দরজা।

'মিস্টার অলিভার,' নাকী গলা শোনা গেল, 'কি অঘটন ঘটিয়েছে ছেলেগুলো?'

চত্বরের ডানে আরেকটা ঘরের দরজা খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে এল এক তরুণ। চোখ ডলছে, সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হয়। ওর দিকে চেয়ে একটু যেন চমকে উঠল কিশোর।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'কি ব্যাপার?'

'কিছু না,' চাপা গলায় বলল কিশোর। 'পরে বলব।'

'মিস্টার অলিভার,' ঝাঁঝ প্রকাশ পেল মিসেস ডেনভারের গলায়, 'আমার কথার জবাব দেননি! কি করেছে?'

'সেটা আপনার ব্যাপার নয়!' ধমকে উঠলেন অলিভার। কথাটা বেশি কড়া হয়ে গেছে বুঝে স্বর নরম করলেন। 'ওরা কিছু করেনি। কাকে যেন খুঁজছে পুলিশ! বাড়ির পেছন থেকে এসে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। ধাওয়া করে এসেছে পুলিশ!'

'চোর ছ্যাঁচোড় হবে,' পেছন থেকে বলে উঠল তরুণ। পরনে কালো সোয়েটার, হালকা বাদামি ট্রাউজার। পায়ে চপ্পল।

খুঁটিয়ে দেখছে ওকে কিশোর। রোগাপাতলা লোকটা, মাথায় কালো চুল, কতদিন আগে ধুয়েছে, কে জানে! তবে খুব শিগগির নয়। মুসার মতই লম্বা, তবে অনেক রোগা।

'বাহ্, বেশ বুদ্ধি তো তোমার, টম!' মুখ বাঁকাল মিসেস ডেনভার। 'কি করে জানলে, চোর-ছ্যাঁচোড়কে খুঁজছে পুলিশ?'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল টমি গিলবার্ট। ঢোক গিলল। গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপরে উঠে আবার নেমে পড়ল কণ্ঠ। 'চোর-ছ্যাঁচোড় ছাড়া আর কে হবে?'

'ছড়িয়ে পড়!' বড় রাস্তার দিক থেকে চিৎকার শোনা গেল। 'গলিপথগুলো আটকাও! গির্জার ভেতরে দেখ!'

গোটা চারেক পেট্রলকার দেখা গেল রাস্তার মোড়ে। নাচানাচি করছে টর্চের আলো। প্রতিটি কোণ, গলিঘুপচি, ঝোপঝাড়ের ভেতর উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রচণ্ড শব্দ তুলে মাথার ওপরে চলে এল একটা হেলিকপ্টার, ঘুরে ঘুরে চক্কর দিতে শুরু করল পুরো এলাকাটায়। সার্চলাইটের আলো ফেলে খুঁজছে লোকটাকে। পথে, বাড়ির দরজায় বেরিয়ে এসেছে কৌতূহলী লোকজন।

'বেশি দূরে যেতে পারেনি,' বলে উঠল একজন পুলিশ। 'নিশ্চয় এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে।'

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা একজন লোক। মাথায় ধূসর ঘন চুল।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। এগিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গেটের দিকে। 'ফ্র্যাঙ্ক।' ডাকল লোকটা। ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।'

এগিয়ে গেলেন অলিভার। তাঁর হাত ধরল লোকটা। নিচু গলায় বলল কি যেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন অলিভার। ভুলেই গেছেন যেন ছেলেদের উপস্থিতি।

কনুই দিয়ে কিশোরকে খোঁচা লাগাল মুসা। 'চল, দেখি গির্জায় কি করছে পুলিশ!'

অনেকেই এগিয়ে যাচ্ছে গির্জার দিকে। তিন গোয়েন্দাও এগোল।

ইতিমধ্যেই গির্জার চত্বরে ভিড় জমিয়েছে অনেক লোক, তাদের মাঝে মিসেস ভেনভারও আছে। খোলা দরজা দিয়ে সবাই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ভেতরে খোঁজাখুঁজি করছে দু'জন পুলিশ। কোথাও বাদ দিচ্ছে না ওরা। নুয়ে পড়ে বেঞ্চগুলোর তলায়ও দেখছে।

জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেল কিশোর। গির্জার সিঁড়ির দুটো ধাপ উঠল। তাকাল ভেতরে। বেদিতে জ্বলছে সারি সারি লাল নীল সবুজ মোমবাতি, খানিক আগে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার সাক্ষী। বেশ কিছু স্থির মূর্তি চোখে পড়ল তার। স্ট্যাচু। দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ছোট নিচু বেদিতে, মেঝেতে, ঘরের কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। একগাদা ছোট পুস্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটেখাট মোটা এক লোক, লাল মুখ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ সার্জেন্ট।

'আমি বলছি, কেউ ঢোকেনি এখানে,' বলল মোটা লোকটা। 'সারাক্ষণ এখানে ছিলাম আমি। কেউ ঢুকলে অবশ্যই দেখতে পেতাম।'

'তা হয়ত পেতেন,' চেঁচিয়ে বলল সার্জেন্ট। 'দয়া করে বেরিয়ে যান এখন। ভাল করে খুঁজব আমরা।' ফিরে তাকাল সে। কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই বলল, 'এখানে কি করছ, খোকা? যাও।'

পুস্তিকা হাতে বেরিয়ে এল মোটা লোকটা। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি থেকে নেমে পড়ল কিশোর।

জনতার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন এখন রোগাপাতলা, মাঝবয়েসী একজন লোক। গায়ে কালো আলখেল্লা, সাদা কলার, পাদ্রীর পোশাক। তাঁর সঙ্গে রয়েছে এক বেঁটে মহিলা। ধূসর চুল ঘাড়ের ওপর পরিচ্ছন্ন করে বাঁধা। পোশাকেই বোঝা যায়, গির্জায় কাজ করে।

'ফাদার স্মিথ!' চেঁচিয়ে উঠল পুস্তিকা-হাতে লোকটা। 'ওদেরকে বলুন আপনি। সারাক্ষণ গির্জায় ছিলাম আমি। আমার চোখ এড়িয়ে কারও পক্ষে ঢোকা সম্ভব ছিল না।'

'আহ্‌, চুপ কর, পল!' বিরক্ত গলায় বললেন ফাদার। 'খুঁজুক না ওরা, তোমার কি?'

'কি বললেন?' কানের ওপর হাত রেখে ফাদারের দিকে চোখ ফেরাল পল।

'খুঁজুক ওরা!' চেঁচিয়ে বললেন ফাদার। 'কোথায় ছিলে তুমি?'

'চিলেকোঠায় উঠেছিলাম, পুস্তিকা পাড়তে।'

'তাহলে তো হয়েছেই!' হেসে ফেলল ধূসর-চুল মহিলা। 'গির্জার ভেতরে হাজারখানেক হাতি ঢুকে দাপাদাপি করলেও ওখান থেকে শুনতে পাবে না তুমি। রোজই বলছি ডাক্তার দেখাও, কানের ব্যামো সারাতে পার কিনা দেখ। তবে দেখালেও সারবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

জনতার ভেতর থেকে হেসে উঠল কেউ।

'মিসেস ব্রাইস,' শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন পাদ্রী, 'ইচ্ছে করে কেউ বধির হতে চায় না। ওভাবে কারও সম্পর্কে কথা বলা উচিত নয়। এস, রেকটরিতে যাই। চা খেতে ইচ্ছে করছে। পল, তুমিও চল। পুলিশের খোঁজা শেষ হলে এসে দরজায় তালা লাগিও। এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই।'

সরে পথ করে দিল জনতা। পাশের আস্তরবিহীন বাড়িটার দিকে চলে গেলেন ফাদার, পল আর ব্রাইস।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসল জনতার একজন। 'তোমরা কি এদিকেই কোথাও থাক?' ফিরে এসেছে হেলিকপ্টার, প্রচণ্ড শব্দ। জোরে কথা বলতে হচ্ছে লোকটাকে।

'না,' জবাব দিল রবিন।

'তাহলে জান না, মজার সব লোক বাস করে ওখানে,' রেকটরির দিকে ইঙ্গিত করে বলল লোকটা। 'পল মিনের ধারণা, গির্জাটা সে-ই চালাচ্ছে। তামারা ব্রাইস মনে করে, সে না থাকলে বন্ধই হয়ে যেত গির্জা। অথচ একজন দারোয়ান, আরেকজন হাউসকিপার! ওদের দু'জনকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যান ফাদার স্মিথ।'

'ঠিকই,' লোকটার কথায় সায় দিল এক মহিলা। 'ফাদারকে জ্বালিয়ে মারে ওরা। আইরিশ মেয়েমানুষটা ভাবে, সে-ই গির্জার সব। আরও দোষ আছে ওর। প্রায়ই ভূত দেখে গির্জার ভেতরে। তার ধারণা, অন্ধকার জায়গা মানেই ভূতের আস্তানা। আর ওই দারোয়ানটা, পল, সে তো ভাবে, সে না থাকলে ধসেই পড়ে যেত গির্জাটা।'

গির্জা থেকে কনস্টেবল দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট। চত্বরে দাঁড়ানো জনতার ওপর চোখ বোলাল একবার। 'এখানকার চার্জে রয়েছেন কে?'

'তিনি চা খেতে গেছেন রেকটরিতে,' বলল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলছিল যে লোকটা। 'দাঁড়ান, ডেকে আনছি।'

শেষবারের মত মাথার ওপর চক্কর দিয়ে গেল পুলিশ হেলিকপ্টার। চলে গেল উত্তরে।

মিস্টার অলিভার আর তাঁর মোটা সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল লেফটেন্যান্ট, এগিয়ে এল।

'গির্জার ভেতরে নেই,' জানাল সার্জেন্ট।

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি পালাল কি করে? হেলিকপ্টারের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল! নাহ্, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আজ রাতে আর কিছুই করার নেই আমাদের, সার্জেন্ট।'

প্রায় ছুটতে ছুটতে এল পল। ছুটে গেল গির্জার দিকে। দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

কয়েক মিনিট পর, পুলিশের গাড়িগুলো চলে গেল। একে একে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল জনতা।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। গেটের কাছে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটার সঙ্গে এখনও কথা বলছেন মিস্টার অলিভার।

'মিস্টার অলিভার,' বলল কিশোর। 'আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলাম না-তো?'

'না না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন অলিভার। তাঁর সঙ্গীর দিকে কিশোরকে তাকাতে দেখে বললেন, 'ও, এ হল মিকো, মিকো ইলিয়ট। কি হয়েছিল, ওর কাছেই জানলাম।'

'আমার ভাইয়ের ঘরে চোর ঢুকেছিল,' তিন গোয়েন্দাকে জানাল মিকো। 'লুকান কোর্টে তার বাসা। এই রাস্তার পরের রাস্তাটাই।'

'সত্যিই, মিকো,' বললেন অলিভার। 'আমারই খারাপ লাগছে, তোমার তো লাগবেই।'

'লাগারই কথা,' মাথা ঝোঁকাল মিকো। 'যাকগে, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। যাই। সকালে দেখা হবে।'

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের চত্বরে উঠে পড়ল মিকো। বাড়ির পাশের সরু পথ ধরে হেঁটে চলে গেল পেছনে।

ধপ করে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লেন অলিভার। হতাশ। 'কি সর্বনাশ করেছে, কে জানে!'

'কি? চুরি?' জানতে চাইল রবিন।

'মিকোর ভাই জ্যাক ছিল আমার বন্ধু,' জানালেন মিস্টার অলিভার। 'আমার বন্ধু, গুরু এবং মস্তবড় শিল্পী। হপ্তা দুয়েক আগে মারা গেছে, নিউমোনিয়ায়।'

চুপ করে আছে ছেলেরা।

'বড় রকমের ক্ষতি,' আবার বললেন অলিভার। 'বিশেষ করে আমার জন্যে,

শিল্পরসিকদের জন্যে। তার ঘরে চোর ঢোকাটা···নাহ্, ভারি খারাপ কথা!'

'কিছু চুরি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এখনও জানে না মিকো। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে দেখবে আজ রাতেই।'

পায়ের শব্দ হল। ফিরে তাকাল রবিন আর মুসা। হাসিখুশি একটা লোক আসছে। গায়ে ধূসর রঙের পশমী-সোয়েটার। বলিষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ। কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। 'কি ব্যাপার?'

'পড়শীর বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, মিস্টার জ্যাকবস,' বললেন অলিভার। 'পুলিশ এসেছিল।'

'তাই,' বলল আগন্তুক। 'সে-জন্যেই কয়েকটা স্কোয়াড-কারের আওয়াজ শুনলাম। চোর ধরতে পেরেছে?'

'নাহ্!'

'খুব খারাপ কথা,' বলল জ্যাকবস। অলিভারের পাশ কাটিয়ে সিঁড়িতে উঠে পড়ল। গেট পেরিয়ে ঢুকে গেল চত্বরে। খানিক পরেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের একটা দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল।

'আমিও যাই,' বললেন অলিভার। যেন খুব দুর্বল লাগছে, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ, আগামীকাল সকালেই তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিও। এসব আর সইতে পারছি না। প্রথমে ভূত, তারপর ড্যাকের মৃত্যু, এখন এই চোর! আমার মত বুড়োর জন্যে অনেক বেশি হয়ে গেছে!'

তিন

পরদিন, খুব ভোরে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে এসে হাজির হল রবিন আর মুসা।

ডিসেম্বরের এই হিমেল সকালে একজন খদ্দেরও নেই ইয়ার্ডে। কেমন যেন মৃত মনে হচ্ছে নির্জন, বিশাল, বাতিল মালের ডিপোটাকে। মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও।

বড় করে হাই তুলল মুসা। 'মাঝে মাঝে মনে হয়, কিশোর পাশার সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলেই ভাল হত। সক্কাল বেলা, এখনও কাকপক্ষী ওঠেনি, ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনল! ক'টা বাজে? বড় জোর ছ'টা।'

'না এলেই পারতে,' বলল রবিন। 'কিশোর তো তোমাকে জোর করেনি। নিশ্চয় জরুরি কোন ব্যাপার আছে, নইলে এভাবে ডেকে পাঠাত না।'

ইয়ার্ডের বড় লোহার গেটটা আবার বন্ধ করে দিল ওরা। এগোল।

দুই সুড়ঙ্গের কাছে চলে এল। বিশাল গ্যালভানাইজড পাইপের মুখ থেকে লোহার পাতটা সরিয়ে ঢুকে পড়ল রবিন। পেছনে ঢুকল মুসা। ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে আবার জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিল পাতটা।

হামাগুড়ি দিয়ে এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা।

'এত দেরি করলে কেন?' দেখেই বলে উঠল কিশোর।

রবিন জবাব দিল না।

গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। 'দেরি? ঘুম থেকে উঠেই তো ছুট লাগালাম। দাঁত মাজার সময়ও পাইনি। খাওয়া তো দূরের কথা।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'তা ভোররাতে এই জরুরি তলব কেন? হাতে ওটা কিসের জার? ব্যাঙ-ট্যাঙ ধরে ভরেছ?'

দু'আঙুলে ধরে আছে কিশোর চীনামাটির ছোট একটা জার। মুখ খোলা। সামান্য একটু কাত করল। ভেতরে সাদা পাউডার দেখতে পেল মুসা আর রবিন।

'ম্যাজিক পাউডার,' বলল কিশোর।

ধপ করে একটা আধপোড়া চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। একটা ফাইল কেবিনেটে কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল। 'ওভাবে রহস্য করে যখন কথা বল না, বড় বিরক্ত লাগে! ওই পাউডার দেখানর জন্যে কম্বলের তলা থেকে তুলে এনেছ?'

জবাব দিল না কিশোর। হাতের কাছের তাক থেকে একটা ফ্লাস্ক নামাল। মুখ খুলে কয়েক ফোঁটা পানি ঢেলে দিল পাউডারে। ছোট একটা প্লাস্টিকের চামচ নিয়ে নাড়তে শুরু করল। 'এটা এক ধরনের স্ফটিকের গুঁড়ো, মেটালিক কম্পাউণ্ড। অনেক পুরানো আমলের একটা অপরাধ বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি এটার কথা। পানিতে গলে যায় এই পাউডার।'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'কেমিস্ট্রির ওপর লেকচার দিতে ডেকেছ নাকি?'

'শুনে যাও,' ড্রয়ার খুলে টুথপেস্টের টিউবের মত একটা টিউব বের করল কিশোর। মুখ খুলে টিপ দিতেই টুথপেস্টের মতই সাদা জিনিস বেরোল। খানিকটা ফেলল জারে। তারপর মুখ বন্ধ করে রেখে দিল ড্রয়ারে। চামচ দিয়ে জোরে জোরে নেড়ে পাউডারের সঙ্গে মেশাতে লাগল পানি আর পেস্ট। 'এক ধরনের মলম তৈরি করছি।'

'কপালে লাগাবে? মস্তিষ্ক বিকৃতির ওষুধ?' হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কি জিনিস বানিয়েছে। পানি, পেস্ট আর পাউডার মিলে চমৎকার এক ধরনের ক্রীমমত তৈরি হয়েছে। 'ব্যস, এতেই চলবে।' ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিল জারের মুখ। 'এখন আমাদের কাছেও আছে ম্যাজিক অয়েন্টমেন্ট।'

'তাতে কি?' কৈফিয়ত চাওয়ার মত করে বলল মুসা।

'ধর, কোথাও এই মলম মাখিয়ে দিলাম,' বলল কিশোর। 'মিস্টার অলিভারের ডেস্কের কথাই ধর। ড্রয়ারের হাতলে লাগাতে পারি, ওটা চীনামাটির তৈরি। পাতলা করে মাখলে দেখা যাবে না। হাতল ধরলেই মলম লেগে যাবে হাতে। আধঘন্টা পর কালো কালো দাগ পড়ে যাবে লোকটার আঙুলে। হাজার ধুয়েও

পুরোপুরি তোলা যায় না ওই দাগ, অন্তত কয়েকদিন তো নয়ই।'

'অ, এই ব্যাপার,' চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেলল রবিন। 'তাহলে কেসটা নিচ্ছি আমরা?'

'গত রাতেই ফোন করেছিলেন, মিস্টার অলিভার,' বলল কিশোর। 'জানিয়েছেন, তিনি ঘুমোতে পারছেন না। আমরা চলে আসার পর কয়েকবার নাকি ওই ভূতটা ঢুকেছিল তাঁর ঘরে। অস্তিত্ব টের পেয়েছেন, ছায়াটা দেখেছেন। ভয় পাচ্ছেন তিনি।'

'ইয়াল্লা! কিশোর, ওই লোকটার মতিভ্রম ঘটেছে,' বলে উঠল মুসা। 'ওর জন্যে আমাদের কিছুই করার নেই।'

'হয়ত,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। নিঃসঙ্গ লোকের বেলায় এটা বেশি ঘটে। অনেক উদ্ভট কল্পনা আসে মাথায়, একসময় সেটাকে বাস্তব বলে ধরে নেয়। এজন্যেই কেসটা নিতে দ্বিধা করেছিলাম কাল। কিন্তু, পুরো ব্যাপারটা তদন্ত না করেই যদি সরে আসি, মানুষটার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। একটা কথা তো ঠিক, পুলিশকে বললে বিশ্বাস করবে না তাঁর কথা। বড় কোন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে যেতে পারেন, কিন্তু তারাও বিশ্বাস করবে না। যদি সত্যিই পুরো ব্যাপারটা তাঁর কল্পনা হয়ে থাকে, আমাদের কিছুই করার নেই। কিন্তু কোন বদলোকের শয়তানীও হতে পারে এটা। তাহলে ধরতে হবে লোকটাকে। মিস্টার অলিভারকে এই মানসিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। একে একে দুই সঙ্গীর দিকেই তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কি বল? ওঁকে বলব, আমরা আসছি?'

রবিন হাসল। 'খামোকা জিজ্ঞেস করছ কেন আমাদেরকে? জবাবটা তো তুমি জানই।'

'গুড,' বলল কিশোর। 'ইস্‌স্‌, একটা মাস ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল। গাড়িটা থাকলে কি ভালই না হত...'

'ওটা তো প্রায় ব্যবহারই করতে পারলাম না আমরা,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। 'বাইরে বাইরেই কাটালাম। সত্যি একটা গাড়ি থাকলে...'

'নেই যখন, ভেবে আর কি লাভ?' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'সকাল সাতটায় লস অ্যাঞ্জেলেসের বাস, রকি বীচ থেকে ছাড়ে, খোঁজ নিয়েছি। ওটাই ধরব আমরা। চাচী ওঠেনি এখনও। একটা চিঠি লিখে রেখে যাব।'

'আমি যাচ্ছি না,' গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল মুসা।

'যাচ্ছ না মানে!' প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর আর রবিন।

'কিছু না খেয়ে এক কদম নড়ছি না আমি এখান থেকে। এত সকালে গরম গরম না পাওয়া যাক, বাসি পান্তা হলেও চলবে...'

হেসে ফেলল অন্য দু'জন।

'বেশ,' হাসতে হাসতে বলল কিশোর। 'চল। রান্নাঘর থেকে ঠাণ্ডা স্যাণ্ডউইচ

নিয়ে নেব। গতরাতে ইয়া বড় এক কেক বানিয়েছেন চাচী। অর্ধেকটা মেরে দেব আমরা। চলবে?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। দুই নাম্বার সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল সবার আগে।

চার

আটটা নাগাদ উইলশায়ারে বাস থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। কাছেই প্যাসিও প্লেস। হেঁটেই চলল ওরা।

রেকটরির সামনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেইন্ট জুডস গির্জার যাজক ফাদার স্মিথ। তিন গোয়েন্দাকে দেখে মৃদু হাসলেন। মাথা সামান্য নুইয়ে 'গুড মর্নিং' বললেন।

ছেলেদের আশঙ্কা ছিল, মিসেস ডেনভারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। হল না। নিরাপদেই সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে এল ওরা। দরজা বন্ধ। টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা কাগজ। তাতে লেখাঃ ছেলেরা আমি ২১৩, লুকান কোর্টে গেলাম। ওখানেই পাবে আমাকে। এই বাড়ির ঠিক পেছনের বাড়িটাই। পাশের সরু পথটা পেরোলেই ওটার সামনের দরজায় পৌঁছে যাবে। তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।—ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।

কাগজটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল কিশোর। 'ওই বাড়িতেই চোর ঢুকেছিল গতরাতে।'

'অ্যাই, তোমরা ওখানে কি করছ?' নারী একটা কণ্ঠ।

ঝট্ করে ফিরল তিন গোয়েন্দা। নিচে তাকাল। নিচের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস ডেনভার। পরনে ড্রেসিং গাউন। লাল চুল এলোমেলো।

ছেলেরা চাইতেই জিজ্ঞেস করল মহিলা, 'মিস্টার অলিভার আছেন ঘরে?'

'মনে হচ্ছে না,' জবাব দিল কিশোর।

'এই সকাল বেলায় কোথায় বেরোলেন!' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মিসেস ডেনভার।

জবাব দিল না তিন গোয়েন্দা। নামতে শুরু করছে সিঁড়ি বেয়ে। মিসেস ডেনভারের দিকে ফিরেও তাকাল না ওরা। পাশের সরু পথটা ধরে এগোল। একটা লণ্ড্রি আর একটা স্টোর রুম পেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল পাশের গলিতে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের এক কোণে একটা ডাস্টবিন। পথের ওপাশে আরেকটা বাড়ি, দরজাটা গলি পথের দিকে ফেরানো।

গেটেই তামার ফলকে লেখা রয়েছেঃ ২১৩, লুকান কোর্ট। একতলা, প্রায় স্কয়ার সাইজের ছোট একটা বাড়ি।

ঘন্টা বাজাল মুসা। খানিক খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে মিকো ইলিয়ট।

কেমন যেন উদভ্রান্ত চেহারা।

'এস,' একপাশে সরে ঢোকার জায়গা করে দিল মিকো।

শোবার ঘর আর স্টুডিওর মিশ্রণ বলা যায় এমন একটা ঘরে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সিলিংয়ে স্কাইলাইট। কার্পেট নেই মেঝেতে, আসবাবপত্রও খুব সামান্য। বড়সড় একটা ড্রইং টেবিল আর একটা ইজেল রাখা আছে এক জায়গায়। নানা রকম ছবি আর স্কেচ ঝুলছে দেয়ালে, আস্তরই দেখা যায় না প্রায়। যেখানে সেখানে বইয়ের স্তূপ। ছোট্ট একটা টেলিভিশন, বড়সড় দামি একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর একগাদা রেকর্ড অযত্নে পড়ে আছে।

বড়সড় একটা ডিভানে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মিস্টার অলিভার। মুখচোখ শুকনো। নিজেকে শান্ত রাখার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি, দেখেই বোঝা যায়। ছেলেদেরকে 'গুড মর্নিং' জানালেন। বললেন, 'আরও একটা রহস্য যোগ হয়েছে। গতরাতে চোর ঢুকেছিল এ বাড়িতে। সর্বনাশ করে গেছে আমার।'

'ভেবে আর কি করবে, ফ্র্যাঙ্ক,' সান্ত্বনা দিল মিকো। 'এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা। পুলিশ তাড়া না করলে আরও কিছু নিয়ে যেত ব্যাটা।' ছেলেদের দিকে ফিরল সে। 'ফ্র্যাঙ্কের কাছে শুনলাম, তোমাদের নাকি গোয়েন্দা হওয়ার শখ। এখানে তেমন রহস্যজনক কিছু পাবে বলে মনে হয় না। রান্নাঘরের জানালা খুলে ঢুকেছিল চোর। গ্লাস-কাটার দিয়ে কাচ কেটে ভেতরে হাত ঢুকিয়েছে। খুলে ফেলেছে ছিটকিনি। তারপর হাউণ্ডটা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। খুব সাধারণ চুরি।'

'কিন্তু শুধু হাউণ্ডটাই নিয়ে গেছে ব্যাটা!' বলে উঠলেন অলিভার।

'ওতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, পুলিশের তাই ধারণা,' বলল মিকো। 'তাছাড়া ওটা ছাড়া ঘরে মূল্যবান আর কিছু নেইও। টেলিভিশনটা, মাত্র ন ইঞ্চি স্ক্রীন, কোন দামই নেই ওটার। রেকর্ড প্লেয়ারের বডি আর স্পীকারের ফ্রেমে আমার ভাইয়ের নাম খোদাই করা আছে। নিয়ে গেলেও বিক্রি করতে পারত না ওটা। এছাড়া নেবার মত আর কি আছে? জানই তো খুব সাধারণ জীবনযাপন করত আমার ভাই।'

'অনেক বড় শিল্পী ছিল ও,' অলিভারের কণ্ঠে গভীর শ্রদ্ধা। 'বেঁচে ছিল শুধু শিল্পসৃষ্টি নিয়েই। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল থাকলে তো!'

'হাউণ্ডটা কি জিনিস?' জানতে চাইল মুসা।

মৃদু হাসল মিকো। 'একটা কুকুরের মূর্তি। এমন একটা কুকুর, যার কোন অস্তিত্ব নেই। বেঁচে আছে শুধু কুসংস্কারে বিশ্বাসী কিছু মানুষের মনে। খুব রোমাঞ্চপ্রিয় ছিল আমার ভাই, রোমান্টিকতা ফুটিয়ে তুলেছে তার প্রতিটি শিল্পকর্মে। ভূতুড়ে কুকুরের কাহিনী নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে তেমনি একটা কুকুরের কাহিনী শোনা যায়।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'জায়গাটার নাম ট্রানসিলভানিয়া। ব্রাম

ট্রোকারের ড্রাকুলা ওখানেই বাস করত।'

'ঠিক,' বলল মিকো। 'কিন্তু ওই কুকুরটা রক্তচোষাও না, মায়ানেকড়েও না। ওই গাঁয়ের লোকের ধারণা, ওটা আসলে এক জমিদারের প্রেতাত্মা, কুকুরের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ-সম্পর্কে চমৎকার একটা গল্পও আছে। ওই জমিদার ছিল দুর্ধর্ষ শিকারী, একপাল ভয়ঙ্কর আধাবুনো কুকুর ছিল তার। নেকড়ের রক্ত ছিল কুকুরগুলোর শিরায়। জানোয়ারগুলোকে সব সময় তৎপর রাখার জন্যে পুরোপুরি খেতে দিত না লোকটা। একদিন, পেটে খিদে নিয়ে কি করে জানি খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা কুকুর।'

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রবিন।

'হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ল। তারপর ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। এটা কিন্তু সত্যি, বানানো নয়। একটা শিশুকে খুন করে বসল কুকুরটা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জমিদারের কাছে ছুটে এল সন্তানহারা পিতা। সবগুলো নেকড়ে-কুকুরকে মেরে ফেলার দাবি জানাল। প্রত্যাখ্যান করল জমিদার। উল্টে, টিটকিরি দিয়ে বলল, চাইলে শিশুটার বিনিময়ে কয়েকটা পয়সা দিতে পারে সে বাপকে। আর রাগ সামলাতে পারল না বাবা। বিশাল এক পাথর তুলে নিয়ে আক্রমণ করল জমিদারকে। মারা গেল জমিদার। মৃত্যুর আগে অভিশাপ দিয়ে গেলঃ আবার সে আসবে গাঁয়ে, অন্য রূপে। গাঁয়ের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

'তারপর নিশ্চয় কুকুর হয়ে ফিরে এসেছিল লোকটা?' বলল মুসা।

'হ্যাঁ। এক বিশাল হাউণ্ড,' আগের কথার খেই ধরল মিকো, 'জমিদারের সবক'টা কুকুরকে মেরে ফেলল গাঁয়ের লোকজন। তারপর, এক অন্ধকার দুর্যোগের রাতে ঘটল ঘটনা। বিরাট এক কুকুরকে দেখা গেল গাঁয়ের পথে। গোঙাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই হাঁক ছাড়ছিল ক্ষুধার্ত কণ্ঠে। চামড়ার ওপর দিয়ে পাঁজরার হাড় গোনা যাচ্ছিল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল লোকেরা। দু'একজন দুঃসাহসী লোক খাবার এনে রাখল কুকুরটার সামনে। কিন্তু ছুঁলোও না হাউণ্ডটা। কারও কোন ক্ষতিও করল না। এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যার রাতেই নাকি ফিরে আসতে লাগল কুকুরটা। লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালাল। আজও নাকি দেখা দেয় ওই কুকুর। পোড়ো গ্রামটায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার রাতে, হাঁক ছাড়ে ক্ষুধার্ত গলায়। হতে পারে, কাহিনীটা বানানো। রোমাঞ্চকর এক ভূতুড়ে গপ্পো!'

'ওই কুকুরটার ছবি এঁকেছিলেন আপনার ভাই,' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ছবি নয়, মূর্তি। প্রতিকৃতি,' বলল মিকো। 'কাচ আর স্ফটিকের বিশেষজ্ঞ বলা যেত তাকে। ওই জিনিস দিয়েই বানিয়েছিল।'

'অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম ওই হাউণ্ডের মূর্তি,' অনেকক্ষণ পর কথা বললেন অলিভার। 'আমার জন্যেই বানিয়েছিল ওটা, জ্যাক। মাসখানেক আগে শেষ করেছিল কাজ। মূলার গ্যালারিতে একটা শো হওয়ার কথা ছিল তার শিল্পের।

ওখানে দেখানর জন্যে রেখে দিয়েছিল মূর্তিটা। আমার কোন আপত্তি ছিল না। চুরি যাবে জানলে কি আর রাখতে দিতাম!'

'কাচের একটা কুকুর, না?' বলল রবিন।

'স্ফটিক,' শুধরে দিলেন অলিভার। 'স্ফটিক এবং স্বর্ণ।'

'স্ফটিকও এক ধরনের কাচই,' বলল মিকো। 'তবে স্পেশাল কাচ। অতি মিহি সিলিকার সঙ্গে লীড অক্সাইড মিশিয়ে তৈরি। সাধারণ কাচের চেয়ে ভারি, অনেক বেশি উজ্জ্বল। কাচ কিংবা স্ফটিক গলিয়ে নিয়ে কাজ করত আমার ভাই। বারবার গরম করে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে বানিয়ে নিত কোন একটা মূর্তি। ঘষেমেজে তারপর অ্যাসিডে চুবিয়ে মসৃণ করে নিত ওপরটা। এক অসামান্য সৃষ্টি ওই হাউণ্ড। সোনালি রঙে আঁকা চোখগুলো দেখে মনে হত একেবারে জ্যান্ত। দুই কশায় ফেনাও তৈরি হয়েছে স্বর্ণ দিয়ে।'

'হয়ত আবার ফিরে পাওয়া যাবে ওটা,' আশা প্রকাশ করল রবিন। 'ও ধরনের একটা জিনিস বিক্রি করা এত সহজ না।'

'কঠিনও না,' বললেন অলিভার। 'এসব জিনিসের প্রতি যাদের লোভ আছে, যারা জ্যাক ইলিয়টকে চেনে, তারা ঠিকই কিনে নেবে।'

পুরো ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। 'এখানেই কি কাজ করতেন তিনি? কাচ গলানর চুলা কোথায়?'

'এখানে না,' জবাব দিল মিকো। 'পূর্ব লস অ্যাঞ্জেলেসে তার ওয়ার্কশপ। চব্বিশ ঘন্টার বিশ ঘন্টাই ওখানে কাটাত সে।'

'তাঁর তৈরি আর কোন মূর্তি নেই। নিজের জন্যে কিছুই রাখেননি? নাকি ওয়ার্কশপে রয়ে গেছে?'

'বেশ কিছু সংগ্রহ তার আছে। নিজের আর অন্যান্য শিল্পীদের তৈরি। এই ঘরেই রাখত ওগুলো। জ্যাকের মৃত্যুর পর, একে একে সব জিনিসই সরিয়ে নিয়ে গেছি আমি নিরাপদ জায়গায়। শুধু ওই একটা জিনিসই বাকি ছিল। ব্যাপারটা নিতান্তই দুর্ঘটনা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অলিভার।

'আমার ভাইয়ের গ্যালারি শো শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিন আগে, বলল মিকো। 'অনেকের কাছেই মূর্তি বিক্রি করেছিল জ্যাক। ভাল ভাল কয়েকটা জিনিস আবার কয়েকদিনের জন্যে চেয়ে এনে শোতে পাঠিয়েছিল। একে একে ওগুলো আবার যার যার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি গত বিকেলে হাউণ্ডটা নিয়ে ফিরেছি মিউজিয়ম থেকে। এ ঘরে ঢুকেছি অন্য কারও কোন জিনিস রয়ে গেল কিনা, দেখার জন্যে। আসলে, আগে গিয়ে হাউণ্ডটা দিয়ে আসা উচিত ছিল ফ্র্যাঙ্ককে, তাহলে আর এ অঘটন ঘটত না।...যাই হোক, এসে ঢুকলাম। বইগুলো তুলে তুলে দেখছি, তলায় কিছু পড়ে আছে কিনা। কিছুই পেলাম না। পায়খানা চাপল এই

সময়। গিয়ে ঢুকলাম বাথরুমে। বাথরুম থেকেই একটা খুটখাট আওয়াজ শুনেছি। বেড়াল-টেড়াল হতে পারে ভেবে বেশি আগ্রহ করলাম না। বাথরুম থেকে বেরোতেই দেখি, একটা লোক ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোর ছাড়া কিচ্ছু না, ধরেই নিলাম। রাস্তার মোড়েই ছিল পুলিশ। ছুটে এল। উত্তেজনায় তখন ভুলেই গিয়েছিলাম মূর্তিটার কথা!

'বড় বেশি খামখেয়ালি করেছ তুমি, মিকো,' গোমড়ামুখে বললেন অলিভার। 'তোমাকে সকালেই তো ফোনে বলেছিলাম, মূর্তিটা নিয়ে আগে আমার ওখানে চলে যেও।'

'আর লজ্জা দিও না, ফ্র্যাঙ্ক।' অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে মিকো, 'ভুলই হয়ে গেছে!'

'আর কেউ জানত, গতকাল কুকুরটা নিয়ে আসা হবে গ্যালারি থেকে?' অলিভারের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'পৌঁছে দেয়া হবে আপনার ওখানে?'

মাথা নাড়লেন অলিভার আর মিকো, দু'জনেই।

'জিনিসটার বীমা করা ছিল?' জানতে চাইল রবিন।

'ছিল, কিন্তু তাতে কি?' জবাব দিলেন অলিভার। 'তাতে তো আর জিনিসটা ফিরে পাওয়া যাবে না, টাকা পাওয়া যাবে। টাকা আমি চাই না। শিল্পের ক্ষতিপূরণ টাকা দিয়ে হয় না।'

'আঙুলের ছাপ বা চোখের অন্য কোন চিহ্ন খুঁজেছে পুলিশ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'গতরাতের অর্ধেকটাই ওসব খুঁজে পার করেছে পুলিশ,' জবাব দিল মিকো। 'সারা ঘরে পাউডার ছড়িয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজেছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি ওরা। এখন ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ওস্তাদ সব শিল্প-চোরের ছাপের সঙ্গে এ-বাড়িতে পাওয়া আঙুলের ছাপগুলো মিলিয়ে দেখছে।'

'কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখে না পুলিশ,' প্রশংসা করল কিশোর। 'সব ওরাই করছে, হাউণ্ড চুরির ব্যাপারে আমরা আর কি করব?'

'ঠিকই,' মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। উঠে পড়লেন। মিকো ইলিয়টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে। নিজের বাড়িতে যাবেন।

চত্বরেই দেখা গেল মিসেস ডেনভারকে। ফুলের ঝাড় থেকে মরা পাতা বাছছে। ওকে অগ্রাহ্য করলেন অলিভার। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওপরে। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

বসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলেন অলিভার।

পকেট থেকে ছোট জারটা বের করল কিশোর। কি আছে ওতে, জানাল প্রথমে। বলল, 'আপনার ডেস্কের ড্রয়ারের হাতল মাখিয়ে রাখব। তারপর বেরিয়ে

যাব আমরা সবাই। কেউ ড্রয়ার খোলার জন্যে হাতল ধরলেই হাতে কালো দাগ পড়ে যাবে তার।'

'সেজন্যে বেরিয়ে যাবার দরকার নেই,' বললেন অলিভার। 'আমি থাকলেও ঘরে ঢোকে সে। বন্ধ দরজা এমনকি দেয়ালও তার কাছে কোন বাধা নয়। ওগুলো গলেই চলে আসে স্বচ্ছন্দে। ড্রয়ারের সামান্য কাঠ ঠেকাতে পারবে না তাকে। হাতলে হাত দেয়ার দরকারই পড়বে না।'

'মিস্টার অলিভার,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আগে চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের। হবে না বলে কিছুই না করলে, সত্যি সত্যি হবে না। আপনিই তো বলেছেন, বাইরে থেকে ফিরে এসে খোলা পেয়েছেন ড্রয়ার।'

'বেশ,' বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন বলে মনে হল না, তবু সম্মতি দিলেন অলিভার। 'সব রকমভাবে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি আমি। যাও, মাখাও তোমার মলম। তারপর চল, বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি। খুব খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'খুব ভাল কথা বলেছেন। খিদেয় নাড়িভুঁড়িই হজম হয়ে যাচ্ছে আমার!'

ড্রয়ারের হাতলে সাবধানে মলম মাখাল কিশোর। হাত লাগাল না, কাগজের তোয়ালেতে লাগিয়ে নিল আগে, তারপর ডলে ডলে ভালমত লাগাল চীনামাটির হাতলে।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অলিভার। কোথায় খেলে ভাল হয়, প্রস্তাব দিল মুসা। উত্তেজনায় জোরে জোরে কথা বলছে সে। দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন অলিভার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ওরা চারজন।

শূন্য চত্বর। গেটের কাছে সাক্ষাৎ হয়ে গেল মিসেস ডেনভারের সঙ্গে। আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে তার কাছাকাছি। টমি গিলবার্ট। গির্জার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

গির্জার চত্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যামবুলেন্স।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গির্জার দারোয়ান,' বলল টমি। 'মারাত্মক আহত! এই খানিক আগে চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় পাওয়া গেছে তাকে। বেহুঁশ! দেখতে পেয়েছেন, ফাদার স্মিথ!'

পাঁচ

গির্জায় ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা আর মিস্টার অলিভার।

একটা স্ট্রেচার তুলে নিয়েছে সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক। তাতে দারোয়ান পল, গলা পর্যন্ত টেনে দেয়া হয়েছে চাদর।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার স্মিথ। পেছনে এল মিসেস ব্রাইস্।

'ওকে মেরে ফেলেছে!' বিলাপ করে কেঁদে উঠল ব্রাইস। 'মেরে ফেলেছে! খুন! খুন করেছে বেচারাকে!'

'ব্রাইস, ভুল বলছ,' শান্ত গলায় বললেন ফাদার। 'মেরে ফেলেনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' চেহারা ফ্যাকাসে। কম্পিত হাতে গির্জার দরজায় তালা লাগালেন তিনি। 'গতরাতে ওর সঙ্গে আসা উচিত ছিল আমার! একা তালা লাগাতে পাঠানো উচিত হয়নি মোটেই! ইস্‌স্, সারাটা রাত ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে ছিল বেচারা!'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ফাদার। 'সব আমার দোষ! ওরও বাড়াবাড়ি আছে! কতবার বলেছি, রাতে বাতি নেবাবে না। অন্ধকার রাখবে না চত্বর। না, কথা শুনবে না। বিদ্যুতের খরচ বাঁচায়। এখন হল তো!'

'বুদ্ধু! একেবারে গাধা!' কাঁদতে কাঁদতে বলল ব্রাইস। 'কি এমন খরচ বাঁচত! এখন? এখন তো থাকবে হাসপাতালে পড়ে!'

'ওসব ভেবে কিছু হবে না, ব্রাইস,' বললেন ফাদার। 'যাও···যাও, চমৎকার এক কাপ চা বানিয়ে খাও গিয়ে। ভাল লাগবে।' অ্যামবুলেন্সের পেছনের সিটে গিয়ে উঠলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল গাড়ি।

'শুনেছেন, চা!' অলিভারের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ব্রাইস। 'চমৎকার এক কাপ চা খেতে বলছে! ওদিকে বোধহয় মারাই গেল লোকটা! আমাকে চা খেয়ে শান্ত হতে বলছে! ঈশ্বর! লোকটার একেবারে মায়াদয়া নেই! ভূতটা হয়ত শেষই করে দিল পল বেচারাকে···' ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল মহিলা রেকটরির দিকে।

'ভূত?' অলিভারের দিকে চেয়ে বলল রবিন।

'মিসেস ব্রাইসের ধারণা, গির্জার আশেপাশে ভূত আছে,' বললেন অলিভার। 'দেখেছেও নাকি সে। এর আগের ফাদার, বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছিলেন এখানেই। বছর তিনেক আগে। কারও কারও ধারণা, গির্জার মায়া ত্যাগ করতে পারেননি তিনি। মৃত্যুর পরেও এসে ঘুরে বেড়ান এর ভেতরে। চল, খাওয়ার কাজটা সেরে ফেলি।'

উইলশায়ার বুলভার্ড-এর দিকে চলল ওরা।

'মিস্টার অলিভার,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। 'আপনার ঘরে যে আসে, সে আর এই গির্জার ভূত কি একই? কি মনে হয় আপনার?'

'নিশ্চয় না!' জোর দিয়ে বললেন অলিভার। 'ফাদারের ভূত হলে দেখামাত্রই চিনতাম। তবে সেটা আছে কিনা, শিওর না আমি। আজ অবধি শুধু মিসেস ব্রাইসই দেখেছে ওটা, আর কেউ না। মহিলা বলে, রাতে, মোমবাতি হাতে গির্জার ভেতরে ঘুরে বেড়ায় ফাদারের প্রেতাত্মা। আমার বিশ্বাস হয় না। কেন সেটা করবেন তিনি? খুব ভাল লোক ছিলেন। ভাল লোকেরা মৃত্যুর পর ভূত হয় না। কতদিন তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছি। নাহ্, তাঁর ভূত হতেই পারে না।'

আড় নিল ওরা। কয়েকটা ব্লক পেরিয়ে এসে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে

দাঁড়াল। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন অলিভার।

সুন্দর রেস্টুরেন্ট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দরজার পেতলের হাতলগুলোও নিয়মিত ঘষামাজায় ঝকঝক করছে। টেবিলে পরিষ্কার টেবিলক্লথ, কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা। প্রতিটি টেবিলের মাঝখানে ফুলদানীতে ফুল। কৃত্রিম, কিন্তু ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝাই যায় না, মনে হয় আসল। খদ্দের নেই। অসময়। নাশতার সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগে, আবার লাঞ্চেরও সময় হয়নি এখনও। ওরা চারজন আর একজন ওয়েটার ছাড়া কোন লোক নেই পুরো ঘরটাতে।

খাবার এল।

'মিস্টার অলিভার,' প্লেট টেনে নিতে নিতে বলল কিশোর, 'আপনার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা অনেক বড়। সেই তুলনায় লোক দেখিনি। ভাড়াটে কি নেই? শুধু মিসেস ডেনভার...'

মহিলার নামটা শুনেই মুখ বাঁকালেন অলিভার।

'...মিসেস ডেনভার,' আবার বলল কিশোর। 'আর টমি গিলবার্ট। বড় অসময়ে বাসায় দেখা যায় লোকটাকে।'

'ভারমন্টে, বাজারের এক দোকানে কাজ করে, মাঝরাত থেকে সকাল পর্যন্ত,' বললেন অলিভার। 'ছেলেটার চালচলন কেমন একটু অদ্ভুতই মনে হয় আমার কাছে। টমি, নামটাও যেন কেমন। বুড়ো হলেও টমি বলে ডাকা হবে, ভাবতেই হাসি পায়। আমার সবচেয়ে ছোট অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছে সে। তেমন আয় নেই, বোঝা যায়। একটা মেয়েও ভাড়া থাকে আমার বাড়িতে। লারিসা, লারিসা ল্যাটনিনা। টমির বয়েসী, ওর পাশের অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছে। শহরতলীতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করে। আর, ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস একজন স্টকব্রোকার।'

'পুলিশ চলে যাবার পর গত সন্ধ্যায় যে লোকটাকে দেখলাম?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ। বাড়ির শেষ মাথায় কোণের একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। খুব সকালে বেরিয়ে অফিসে চলে যায়, দুপুরের পর ফেরে। ওর এক ভাগ্নে, বব বারোজ, কলেজে পড়ে। জ্যাকবসের কাছেই থাকে। আরও একজন থাকে আমার বাড়িতে। ব্রায়ান এনড্রু, ওরফে-বেড়াল-মানব।'

'বেড়াল মানব!' বিশাল এক স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাতে গিয়েও থেমে গেছে মুসা।

হাসলেন অলিভার। 'আমিই ওই নাম রেখেছি। বেড়াল নিয়ে মেতে থাকে। রোজ বিকেল পাঁচটায় পাড়ার যত ভবঘুরে বেড়াল আছে, এসে হাজির হয় ওর ঘরে। ওগুলোকে খাবার দেয় সে। নিজের পোষা একটা বিড়াল আছে, একটা সিয়ামিজ বেড়াল।'

'কাজকর্ম কি করে?' জানতে চাইল মুসা।

'কিচ্ছু না,' বললেন অলিভার। 'ব্যাংকে বোধহয় জমানো টাকা আছে। তুলে আনে, আর খরচ করে। সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে ঘোরে। ভবঘুরে বেড়াল ধরে আনে, যেগুলো তার বাড়ির সন্ধান পায়নি। আহত, বা রোগা বেড়াল দেখলে, তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের খরচে পৌঁছে দিয়ে আসে পশু হাসপাতালে।'

'আর কে কে বাস করে আপনার বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরও অনেকেই থাকে। মোটমাট বিশজন ভাড়াটে। বেশির ভাগই খেটে খাওয়া মানুষ। যাদের নাম বললাম, তারা ছাড়া আর সবাই ছুটিতে বাইরে গেছে। আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুদের ওখানে বড়দিন পালন করবে। ছুটি শেষ হলেই ফিরে আসবে আবার। ব্রায়ানের ভাগ্নেকে ধরলে, এখন মোট সাতজন আছে আমার বাড়িতে।'

'ভালই,' বলল কিশোর। 'সন্দেহের আওতা খুব সীমিত।'

ঝট করে চোখ তুললেন অলিভার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'তুমি কি ভাড়াটেদের কাউকে সন্দেহ করছ? ওদেরই কেউ আমার ঘরে ঢোকে, ভাবছ?'

'আরও প্রমাণ দরকার, নইলে শিওর হয়ে বলতে পারব না। তবে, লোকটা এমন কেউ, যে জানে, কখন আপনি বাড়ি থাকেন, কখন থাকেন না। আমরা বেরিয়ে এসেছি দেখে থাকলে, আজও ঢুকতে পারে আপনার ঘরে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার অলিভার। 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিশোর। আমার ডেস্ক ঘাঁটার অনেক সময় পেয়েছে সে আজ।'

খাওয়া শেষ হল। ওয়েটারকে বিল আনতে বললেন অলিভার।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল চারজনে। উইলশায়ার রোড ধরে এসে ঢুকল প্যাসিও প্লেসে। গির্জার সামনের রাস্তা একেবারে নির্জন। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে পৌঁছুল ওরা। ঘরের ভেতরে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে মিসেস ভেনভার, গেট থেকেই শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'ওই মেয়েমানুষটাকেও খেতে হয় মাঝে মাঝে,' বলে উঠলেন অলিভার, 'তাই রক্ষে! নইলে চব্বিশ ঘন্টায় কখনও বুড়িটার চোখের আড়ালে থাকতে পারতাম না। শকুনি, শকুনি!'

হেসে ফেলল মুসা। 'খুব বেশি বিরক্ত করে বুঝি?'

'করে মানে? সারাক্ষণ ভাড়াটেদের পেছনে লেগে আছে। কে কখন কি করছে না করছে, চোখ রাখছে। উদ্ভট সব প্রশ্ন করে বসছে মাঝে মাঝেই। শুধু তাই না, কে কি খায় না খায়, তা-ও ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে দেখে আসে। কয়েকবার ডাস্টবিন ঘাঁটতে দেখেছি আমি ওকে। বুড়িটার বকবকানির দৌলতে কে কি খায়, কি করে, আমারও জানা হয়ে গেছে অনেকখানি। জানি, লারিসার প্রিয় জিনিস চকলেট, ডিনার খায় ঠাণ্ডা করে। ব্রায়ানের বেড়ালগুলো হপ্তায় চল্লিশ

টিন খাবার সাবাড় করে, এটাও জানি। এ-বাড়িতে থেকে কারও গোপনীয়তা বলে আর কিছু রইল না। সব ওই বুড়িটার কল্যাণে।'

অলিভারের পিছু পিছু ব্যালকনিতে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা। তালা খুললেন তিনি। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। ছেলেরাও ঢুকল।

'খবরদার!' ঘরে ঢুকেই সাবধান করল কিশোর। 'কেউ কোন জিনিসে হাত দেবে না।' পকেট থেকে ছোট একটা আতশী কাচ বের করে সোজা গিয়ে ঢুকল মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে। কাচের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করল ড্রয়ারের হাতল।

'বাহ্, চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।

প্রায় ছুটে দরজায় এসে দাঁড়ালেন অলিভার।

'ড্রয়ার খুলেছিল কেউ,' জানাল কিশোর। 'হাত দিয়েছিল হাতলে। মানুষের হাত, ভূত-ফুত না। মলমে ছাপ পড়ে আছে।...রবিন, একটা তোয়ালে, প্লীজ।'

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে একটা কাগজের তোয়ালে এনে দিল রবিন।

সাবধানে হাতলটা মুছে ফেলল কিশোর।

'ড্রয়ার খুলব?' জানতে চাইলেন অলিভার।

'নিশ্চয়।...আমিই খুলছি,' ড্রয়ারটা টেনে খুলল কিশোর। 'দেখুন, কিছু চুরি হয়েছে কিনা।'

দেখলেন অলিভার। 'না, সব ঠিকই আছে। অবশ্য কখনোই কিছু চুরি হয়নি। ঘাঁটাঘাঁটি করে যায় শুধু। আজ টেলিফোনের বিলটা খুলে দেখেছে কেউ। সকালে, ড্রয়ারের শেষ দিকে ছিল ওটা, ভাঁজ করা। খামে ভরা।'

'খামের ওপর মলম লেগে আছে, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কিশোরের। 'খুব ভালমতই হাতে লাগিয়েছে মলম।'

ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। বসার ঘর পেরিয়ে সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে ভালমত পরীক্ষা করল হাতলটা। 'এখানে মলম মাখাইনি। কিন্তু এখন লেগে আছে।'

'সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কোন্ পথে বেরিয়ে গেছে চোর,' কিশোরের কথার পিঠে বলল রবিন। 'দরজা খুলে হেঁটে চলে গেছে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই।'

'এবং দরজায় আবার তালা লাগিয়ে গেছে,' বলল কিশোর। দরজা খুলে বাইরের দিকের বোল্ট-লক পরীক্ষা করল। মলম লেগে আছে হালকাভাবে। 'হুঁম্‌ম্! চাবি আছে ওর কাছে!'

'অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার। 'ওটা স্পেশাল লক। চাবি থাকতেই পারে না কারও কাছে!'

'কিন্তু আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। দরজা বন্ধ করে দিল আবার।

সবকটা ঘরে তন্ন তন্ন করে মলমের দাগ খুঁজল ওরা এরপর। বাথরুমের আয়নায় পাওয়া গেল ছাপ। পাওয়া গেল ওষুধের বাক্সের গায়ে।

'মেডিসিন কেবিনেটও খুলেছিল সে,' হাসল কিশোর।

ঘোঁৎ ধরনের একটা শব্দ করলেন অলিভার। রেগে গেছেন।

'যাক, উন্নতি হচ্ছে তদন্তের,' আবার বলল কিশোর।

'তাই কি?'

'নিশ্চয়,' গভীর আস্থা কিশোরের কণ্ঠে। 'প্রথমেই জেনে গেলাম, আপনার ঘরে ঢুকে ড্রয়ার, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যে, তার হাতে মলম লাগে। তারমানে অশরীরী নয়। আর দশজন মানুষের মতই স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলে ঢুকেছিল সে আজ সকালে, বেরিয়ে গেছে আবার দরজা দিয়েই। অর্থাৎ, দেয়াল কিংবা কাঠের দরজা ভেদ করে সে আসে না। এবার গিয়ে চত্বরে বসব। চোখ রাখব, কারা আসছে, কারা যাচ্ছে। হাতের দিকে নজর রাখব। কালো দাগ দেখলেই ধরব ক্যাঁক করে।'

'এখানে যারা থাকে, তাদের কেউ যদি না হয়?' বললেন অলিভার।

'আমি শিওর, এ-বাড়িতেই থাকে সে। এমন কেউ, যে সকালে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।'

অলিভারকে ঘরে রেখে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। চত্বরে নামল। বসে পড়ল গিয়ে সুইমিং পুলের কিনারে সাজানো চেয়ারে।

'দারুণ একখান পুল!' চোখ চকচক করছে মুসার।

কেউ কোন জবাব দিল না।

কি ভেবে উঠে পড়ল রবিন। পুলের কিনারে গিয়ে বসে পড়ল। তাকাল নিচে। টলটলে পরিষ্কার পানি। তলায় নীল আর সোনালি রঙের মোজাইক। 'খুব সৌখিন লোকের কাজ! স্যান সিমেঅন-এর হার্স্ট ক্যাসলে আছে এমন একটা পুল, দেখেছি।' পানিতে হাত রাখল সে। উষ্ণ রাখা হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে।

গেটের বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। লাফিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল একটা ধূসর বেড়াল, পেছনে একজন লোক। আমাটে চুল। সাদা সোয়েটারের ওপর খাকি রঙের জ্যাকেট। ছেলেদের দিকে একবার তাকাল। কোনরকম আগ্রহ দেখাল না। বেড়ালটার পিছু পিছু চত্বর পেরিয়ে চলে গেল বাড়ির এক প্রান্তের একটা দরজার কাছে। বেড়ালটাকে দরজার গোড়ায় রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এল আবার, হাতে খাবারের প্লেট। নামিয়ে রাখল। খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়াল। ঝুঁকে গভীর আগ্রহে ওটার খাওয়া দেখতে লাগল লোকটা।

'ব্রায়ান,' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'গত সন্ধ্যায়ও দেখেছি ওকে আমরা।'

'নতুন একটা ভবঘুরে খুঁজে পেয়েছে,' ইঙ্গিতে বেড়ালটাকে দেখাল মুসা।

'অসময়ে খাওয়াচ্ছে দেখছ না। পাঁচটায় খাবার সময়, জানা নেই ওটার।'

দ্রুত খাওয়া শেষ করল বেড়ালটা, নিঃশব্দে চলে গেল বাড়ির পেছনে। শূন্য প্লেটটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ব্রায়ান এনড্রু।

সিঁড়িতে আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ, আবার খুলে গেল গেট। ভেতরে ঢুকল বলিষ্ঠ সেই লোকটা। জ্যাকবস। ঠোঁটের কোণে সিগারেট। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝোঁকাল সে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখে হাসল। তারপর চলে গেল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে, ব্রায়ানের পাশের ফ্ল্যাটটাই তার। ও হাত দেবার আগেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজা। বেরোল একটা ছেলে। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস।

'মামা,' ভ্রূকুটি করল ছেলেটা, 'সিগারেট একবারও সরাতে পার না মুখ থেকে!'

'বকিসনে, বব। দিনটা খুব খারাপ যাচ্ছে আজ। অ্যাশট্রেটা দিবি?'

'ধুয়ে রেখে দিয়েছি পুলের কাছে। নাওগে। উহ্, কি বিচ্ছিরি গন্ধ! বাড়ির আবহাওয়াই দূষিত করে দিচ্ছ!'

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাকবস। লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে পুলের ধার থেকে তুলে নিল বিশাল, ছোটখাট একটা গামলার মত অ্যাশট্রে। ছেলেদের পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল সিগারেটের। ধূমপান করে চলল নীরবে।

'আমার ভাগ্নেটার মত নিশ্চয় পাকামো কর না তোমরা?' এক সময় কথা বলল জ্যাকবস। 'গুরুজনদের কোন ব্যাপারে নাক গলাও না তো?'

'আমার বাবা-মা সিগারেট খায় না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

ঘোঁৎ করে উঠল জ্যাকবস। 'আমারও খাওয়া উচিত হচ্ছে না। তবে, সাবধানে থাকি আমি। যেখানে-সেখানে ছাই ঝাড়ি না, আগুন লাগিয়ে দিই না।' এমনভাবে বলছে সে, যেন আগুন লাগিয়ে দেয়াটাই সিগারেট খাওয়ার একমাত্র দোষ। 'অফিসে এ-রকম আরেকটা অ্যাশট্রে আছে আমার। কাজ করার সময়ও সতর্ক থাকি আমি। অ্যাশট্রের মাঝখানে পোড়া সিগারেট গুঁজে রেখে তারপর কাজে হাত দিই।'

সিগারেটে সুখটান দিল জ্যাকবস। পোড়া টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল। অ্যাশট্রেটা নিয়ে চলে গেল তার ঘরে।

'কত রকমের মুদ্রাদোষ যে থাকে মানুষের...' বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

'...তোমার যেমন "ইয়াল্লা" আর "খাইছে",' ফস করে বলে বসল রবিন।

কথাটা কানে তুলল না মুসা। পুলের ওপাশে আরেকটা ফ্ল্যাটের দরজার দিকে চেয়ে আছে। 'টমি গিলবার্ট কি ঘরেই আছে! পর্দা টানা!' কিশোরের দিকে তাকাল। 'চল না, বেল বাজাই? দেখি আছে কিনা...'

'চুপ!' হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের।

চত্বরে বেরিয়ে এসেছে মিসেস ডেনভার। এক টুকরো টিস্যুপেপার দিয়ে জোরে জোরে ডলছে হাত। 'পুলের কাছে ছেলেপিলেদের বসা নিষেধ।' নাকী গলায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মহিলার সামনে। 'মিসেস ডেনভার, কি হয়েছে আপনার হাতে? কি লাগিয়েছেন?'

'মানে?'

'হাত দুটো দেখাবেন?' জোরে জোরে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

কিশোরের গলা শোনার অপেক্ষায়ই ছিলেন অলিভার। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন।

'আপনার হাতে কালো দাগ, কিসের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই···ইয়ে, মানে···,' থতমত খেয়ে গেছে মিসেস ডেনভার। 'রান্নাঘরে···'

'আপনি মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিলেন,' কঠিন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তাঁর ডেস্কের ড্রয়ার খুলেছেন, কাগজপত্র ঘেঁটেছেন, চিঠিপত্র পড়েছেন, মেডিসিন কেবিনেট খুলেছেন, বাথরুমের আয়নায় হাত দিয়েছেন। কেন?'

ছয়

জীবনে বোধহয় এই প্রথম বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল মিসেস ডেনভার। হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে। রক্ত জমেছে মুখে, লাল, আরও লাল হয়ে উঠছে।

'ডলে ফল হবে না,' বলল কিশোর। 'সহজে উঠবে না ওই দাগ।'

নেমে এসে ছেলেদের পাশে দাঁড়ালেন অলিভার। 'মিসেস ডেনভার, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।'

অলিভারের কথায় চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল ম্যানেজার। নাকী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'জানেন, এই বিচ্ছুটা কি বলেছে আমাকে? চোর বলেছে!'

'জানি। ঠিকই বলেছে!' জবাব দিলেন অলিভার। 'বাড়ির সবাই জানুক, এটা নিশ্চয় চান না?' মিসেস ডেনভারের দরজার দিকে এগোলেন। 'আসুন। কথা বলব।'

'আমি···আমি ব্যস্ত,' গলার স্বর খাদে নেমে গেছে ম্যানেজারের। 'অনেক···অনেক কাজ পড়ে আছে, জানেন আপনি।'

'জানি, জানি,' বললেন অলিভার। 'আপনার তো চব্বিশ ঘন্টাই কাজ! তো, আজ আর কি কি করার ইচ্ছে? ডাস্টবিন ঘাঁটবেন? আর কারও ঘরে ঢুকবেন?···আসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকতে পারব না।···নাকি, উকিলকে টেলিফোন করব?'

আর কিছু বলতে হল না। প্রায় উড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল মিসেস

ডেনভার।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন অলিভার। 'তোমাদের আসা উচিত হবে না। ওখানে বস। আমি কথা বলে আসছি।'

দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়লেন অলিভার। বন্ধ করে দিলেন দরজা।

চুপচাপ বসে রইল তিন গোয়েন্দা। কান খাড়া। মিসেস ডেনভারের তীক্ষ্ণ, নাকী গলা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। খানিক পর পরই থেমে যাচ্ছে তার গলা। ছেলেরা বুঝতে পারছে, তখন নিচু গলায় কথা বলছেন অলিভার। তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে না।

'খুব ভালমানুষ,' এক সময় বলল মুসা। 'কিন্তু, আমার মনে হয়, প্রয়োজনে সাংঘাতিক কঠোর হতে পারেন তিনি। মোলায়েম গলায় কি ধমকটাই না লাগালেন ম্যানেজারকে।'

পুলের ওপাশে দরজা খোলার শব্দ হল। ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে আসছে টমি গিলবার্ট। রোদের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে, অন্ধকারের জীবের মত। পরনে মোটা সুতার পাজামা, দলে-মুচড়ে আছে। শার্টের কয়েকটা বোতাম নেই। পা খালি। হাই তুলল সে।

'গুড মর্নিং,' বলল কিশোর।

আবার চোখ মিটমিট করল টমি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রগড়াল। চুল-মুখ অপরিষ্কার, ধোয়া হয়নি।

আবার হাই তুলল টমি। জিভ আর টাকরার সাহায্যে অদ্ভুত 'আঁ-ম্ আঁ-ম্' শব্দ করল। চোখে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটা চেয়ারে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল। মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল একবার পুলের দিকে। ছেলেদের দিকে ফিরল। বসবে কি বসবে না, দ্বিধা করছে।

অবশেষে ধপ করে পাথুরে চত্বরেই বসে পড়ল। গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলে নিল পাজামার নিচের দিকটা। তারপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসল।

ভঙ্গিটা চেনে কিশোর। যোগ ব্যায়ামের একটা আসন, পদ্মাসন। 'গুড মর্নিং,' আবার বলল সে।

ফ্যাকাসে মুখটা কিশোরের দিকে ফেরাল টমি। পুরো এক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোখের কোন নির্দিষ্ট রঙ বোঝা যাচ্ছে না। মণির চারপাশের সাদা অংশটা টকটকে লাল, ঘুমিয়ে ছিল, কিন্তু ঘুম ভাল হয়নি যেন!

'এখনও সকালই রয়েছে?' অবশেষে কথা বলল টমি।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'না, তা নেই। একটা বেজে গেছে।'

আবার হাই তুলল টমি।

'মিস্টার অলিভারের কাছে শুনলাম, আপনি ভারমন্টের একটা নাইটশপে কাজ করেন?' বলল কিশোর।

সামান্য সতর্ক মনে হল টমিকে। মৃদু হাসল। 'মাঝরাত থেকে সকালতক। খুব খারাপ সময়। তবে ভাল পয়সা দেয় ওরা। ওই সময়টার জন্য আলাদা ভাতা দেয়। কাজেই ছাড়ি না। তাছাড়া সারাদিন আর রাতের অর্ধেকটা সময়ই থাকে আমার। পড়াশোনা করতে পারি।'

'স্কুলে পড়েন?' জানতে চাইল কিশোর।

মুখ বাঁকাল টমি, হাত নাড়ল বিশেষ ভঙ্গিতে, যেন স্কুলে যাওয়াটা বেহুদা সময় নষ্ট। 'বহু আগেই ওই পাট চুকিয়েছি। বাপ চেয়েছে, আমি কলেজে যাই। তারপর ডেন্টিস্ট হই। কোন মানে খুঁজে পেলাম না এর। কে যায়, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে লোকের মাড়ি খোঁচাখুঁচি করতে? আসলে, ও-সবই এক ধরনের মোহ, মায়া।'

'মোহ!' বিড়বিড় করল মুসা।

'হ্যাঁ। সবই মোহ। পুরো দুনিয়াটাই একটা মায়া। সবাই আসলে ঘুমে অচেতন আমরা, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছি। ব্যাপারটা বুঝে গেছি আমি। তাই জেগে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল রবিন আর মুসা। মনের ভাব, মাতাল নয় তো ব্যাটা?

'কি নিয়ে পড়াশোনা করছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ধ্যানতত্ত্ব,' বলল টমি। 'পূর্ণ-সচেতনতায় পৌঁছুতে হলে এর ব্যাপক চর্চা দরকার।' আসনমুক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। ছেলে তিনটেকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকতে দেখে মজা পাচ্ছে।

'টাকা জমাচ্ছি,' আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে টমি। 'ভারতে যাব গুরু খুঁজতে। ধ্যানতত্ত্বের সবচেয়ে বড় শিক্ষক একমাত্র ভারতেই আছে। তাই কষ্ট হলেও রাতে কাজ করি, বেশি টাকার জন্যে। শিগগিরই বেশ কিছু টাকা জমে যাবে আমার, ভারতে গিয়ে তিন-বছর থাকার মত হয়ে যাবে। ধর্ম আমি বিশ্বাস করি না, বিজ্ঞান মানি না। কোন জিনিসে আমার লোভ নেই।'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রবিন। 'তা থাকেও না…চাওয়ার যা যা আছে, সব জিনিস যদি থাকে কারও…'

'না, না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টমি। 'বুঝতে পারছ না…'

'বোঝার দরকার আছে বলেও মনে হয় না!' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

'খুব সহজ ব্যাপার,' মুসার টিপ্পনীতে কান দিল না টমি। 'চাহিদা, লোভ থেকেই সব গোলমালের সৃষ্টি। ওই যে বুড়ো অলিভার, সারাক্ষণ খালি নিজের সংগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত। আরও চাই, আরও চাই এই-ই করছে খালি। পরের জন্মে…আমার মনে হয়, পরের জন্মে ভাঁড়ারের ইঁদুর হয়ে জন্মাবে!'

'কি যা-তা বলছেন ভদ্রলোক সম্পর্কে?' রেগে গেল মুসা। 'ওঁর মত মানুষ হয়

নাকি?'

মুসার বোকামিতে হতাশ হল যেন খুব, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টমি। 'কারও কাছ থেকে চুরি করে কিংবা ছিনিয়ে এনেছে বা আনছে, তা বলিনি। বলছি, এত আছে, আরও চাইছে কেন? কেন বুঝতে পারছে না, মরীচিকার পেছনেই ছুটছে শুধু? জান, ওর কাছে মহামূল্যবান একটা মান্দালা আছে, অথচ জানেই না ওটা কি করে ব্যবহার করতে হয়। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে, যেন আরেকটা অতি সাধারণ চিত্র।'

'মান্দালাটা আবার কি জিনিস?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

প্রায় ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল টমি। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল আবার। হাতে ছোট একটা বই। ছেলেদের কাছে এসে বলল, 'ওরকম একটা মান্দালা আমার খুবই দরকার। এক ধরনের নকশা, মহাবিশ্বের। ওটার ওপর চোখ রেখে ধ্যান করলে মেকি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠে যাবে তুমি, সৌরজগৎ কিংবা আরও বড় কোন জগতের একজন হয়ে পড়বে।' বই খুলে রঙিন একটা ছোট নকশা দেখাল সে। বেশ কয়েকটা ত্রিভুজ একটার ওপর আরেকটা ফেলে তারকা তৈরি করা হয়েছে। ওটাকে ঘিরে রেখেছে ছোটবড় অনেকগুলো বৃত্ত। সবচেয়ে বড় বৃত্তটাকে ছুঁয়ে আঁকা হয়েছে একটা চতুর্ভুজ। 'এটা একটা মান্দালা।'

'কই, মিস্টার অলিভারের ঘরে তো এ ধরনের জিনিস দেখিনি।' বলল মুসা।

'আছে। আমারটার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। তিব্বত থেকে এসেছে। অনেক পুরানো দেবদেবীর ছবি আছে ওটাতে,' বই বন্ধ করল টমি। 'ওরকম একটা জিনিস জোগাড় করবই আমি। কোন গুরুকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব। এখন টেলিভিশন দিয়েই কাজ চালাই।'

'টেলিভিশন!' রবিন অবাক।

'হ্যাঁ, টেলিভিশন,' আবার বলল টমি। 'বর্তমানের সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হতে সাহায্য করে আমাকে। দোকানের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরি। তারপর খুলে দিই টেলিভিশন, সাউণ্ড বন্ধ করে রাখি। শুধু ছবি। প্রথমে পর্দার ঠিক মাঝখানে দৃষ্টি স্থির করি, ধীরে ধীরে সরিয়ে নিই কোন এক কোনার দিকে। পর্দায় কি ঘটছে না ঘটছে, কিচ্ছু চোখে পড়ে না আর। রঙের প্রতিকৃতিগুলোর দিকে চেয়ে থাকি শুধু। একসময় হারিয়ে যাই অদ্ভুত এক জগতে, সেটাই আসল জগৎ।'

'ঘুমিয়ে পড়েন নিশ্চয়!' মন্তব্য করল রবিন।

অপ্রতিভ মনে হল টমিকে। 'ধ্যানমগ্নতার···হ্যাঁ, ধ্যানমগ্নতার এটাই অসুবিধে!' স্বীকার করল সে। 'মাঝে মাঝে এত বেশি শান্ত হয়ে যায় মন, ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্ন দেখি তখন···' বাধা পেয়ে থেমে গেল টমি।

দরজায় শব্দ। বেরিয়ে এসেছেন মিস্টার অলিভার। চেয়ে আছেন তিন গোয়েন্দার দিকে।

'দুঃখিত,' বলে উঠল কিশোর। 'আপনার সব কথা শোনা হল না। আমাদেরকে যেতে হচ্ছে।'

'না না, দুঃখিত হবার কিছু নেই,' তাড়াতাড়ি বলল টমি। 'যখন খুশি, যে সময় খুশি, আমার ঘরে এস। যদি তখন ধ্যানে না বসি, কথা বলব। এ-সম্পর্কে, মান্দালা সম্পর্কে যা জানতে চাও, জানাব।...আর হ্যাঁ, আমার ভারতে যাবার ব্যাপারেও বলব...'

ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে রওনা হল তিন গোয়েন্দা।

ঘরে ঢুকেই বড় নিচু একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন অলিভার।

'আরেকটা চাবি আছে মিসেস ডেনভারের কাছে, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, আছে,' মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। 'ঠিকই অনুমান করেছিলে তুমি, আরেকটা চাবি আছে কারও কাছে। নাকা বুড়ি! উকিলকে ডেকে ওর চাকরির চুক্তিপত্রে আরও কিছু শর্ত ঢোকাব আমি। এরপর থাকলে থাকবে, না থাকলে চলে যাবে।'

'চাবিটা জোগাড় করল কোথা থেকে?' জানতে চাইল রবিন।

'খুব সহজে। মাস দুই আগে ইউরোপে গিয়েছিলাম। পরিচিত এক চাবিঅলাকে ডেকে আনল বুড়ি। বলল, এ-ঘরের তালার চাবি হারিয়ে ফেলেছে, আরেকটা চাবি বানিয়ে নিতে হবে। ম্যানেজার বলছে, কাজেই কোনরকম সন্দেহ করল না চাবিঅলা। বানিয়ে দিল আরেকটা চাবি।'

'আজব মহিলা!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'আজব?' মুখ বাঁকালেন অলিভার। 'আমার তো মনে হয় মাথায় গোলমাল আছে! যাক, রহস্যটার সমাধান হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করত কে, বোঝা গেল। আর ঢুকতে পারবে না। চাবিটা নিয়ে নিয়েছি ওর কাছ থেকে। আর একটা বানিয়ে নেবার সাহস হবে না, খুব ধমকে দিয়েছি।...তোমরা আমার মস্ত উপকার করলে,' হেসে যোগ করলেন, 'জেনে ভাল লাগছে, ভূত-ফুত কিছু না, রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষই ঘরে ঢুকত। ছায়া দেখাটা আসলে কল্পনা, এখন বুঝতে পারছি। ওই তামারা ব্রাইসের ভূতের গল্পই শেকড় গেড়েছিল মনে! আর কিছু না!' কি বোকামিই করেছেন এতদিন ভেবে, আপনমনেই মাথা নাড়লেন তিনি।

অলিভারের কথা কিশোরের কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। আপনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে সে। হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল। হাসল বৃদ্ধের দিকে চেয়ে। 'যাক, রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। আপনার উপকার করতে পেরেছি, খুব ভাল লাগছে।' উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, মিস্টার অলিভার, আপনার কাছে কি একটা মান্দালা আছে?'

'তুমি জানলে কি করে?' ভুরু কুঁচকে গেছে অলিভারের। 'কেন, দেখতে

চাও?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

গোয়েন্দাপ্রধানকে নিয়ে এসে কাজের ঘরে ঢুকলেন অলিভার। ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা বিচিত্র নকশা ঝুলছে ডেস্কের ওপরে, দেয়ালে। উজ্জ্বল রঙে আঁকা। টমির কাছে যেটা রয়েছে, অনেকটা ওটার মতই। তবে অনেক বড়। আর, বৃত্তগুলো ঘেঁষে খুদেখুদে অক্ষরে প্রাচীন দুর্বোধ্য কোন ভাষায় লেখা রয়েছে কি যেন। চার কোণে অনেকগুলো দেব-দেবীর ছবি।'

'এক তরুণ আর্টিস্টের কাছ থেকে কিনেছি,' বললেন অলিভার। দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত সে। তিব্বত থেকে এনেছে মান্দালাটা। ওর জন্যেই নাকি বানিয়ে দিয়েছিল এক গুরু। এটা অনেক দিন আগের কথা। আর্টিস্ট এখন নেই, মারা গেছে।

'মিস্টার অলিভার,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। 'এ ঘরে টমি গিলবার্ট ঢুকেছিল?'

'না-তো,' ভুরু কোঁচকালেন অলিভার। 'ওই নাকা বুড়িটা ছাড়া এ-বাড়ির আর কেউ ঢোকেনি এ ঘরে। একা থাকতে পছন্দ করি আমি, জানই। আড্ডা ভাল লাগে না। আর টমিটাকে ঢুকতে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সারাদিনই কেমন যেন মাতাল মাতাল একটা ভাব, অপরিষ্কার, গন্ধ বেরোয় চুল থেকে।'

'তা ঠিক,' একমত হল কিশোর। 'ওই মান্দালাটা বাইরে বের করেছিলেন কখনও? ফ্রেম-ট্রেম ঠিক করানর জন্যে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অলিভার। 'গত দশ বছর ধরে ওখানে ওভাবেই ঝুলে আছে ওটা। বছর বছর দেয়ালে রঙ দেবার সময় শুধু নামাই, তা-ও নিজের হাতে। আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখি সে-সময়টা। রঙের কাজ শেষ হলে আবার ঝুলিয়ে দিই। কেন?'

'টমি জানল কি করে আপনার কাছে একটা মান্দালা আছে?'

'জানে?'

'জানে। এ-ও জানে, ওটা তিব্বতের জিনিস। ওর কাছে একটা মান্দালা আছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন অলিভার। 'কি জানি! ওই হতচ্ছাড়া খবরের কাগজঅলাদের কাজ হবে হয়ত! আমার সংগ্রহে কি কি আছে, ছেপে বসেছিল হয়ত কখনও। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব জানে, কি আছে আমার সংগ্রহে। ওরাই হয়ত কেউ জানিয়েছিল খবরের কাগজঅলাদের।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। দরজার দিকে এগোল।

'কিশোর,' হালকা গলায় বললেন অলিভার। 'আরেকটা রহস্য খুঁজছ? লাভ নেই। আর কোন রহস্য নেই এখানে।'

'হয়ত,' একমত হতে পারছে না গোয়েন্দাপ্রধান। 'না থাকলেই ভাল। কিন্তু আবার কোন কিছু ঘটতে আরম্ভ করলেই ডেকে পাঠাবেন আমাদের, দ্বিধা করবেন না।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে একে একে হাত মেলালেন অলিভার। দরজার বাইরে এগিয়ে দিয়ে এলেন ওদের।

রাস্তায় এসে নামল তিন ছেলে।

'গেল শেষ হয়ে!' বাস-স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা। 'এত সহজ কেস আর হাতে আসেনি। ছুটির বাকি দিনগুলো কি করে কাটাব?'

'প্রথম কাজ, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে দূরে থাকব,' বলে উঠল রবিন। 'মেরিচাচীর আইসক্রীম কেকের লোভ এবারের মত ত্যাগ করতে হবে। আরিব্বাপরে, যা জঞ্জাল এনে জমিয়েছেন রাশেদ চাচা। সাফ করতে...' ইঙ্গিতে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিল গবেষক। 'কিশোর, তুমি কি বল?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ!' জবাব দিল কিশোর। সঙ্গীদের কথায় মন নেই। গভীর চিন্তা চলেছে তার মাথায়।

সারাটা পথ চুপচাপ থাকল কিশোর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে রইল।

রকি বীচে পৌছুল বাস। নামল তিন গোয়েন্দা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে হেঁটেই চলে এল। কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিল অন্য দু'জন।

'টেলিফোনের কাছাকাছি থেক,' ডেকে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'শিগগিরই আবার কাজে নামতে হবে। মিস্টার অলিভারের কাছ থেকে ডাক এল বলে।'

বিস্মিত দুই সঙ্গীর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে রওনা হয়ে গেল ইয়ার্ডের দিকে।

সাত

একগাদা লোহা-লক্কড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচী। কিশোরকে দেখেই মুখ তুলে তাকালেন। 'এসেছিস! তুই কি, বলত কিশোর! মানুষকে ভাবনায় ফেলে দিয়ে মজা পাস! বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে সেই সকাল বেলা বেরিয়ে চলে গেছিস! বালিশের ওপর একটা চিঠি ফেলে রেখে গেলেই হল? কেন, বলে যেতে কি অসুবিধে ছিল...'

'ঘুমিয়েছিলে,' বলল কিশোর, 'জাগাতে চাইনি...'

'দরদ! এই সারাটাদিন দুঃশ্চিন্তায় ভোগানর চেয়ে ঘুম ভাঙানো অনেক ভাল ছিল। তোরা চাচা-ভাতিজা মিলে আমাকে জ্বালিয়ে খেলি। তুই থাকবি বাইরে

বাইরে, টো টো করে ঘুরবি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবি। কার বেড়াল হারাল, কার কুকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তাতে তোর কি?...আর তোর চাচা, রাজ্যের যত জঞ্জাল এনে ফেলবে আমার ঘাড়ে! এগুলো না হয় বিক্রি, না কিছু, খালি জায়গা আর সময় নষ্ট। টাকাও!'

হাসল কিশোর, 'ভেব না, চাচী। সারাটা বিকেল পড়ে রয়েছে। আজই সাফ করে ফেলব সব। এখন খেতে দাও তো, খুব খিদে পেয়েছে।'

ভুরু কোঁচকালেন মেরিচাচী। 'সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি! আয়, জলদি আয়! হাত মুখ ধুয়ে নে-গে। আমি খাবার বাড়ছি।' তাড়াহুড়ো করে জঞ্জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাড়ির দিকে চললেন।

জঞ্জালের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। হাসিতে ভরে গেছে মুখ। প্রচুর জিনিস বেরোবে ওগুলোর ভেতর থেকে, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ঢোকাতে পারবে। কাজে লাগবে তিন গোয়েন্দার।

পুরো বিকেল জঞ্জাল ঘাঁটল কিশোর। সন্ধে ছ'টায় চলল ঘরে, রাতের খাবার খেতে। এর ঠিক এক ঘন্টা পরে বাজল ফোন।

ফোন ধরলেন মেরিচাচী। কিশোরের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর ফোন।'

চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছুটে এসে ধরল ফোন। কানে ঠেকাল রিসিভার। 'কিশোর পাশা।'

'কিশোর,' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ। 'আমি ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। কিশোর, বললে বিশ্বাস করবে না...আমার, আমার ঘরে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে...'

'বলুন,' শান্ত গোয়েন্দাপ্রধান।

'মিসেস ডেনভারকে ধরার পর ভেবেছিলাম, ছায়ার ব্যাপারটা আমার কল্পনা,' বললেন অলিভার। 'কিন্তু তা নয়! আবার দেখেছি আমি ছায়াটা! মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল কিনা, বুঝতে পারছি না!'

'আপনার বাড়িতে আসতে বলছেন আমাদেরকে?'

'প্লীজ! যদি আজই পার, খুব ভাল হয়। রাতটা আমার এখানেই কাটাবে। একা থাকতে খুব খারাপ লাগছে। যে-কোন সময় আবার এসে পড়বে ছায়াটা...সইতে পারব না আর! নার্ভের ওপর খুব চাপ পড়ছে!'

'ঠিক আছে, আমরা আসছি, যত তাড়াতাড়ি পারি,' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

'আবার ভাগার তালে আছিস?' গম্ভীর হয়ে গেছেন মেরিচাচী।

সব কথা খুলে বলল কিশোর। বুঝিয়ে বলল চাচীকে।

'তাই!' সব শুনে বললেন চাচী। 'আহা, মানুষটার জন্যে খারাপই লাগছে! বিয়ে করল না, সঙ্গীসাথী নেই, একা মানুষ, কাটায় কি করে! ঠিক আছে, যা। বাসে যাবার দরকার নেই। তোর চাচাকে বলছি, গাড়িতে করে দিয়ে আসবে।'

চাচীকে জড়িয়ে ধরল কিশোর। টুক করে তার গালে চুমু খেয়ে বলল, 'এ-জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি, চাচী!'

মুসা আর রবিনকে টেলিফোন করল কিশোর।

কয়েক মিনিট পরেই ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট পিক-আপ ট্রাকটা। পেছনে গাদাগাদি করে বসেছে তিন গোয়েন্দা।

'কিশোর, আবার তোমার কথাই ঠিক হল,' ঠেলেঠুলে দুই বন্ধুর মাঝখানে আরেকটু জায়গা করে নেবার চেষ্টা চালাল মুসা। 'কি করে জানলে, আবার খবর দেবেন, মিস্টার অলিভার?'

'কারণ: আমি শিওর, ছায়া দেখাটা ওঁর কল্পনা নয়। আমি নিজেও দেখেছি ওটা?'

'তুমি দেখেছ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কখন?'

'গতকাল। মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে। একটা বুকশেলফের পাশে। প্রথমে মনে করেছি, মুসা এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরে জানলাম, ও তখন বসার ঘরে ছিল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বলে উঠল মুসা। 'কিন্তু পরে যে বললে, বুকশেলফের ছায়া?'

'তখন তাই মনে করেছিলাম। এটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু টমি গিলবার্টকে দেখার পর...'

'চমকে উঠেছিলে!' কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। 'গতকাল পুলিশ আসার পর ঘর থেকে বেরিয়েছিল টমি। তাকে দেখেই কেমন চমকে উঠেছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, মুসার সমানই লম্বা সে?' বলল কিশোর।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'ওর মত দেখতে নই আমি। ও আমার চেয়ে বড়, বিশের কম হবে না বয়েস। তাছাড়া হাড্ডিসার...'

'আমি বলেছি টমি তোমার সমান লম্বা,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'তোমার কালো চুল, ওরও। ও গতরাতে কালো সোয়েটার পরেছিল, তোমার গায়ে ছিল কালো জ্যাকেট। মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে তখন ম্লান আলো জ্বলছিল। ঘরের বেশির ভাগই ছিল অন্ধকার। টমিকে তুমি বলে ভুল করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখছে মনে মনে।

'কিন্তু ও ঢুকল কি করে?' অবশেষে বলল রবিন। 'দরজায় তালা দেয়া ছিল।'

'জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'টমিকেই দেখেছি, সেটাও শিওর হয়ে বলতে পারছি না। তবে, কেউ একজন ঢুকেছিল। কি করে ঢুকেছিল, এটা জানতে

পারলেই অনেক খিছু সহজ হয়ে যাবে।'

ঘন্টাখানেকের ভেতরই প্যাসিও প্লেসে পৌছে গেল পিক-আপ। চত্বরের সামনে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন রাশেদ চাচা।

বেল টিপল কিশোর।

'এসে পড়েছ!' দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার অলিভার। 'গুড। সত্যি বলছি, ভয়ই পেতে শুরু করেছি আমি!'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'ঘরটা ঘুরেফিরে দেখি?' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সে।

মাথা কাত করলেন মিস্টার অলিভার।

প্রথমেই সোজা কাজের ঘরের দিকে ছুটে গেল কিশোর। কোণের দিকে ডেস্কের ওপর জ্বলছে শুধু টেবিল ল্যাম্পটা। ঘরে আলো-আঁধারির খেলা। পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু একটা বুকশেলফের এক পাশের কয়েকটা বই, চীনামাটির তৈরি কয়েকটা মূর্তি, আর দেয়ালে ঝোলানো মান্দালা। ভুরু কুঁচকে নকশাটার দিকে চেয়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ, গত বিকেলের মতই উপলব্ধি করল, ঘরে একা নয় সে। আরও কেউ একজন রয়েছে। নীরবে লক্ষ্য করছে তাকে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

গত দিন যেটার কাছে দেখেছিল, সেখানেই আজও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ছায়াটাকে। সে ফিরে তাকাতেই কোণের দিকে সরে যেতে লাগল দ্রুত। বাতাসে জানালার পর্দা কাঁপার মত কাঁপছে থিরথির করে।

লাফ দিয়েই ছুটল কিশোর। ঘরের কোণে এসে খামচে ধরার চেষ্টা করল ছায়াটাকে। হাতে ঠেকল দেয়াল, শুধুই দেয়াল। ছুটে এসে সুইচ টিপে মাথার ওপরের তীব্র আলো জ্বেলে দিল। পাগলের মত তাকাল চারদিকে। নেই। কোথাও নেই ছায়াটা।

ছুটে কাজের ঘর থেকে বেরোল কিশোর। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। নিচে তাকাল।

উজ্জ্বল ফ্লাডলাইট জ্বলছে। নীল-সাদা আলোয় জ্বলজ্বল করছে সুইমিং পুলের সোনালি আর নীল মোজাইক করা তল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টমি গিলবার্টের ফ্ল্যাটটা। জানালার পর্দা সরানো। রঙিন আলোর আবছা ঝিলিক চোখে পড়ছে, তার মানে টেলিভিশন খোলা। দেখা যাচ্ছে টমিকে। চুপচাপ মেঝেতে বসে আছে সে, পদ্মাসনে, বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা।

'কি হল?' কানের কাছে ফিসফিস করল রবিনের কণ্ঠ।

'আবার দেখেছি ওটা!' বিড়বিড় করল কিশোর। কেঁপে উঠল একবার। কিছু না, ডিসেম্বরের ঠাণ্ডার জন্যেই এই কাঁপুনি—নিজেকে প্রবোধ দিল সে। 'কাজের

ঘরে··· মান্দালাটার দিকে চেয়েছিলাম। হঠাৎ টের পেলাম, আরও কেউ রয়েছে ঘরে। ঘুরে তাকালাম। দেখলাম ছায়াটাকে। এখন মনে হচ্ছে, টমি নয়। ওই যে টমি, তার ঘরে, বসে বসে ঝিমোচ্ছে। কিন্তু ঢুকল কি করে ছায়া! বেরিয়েই বা গেল কি করে! আশ্চর্য!'

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন অলিভার।

'ওকে তুমিও দেখছ, না?' কম্পিত কণ্ঠ বৃদ্ধের। 'তারমানে, পাগল হয়ে যাইনি আমি!'

নীরবে ঘরে ঢুকে গেল ছেলেরা। দরজা বন্ধ করে দিল।

'না, মিস্টার অলিভার,' বলল কিশোর, 'পাগল হয়ে যাননি! গতকালও দেখেছি ওটা আমি। কি মনে হয় আপনার? টমি গিলবার্টের সঙ্গে কোন মিল রয়েছে?'

'জানি না!···এত দ্রুত আসে-যায় ছায়াটা! খামোকা কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তবে···তবে, টমির সঙ্গে মিল আছে!'

'কিন্তু তাই বা কি করে হয়?' আপনমনেই বলল কিশোর। 'দুই দুই বার ওটা দেখেছি, দু'বারই টমি ছিল তার ঘরে। একই সঙ্গে দুটো জায়গায় কি করে যাবে সে?' জোরে জোরে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'না, হতে পারে না!···মিস্টার অলিভার, টমি সম্পর্কে কতখানি জানেন আপনি?'

'খুবই সামান্য,' বললেন অলিভার। 'মাস ছয়েক হল, আমার বাড়িতে ভাড়া এসেছে সে।'

'টমি আসার আগে কি ওই ছায়ার উপস্থিতি টের পেয়েছেন কখনও?'

ভাবলেন অলিভার। মাথা নাড়লেন। 'না। ব্যাপারটা নতুন।'

'আপনার মান্দালার ওপর লোভ আছে ওর,' বলল কিশোর। 'ভাল করে ভেবে দেখুন তো, ওটার কথা কখনও বলেছেন কিনা ওর কাছে?'

'কক্ষনও না,' সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন অলিভার। 'ওর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলি না আমি। এড়িয়ে চলি। তবে মাঝেমধ্যে লারিসার সঙ্গে কথা বলি। মেয়েটা ভারি মিশুক। তবে সে-ও খুব একটা মিশতে চায় না টমির সঙ্গে। মোটা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আতঙ্ক রয়েছে মেয়েটার। রোজ রাতে নিয়মিত সাঁতার কাটে পুলে। অনেক সময় পুলের কাছে বসে থাকে টমি। মেয়েটা উঠে এলে তার সঙ্গে আলাপ জমানর চেষ্টা করে। কিন্তু পাত্তা দেয় না লারিসা। আমাকে বলেছে, ছেলেটাকে দেখলেই কেমন একটা অনুভূতি হয়—বিছে, মাকড়সা কিংবা কেঁচো দেখলে যেমন হয় কারও কারও!'

'এ-বাড়ির কোথাও কোন গোপন পথ নেই তো?' বলল রবিন। 'আপনার ঘরে ঢোকার?'

'মনে হয় না,' অলিভারের হয়ে জবাব দিল কিশোর। 'এসব আধুনিক বাড়িতে

গোপন পথ বানায় না লোকে। সেসব ছিল আগের দিনে, দুর্গ-টুর্গগুলোতে।'

'সন্দেহ থাকলে খুঁজে দেখতে পার,' বললেন অলিভার। 'আমার বাবা আরেকজনের কাছ থেকে কিনেছিলেন এ-বাড়ি। পুরানো আমলের লোক ছিল আগের মালিক। বলা যায় না, যদি তেমন কোন পথ বানিয়ে রেখে গিয়ে থাকে।'

তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। বিশেষ করে কাজের ঘরে। কিন্তু গোপন পথ তো দূরের কথা, ইঁদুর বেরোনর মত বাড়তি একটা ফোকরও নেই দরজা-জানালা-ভেন্টিলেটর আর পানি নিষ্কাশনের সরু ছিদ্র ছাড়া। দেয়াল বা মেঝের কোথাও কোন ফাঁপা জায়গা নেই। দরজা ছাড়া আর কোন পথে মানুষের ঢোকার উপায় নেই।

'সত্যিই আশ্চর্য!' অবশেষে বলল রবিন।

মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। 'বহু বছর ধরে আছি এ-বাড়িতে। আরও কয়েকটা বাড়ি আছে আমার, কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ। তাই এখান থেকে নড়ি না। তবে এবার বোধহয় তল্পি গোটাতেই হল। এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা এভাবে ঘটতে থাকলে পাগলই হয়ে যাব!'

এরপর ঘাপটি মেরে কাজের ঘরে বসে রইল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু আর এল না ছায়াটা। রাত বাড়ছে। শেষে ওঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। শোবার ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন অলিভার। কোনরকম শব্দ হলেই চমকে উঠছেন। তাঁকে জানাল কিশোর, সারারাত পাহারা দেবে ওরা পালা করে। তিনি যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

বসার ঘরে সোফার ওপর রাত কাটাবে রবিন। মুসা থাকবে কাজের ঘরে একটা কাউচে। কিশোর অন্য কোন একটা ঘরে শুতে পারবে।

রাতের প্রথম প্রহরে পাহারায় রইল কিশোর। সদর দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল সে। কান খাড়া রাখল।

এগারোটা বাজল। নিথর নীরব চারদিকটা। শোনার মত তেমন কিছুই নেই। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার শব্দও থেমে গেছে অনেক আগেই। এই সময় কানে এল পানিতে ঝুপঝাপ শব্দ। নিশ্চয় লারিসা ল্যাটনিনা সাঁতার কাটতে নেমেছে। স্বাস্থ্যের প্রতি কি দৃষ্টি! কনকনে ঠাণ্ডায় এই মাঝরাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম করেনি।

'কিশোর?' কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মুসা। 'জলদি এস! একটা জিনিস দেখবে!'

উঠে পড়ল কিশোর। রবিন ঘুমিয়ে পড়েছে। মুসাকে অনুসরণ করে কাজের ঘরে চলে এল সে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। গির্জার ভেতরে আলো!

'বোধহয় ফাদার স্মিথ,' বলল কিশোর। 'ঠিকঠাক আছে কিনা সব, দেখতে এসেছেন!'

'কিন্তু এত রাতে!'

'ঠিকই বলেছ,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'সন্দেহজনকই! দাঁড়াও, দেখে আসছি।'

'আমি আসি তোমার সঙ্গে,' বলল মুসা।

'না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'তুমি এখানেই থাক। পাহারা দাও। আমি যাব আর আসব।'

বসার ঘরে চেয়ার থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল কিশোর। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। চত্বরের আলো নিবে গেছে। নির্জন, শূন্য। সুইমিং পুলেও কেউ নেই। কেঁপে উঠল একবার কিশোর, বোধহয় ঠাণ্ডার জন্যেই। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

রাস্তায় এসে নামল কিশোর। গির্জার জানালায় আলোটা দেখা যাচ্ছে এখনও। ঘষা কাচের শার্সিতে ঘোলা প্রতিফলন। কাঁপছে অল্প অল্প। বৈদ্যুতিক আলো নয়!

গির্জার সদর-দরজা বন্ধ। সিঁড়ি বেয়ে পাল্লার কাছে উঠে এল কিশোর। আস্তে করে ঠেলা দিল। ভেজানই রয়েছে পাল্লা। খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে ঢুকে গেল সে।

পেছন ফিরে একটা বেদির কাছে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। কালো আলখেল্লা। সাদা কলার। হাতে মোমবাতি।

শব্দ শুনে ঘুরল মূর্তি। স্থির হয়ে গেল কিশোর। পাদ্রীর পোশাক পরা একজন মানুষ। বৃদ্ধ। লম্বা লম্বা চুল সব সাদা। গাল আর কপালের চামড়া কোঁচকানো।

কথা বলল না লোকটা। হাতের মোমবাতি তুলে নীরবে দেখছে কিশোরকে।

'মাপ করবেন, ফাদার,' কাঁপা গলায় বলল কিশোর, 'বাইরে থেকে আলো দেখলাম। চোরের উৎপাত রয়েছে তো। তাই দেখতে এসেছি।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা। তারপর হাত দিয়ে বাতাস করে নিবিয়ে দিল মোম। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ঘরটাকে।

'ফাদার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। ঘাড়ের কাছে লোম খাড়া হয়ে গেছে তার। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত। পিছিয়ে এল এক পা। বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

পাশ দিয়ে দমকা হাওয়ার মত ছুটে গেল কিছু একটা। জোর ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কিশোর। পরক্ষণেই পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ভারি দরজা।

কালিগোলা অন্ধকার। হুড়মুড় করে আবার উঠে পড়ল কিশোর। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল দরজার হাতল। টান দিল।

ইঞ্চিখানেক ফাঁক হল পাল্লা, তার বেশি না। কিসে যেন আটকে গেছে! জোরে ঠেলা দিয়েই আবার হ্যাঁচকা টান দিল কিশোর। আবারও সেই এক ইঞ্চি ফাঁক।

বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়া হয়েছে দরজায়।

আট

দরজার পাশে দেয়াল হাতড়াচ্ছে কিশোর। হাতে ঠেকে গেল সুইচ বোর্ড। একটার পর একটা সুইচ টিপে গেল সে। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল মাথার ওপর। আলোয় ভরে গেল বিরাট ঘর।

দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ধীরে ধীরে ডান থেকে বাঁয়ে সরাল নজর। কেউ নেই। আস্তে করে এগোল। এসে থামল, খানিক আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটা সেখানে। মেঝেতে পড়ে আছে কয়েক ফোঁটা মোম।

আবার দরজার কাছে ফিরে এল কিশোর। হাতল ধরে টান দিল। খুলল না। 'মনে হয়,' বিড়বিড় করল সে আপনমনেই, 'ডাকার সময় হয়েছে!' চৌকাঠ আর পাল্লার ফাঁকে মুখ রেখে চেঁচাতে শুরু করল সে, 'কে আছেন! আসুন! আমি আটকে গেছি! কে আছেন...চুপ করল। কান পাতল! কোন আওয়াজ নেই। দরজার গায়ে জোরে জোরে চাপড় দিতে লাগল। 'মুসা! ফাদার স্মিথ! আমি আটকে গেছি!'

জবাব নেই।

অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর আবার চেঁচাল। আবার অপেক্ষার পালা।

'ওখানে যাওয়া উচিত হবে না, ফাদার!' শোনা গেল একটা মহিলাকণ্ঠ।

'খামোকা ভয় পাচ্ছ, ব্রাইস,' ফাদার স্মিথের গলা চিনতে পারল কিশোর। 'একা যাচ্ছি না আমি। পুলিশে ফোন করেছি। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে...'

'ফাদার স্মিথ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা! তালা দিয়ে আটকে রেখে গেছে আমাকে!'

'কিশোর পাশা?' বাইরে দরজার কাছেই শোনা গেল ফাদারের বিস্মিত কণ্ঠ।

উইলশায়ারের দিক থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। বুঝে গেছে, পুলিশ আসার আগে তালা খুলবেন না ফাদার। পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা তার বিশেষ সুখকর হবে না, এটাও বুঝতে পারছে। গির্জার ভেতরে চোখ বোলাতে বোলাতে ভ্রূকুটি করল সে।

কাছে, আরও কাছে এসে গেল সাইরেনের শব্দ। থেমে গেল হঠাৎ।

তালায় চাবি ঢোকানর শব্দ হল। খুলে গেল দরজা।

শোবার পোশাক পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার স্মিথ। তাঁর পাশে মিসেস ব্রাইস। ঘাড়ের ওপর নেমেছে চুল, তাড়াহুড়ো করে বেঁধেছে, দেখেই বোঝা যায়।

'একটু সরুন, প্লীজ,' ব্রাইসের পেছন থেকে বলল একজন পুলিশ।

বাঁ পাশে এক পা সরল ব্রাইস। তরুণ পেট্রলম্যানের চোখে চোখ পড়ল কিশোরের। আগের রাতে গির্জায় চোর খুঁজতে যারা যারা এসেছিল, এই লোকটাও

তাদের একজন। পাশে আরেকজন, হাতে রিভলভার।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল তরুণ অফিসার।

আঙুল তুলে দেখাল কিশোর, যেখানে পাদ্রীর পোশাক পরা লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। 'গির্জার ভেতরে আলো জ্বলতে দেখলাম। এতরাতে কে ঢুকল, দেখতে এলাম। দেখি, ফাদারের পোশাক পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়, হাতে মোম। আমাকে দেখেই আলো নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বেরিয়ে চলে গেল। তালা আটকে দিল দরজায়।'

'দেখতে এসেছিলে?' বলল আরেক অফিসার।

'হ্যাঁ। মিস্টার অলিভারের ঘরের জানালা থেকে দেখেছি, গির্জায় আলো।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বলে উঠলেন ফাদার। 'সকালে মিস্টার অলিভারের সঙ্গে দেখেছি তোমাকে। কিন্তু এত রাতে এখানে এক পাদ্রীকে দেখেছ! সেই সন্ধ্যা ছ'টায় আমি নিজে তালা লাগিয়ে গেছি দরজায়। আমি ছাড়া আর কোন ফাদার নেই এখানে। নিশ্চয় ভুল করেছ।'

'না করেনি!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রাইস। 'ফাদার, আপনি জানেন ও ভুল করেনি!'

'আহ্, আবার শুরু করলে!' বিরক্ত কণ্ঠ ফাদারের। 'তোমার কি ধারণা, আবার সেই বৃদ্ধ পাদ্রী!'

'চুপ করুন আপনারা!' পেছনে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। সঙ্গে এসেছে মুসা।

'ওই ছেলেটা আমার মেহমান,' কিশোরকে দেখিয়ে বললেন অলিভার। 'আজ রাতে ও আর ওর দুই বন্ধু আমার ঘরেই থাকছে। এই যে, এ হল মুসা আমান। আমাকে বলেছে, খানিক আগে গির্জার ভেতরে আলো দেখেছিল। কিশোরকে ডেকে দেখিয়েছে আলোটা। ব্যাপার কি দেখতে এসেছে কিশোর পাশা।'

বিরক্ত চোখে কিশোরের দিক থেকে চোখ ফেরাল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার। মুসাকে দেখল, তারপর তাকাল অলিভারের দিকে। 'বাচ্চাদের এভাবে চোর-পুলিশ খেলা উচিত না। তাদের পক্ষে একজন বয়স্ক লোকের সাফাই গাওয়া আরও অনুচিত।'

স্থির হয়ে গেলেন অলিভার। নাক কোঁচকালেন।

'কিন্তু গির্জার ভেতরে আলো দেখেছি আমি!' জোর দিয়ে বলল মুসা।

'এবং কেউ একজন ছিল,' যোগ করল কিশোর। 'কালো আলখেল্লা, সাদা কলার। ফাদার স্মিথ, আপনি যেমন পরেন, তেমনি। ধবধবে সাদা লম্বা লম্বা চুল। হাতে ছিল একটা মোমবাতি।'

'পোলাপানের গপ্পো!' বিড়বিড় করল পুলিশ অফিসার। 'খোকা, বল না যেন, কিছু চুরি গেছে গির্জা থেকে।'

'গেছেই তো,' বলে বসল কিশোর। 'গতরাতে ছিল ওটা, এখন নেই।' সপ্রশ্ন

দৃষ্টিতে তাকাল ফাদারের দিকে। 'একটা স্ট্যাচু ছিল ওখানটায়,' একটা জানালার পাশে দেয়ালের একটা জায়গা নির্দেশ করল সে। 'সবুজ ফতুয়া গায়ে, মাথায় চোখা লম্বা চূড়াঅলা টুপি, হাতে লাঠি।'

ফাদারকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল দুই পুলিশ অফিসার।

'সত্যিই তো! ঠিকই বলেছে ছেলেটা,' বলে উঠল তরুণ অফিসার। 'গতরাতে একটা মূর্তি ছিল ওখানে, সেইন্ট প্যাট্রিকের মূর্তি সম্ভবত! সব সময় যিনি সবুজ ফতুয়া পরে থাকেন, মাথায় বিশপের টুপি—কি যেন নাম টুপিটার, ফাদার?'

দেয়ালের দিক থেকে চোখ ফেরালেন ফাদার। 'মাইটার,' বিড়বিড় করে বললেন। 'সব সময়ই মাইটার মাথায় রাখেন সেইন্ট প্যাট্রিক, হাতে বিশপের লাঠি।'

'তো কোথায় গেল মূর্তিটা?' জানতে চাইল পুলিশ অফিসার।

'এ গির্জায় কখনও সেইন্ট প্যাট্রিকের মূর্তি ছিল না,' অস্বস্তি বোধ করছেন ফাদার, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে। 'থাকার কথাও না। এটা সেইন্ট জুডসের গির্জা। অসম্ভবকে সম্ভব করানোর ব্যাপারে খ্যাতি আছে তাঁর।'

'হুঁ,' তরুণ অফিসারের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'আপনার হাউসকীপার প্রায়ই বৃদ্ধ ফাদারকে দেখতে পায়, যেটা অসম্ভব। এই ছেলেটা তাঁকে দেখেছে, এটা অসম্ভব। গতরাতে আমরা কয়েকজন দেখেছি একটা মূর্তি, যা নাকি কখনও ছিলই না এ-গির্জায়, এটা আরেক অসম্ভব। এই গির্জার কোথাও এক-আধটা মাইটার আছে?'

চমকে উঠলেন যেন ফাদার। 'গতকাল আনা হয়েছিল। একটা মাইটার আর একটা বিশপের লাঠি।'

'কেন?'

'একটা বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল,' বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন ফাদার। 'বড়দিন উপলক্ষ্যে। গুরুজনদের সামনে অভিনয় করেছিল বাচ্চা-কাচ্চারা। মধ্যযুগে যেমন হত। ন্যাটিভিটি আর তিন জ্ঞানী লোকের ঘটনা অভিনীত হয়েছিল। অভিনয়ের শেষদিকে এসে ঢোকেন সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি আর সাধুরা, তাঁদের মাঝে সেইন্ট প্যাট্রিকও থাকেন। সেইন্ট প্যাট্রিক সাজানোর জন্যেই ফতুয়া, টুপি আর লাঠি ভাড়া করে আনা হয়েছে। আজ আবার ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি ওগুলো যেখান থেকে এনেছিলাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেলল কিশোর। 'এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল চোরটা!'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল তরুণ পুলিশ অফিসার।

'একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে,' ভারিক্কি ভাবটা চেহারায় ফুটিয়ে তুলল কিশোর। 'গত সন্ধ্যায় এসেছিল এ-পাড়ায়। পাশের গলির এক বাড়িতে ঢুকেছিল।

পুলিশের তাড়া খেয়ে এসে ঢুকল গির্জায়। বুঝতে পারল, এখানে ঢুকেও সহজে রেহাই পাবে না। পুলিশ আসবেই। চোখ পড়ল ফতুয়া, মাইটার আর লাঠির ওপর। উপস্থিত বুদ্ধি আছে চোরটার, কোন সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি সেইন্ট প্যাট্রিক সেজে দেয়ালের গা ঘেঁষে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। চোখ এড়িয়ে গেল আপনাদের।'

কিশোরের দিকে চেয়ে আছে দুই অফিসার। বিস্ময় ফুটেছে চোখে।

'আপনারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে চলে গেলেন,' বলে গেল কিশোর। 'গির্জার দরজায় তালা দিতে এল দারোয়ান, পল মিন। তখনও বেরোয়নি চোর, কিন্তু বেরোতে হবে। দরজা ছাড়া আর কোন পথ নেই। সেদিক দিয়ে বেরোতে গেলেই চোখে পড়ে যাবে দারোয়ানের। অগত্যা তাকে কোন কিছু দিয়ে মেরে বেহুঁশ করে পালিয়ে গেল। ফাদার, পলের হুঁশ ফিরেছে? কথা মনে করতে পারছে সে?'

মাথা নাড়লেন ফাদার। 'তেমন কিছুই না। ও বলেছে, পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কেউ। তারপর আর কিছু মনে নেই। ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দেয়নি ডাক্তার। অবস্থা খারাপই!'

'হ্যাঁ, শানের ওপর পড়েছিল হয়ত,' বলল কিশোর। 'জোরে বাড়ি খেয়েছে মাথায়। ভাল হয়ে উঠুক। চুরির ব্যাপারে কিছু একটা আলোকপাত করতে পারবে হয়ত...'

'বেচারা!' বিড়বিড় করলেন ফাদার। 'মস্ত বোকামি করেছি কাল! ওর সঙ্গে আমারও আসা উচিত ছিল!'

'পুরো ব্যাপারটাই কেমন উদ্ভট!' আপন মনেই বলল তরুণ অফিসার। 'রিপোর্ট কি লিখব! এক চোর, সেইন্টের পোশাক পরে লুকিয়ে থেকেছে! একটা বাচ্চা ছেলে বলছে, সে ভূত দেখেছে...'

'পাদ্রীর পোশাক পরা একজন মানুষকে দেখেছি,' শুধরে দিল কিশোর। 'ভূত দেখেছি, একবারও বলিনি।'

'মানুষ কি করে ঢুকল?' বলে উঠল তামারা ব্রাইস। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। 'দরজায় তালা দেয়া ছিল! ফাদার স্মিথ নিজে দিয়েছেন! ভূতই দেখেছ তুমি, খোকা! বুড়ো ফাদারের ভূত। যাকে আমি দেখেছি।'

'দরজা যদি বন্ধই থাকবে, এই ছেলেটা ঢুকল কি করে?' প্রশ্ন রাখল দ্বিতীয় অফিসার। 'আসলে যে ঢুকেছে, সে তালা খুলেই ঢুকেছে। ফাদার, তালার চাবি কার কাছে থাকে?'

'অবশ্যই আমার কাছে,' বললেন ফাদার। 'মাঝেসাঝে ব্রাইসের কাছেও দিই...আর একটা, দারোয়ান পলের কাছে...ওটা সম্ভবত হাসপাতালে, পকেটের আর সব জিনিসের সঙ্গে রয়েছে। আমারটা কিংবা পলেরটা হারিয়ে যেতে পারে, তাই বাড়তি আরও একটা চাবি আছে। রেকটরির নিচতলায়, কোট রাখার

হ্যাঙারের পাশে, ছোট একটা হুকে ঝোলানো থাকে।'

'এখনও কি আছে চাবিটা, ফাদার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঝট করে কিশোরের দিকে চোখ ফেরালেন ফাদার। দেখলেন এক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে প্রায় ছুটে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন রেকটরি থেকে। মুখচোখ শুকনো। 'নেই!'

কেউ কোন কথা বলল না।

'এটা…এটা এক ধরনের বোকামি,' আপনমনেই বললেন ফাদার। 'দু'দুটো চাবি থাকতেও বাড়তি আরেকটা চাবি খোলা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা! তাহলে আর দরজায় তালা দেবার মানে কি হল!'

'সেটা আপনারা জানেন,' ফস করে বলে বসল দ্বিতীয় অফিসার। 'ফাদার, মনে হচ্ছে, যে কেউ যে-কোন সময় ওখান থেকে চাবিটা নিতে পারে?'

মাথা ঝোঁকালেন ফাদার। থমথমে চেহারা।

'লেফটেন্যান্টকে ডাকা দরকার,' সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল অফিসার। 'নিজের কানেই শুনে যাক, সেইন্টের ছদ্মবেশে হাওয়া হয়ে গিয়েছে চোর। চাবি চুরি করে গির্জায় এসে ঢুকেছে পাদ্রীর প্রেতাত্মা!'

নিচু গলায় বিড়বিড় করে কি পড়ছে তামারা ব্রাইস। ক্রুশ আঁকছে বুকে।

হাউসকীপারের দিকে চেয়ে বললেন ফাদার, 'আর কোন কাজ নেই এখানে আমাদের, ব্রাইস। চল, রেকটরিতে চল। চমৎকার এক কাপ চা খাওয়াবে আমাকে!'

নয়

অলিভারের ঘরে থেকে, বাকি রাতটা পাহারা দিয়েই কাটাল তিন গোয়েন্দা। চোর বা ভূত, কোনটাই আর কোন উপদ্রব করল না। খুব ভোরে উঠলেন মিস্টার অলিভার। ডিম ভাজলেন, টোস্ট তৈরি করলেন। এসে ঢুকলেন বসার ঘরে।

'এই যে, ছেলেরা,' বললেন অলিভার। 'নাশতা রেডি। খেতে এস।'

নীরবে কয়েক মিনিট খাওয়া চলল।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। 'কোন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' একটা ডিমের বেশির ভাগই মুখে পুরে দিয়েছে মুসা। চিবোতে চিবোতে বলল, 'এ-রহস্যের সমাধান করা আমাদের কম্মো নয়!'

'খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাও তুমি, মুসা,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'সবে তো খেল শুরু। জমাট বাঁধতে শুরু করেছে রহস্য। প্রচুর চিন্তাভাবনা আর সময় ব্যয় করতে হবে এর পেছনে।'

'যেমন?'

'যেমন, চোর। গির্জায় কেন ঢুকেছিল, জানা দরকার। অন্তত অনুমান করতে পারা দরকার।'

'তাছাড়া,' বললেন অলিভার, 'জানা দরকার, আমার ঘরে আসে যে ছায়াটা, ওটার সঙ্গে চোরের কি সম্পর্ক!'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'ঠিকই বলেছেন। ছায়া আর চোরের সঙ্গে যোগসাজশ থাকাটাও বিচিত্র নয়। আচ্ছা, মিস্টার অলিভার, ছায়াটা কি নির্দিষ্ট কোন একটা সময়েই দেখা যায়? দিনে বা রাতে? আমি দেখেছি দু'বার, দু'বারই সন্ধ্যাবেলা। আপনি?'

ভাবলেন অলিভার। 'সাধারণত, শেষ বিকেলে কিংবা সন্ধ্যাবেলায়। দু'একবার দুপুরের পরেও দেখেছি।'

'মাঝরাতে, বা তারপর?'

'তখন তো ঘুমিয়েই থাকি। তবে কোন-কোনদিন আগে জেগে উঠি, এই পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ করার জন্যে। তবে ওসময় কখনও দেখিনি।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'তাহলে, আজ আর সারাদিন আমাদের থাকার কোন দরকার নেই। চলে যাব এখন। বিকেল নাগাদ ফিরে আসব। রকি বীচে যেতে হবে। কাজ আছে। বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ আপনি নিরাপদ। আশা করছি, ছায়াটা ঢুকবে না ততক্ষণে।'

নাশতা শেষ করে উঠে পড়ল ছেলেরা। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে সবে চত্বরে নেমেছে, পুলের ধারে একটা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টমি গিলবার্ট।

'এই যে ছেলেরা,' ডাকল টমি। 'শুনলাম, গির্জায় নাকি ভূত দেখেছ গতরাতে? ওসব ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ। আমাকে যদি ডাকতে তখন!'

'ডাকব?' টমির দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'কি করে? তখন তো আপনার কাজের সময়, দোকানে থাকার কথা।'

'গতরাতে ছুটি ছিল আমার। রোজই কাজ করে না লোকে।'

'ভূত দেখা গেছে, কি করে জানলেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এ আর এমন কি কঠিন? যে পাড়ায় মিসেস ডেনভার আর ব্রাইস রয়েছে, সে পাড়ার লোকের খবর জানতে অসুবিধে হয় নাকি? ভোর হবার আগেই ছড়িয়ে পড়েছে খবর। বেড়ালটার কাছে শুনলাম।'

'বেড়াল!' বিস্মিত রবিন।

'ওই আর কি। বেড়াল-মানব, ব্রায়ান এনড্রু।'

গেটের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামল। তাদের পিছু নিল টমি।

'একটু দাঁড়াও,' ডাকল টমি। 'সত্যিই তোমরা তাকে দেখেছ?'

'কোন একজনকে দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর।

দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা। পেছনে টমিকে হাঁ করিয়ে রেখে দ্রুত হেঁটে এসে পড়ল উইলশায়ার স্ট্রীটে। বাস স্টেশনের দিকে চলল।

'ওটাকে দেখলেই কেমন জানি গা ছমছম করে!' বলল মুসা। 'ওই টমিটা!' বাসে উঠে বসেছে ওরা।

'কারণ সে ভূত-প্রেত সম্পর্কে আগ্রহী,' বলল কিশোর। 'অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী। ওসব নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে,' সিটের পেছনে হেলান দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওর কিছু কিছু বিশ্বাস একেবারে অমূলক নয়। বড় বড় সব ধর্মেই বলে, লোভ আর খুব বেশি টাকা পয়সা থাকা ক্ষতিকর।'

'অর্থই সকল অনর্থের মূল,' বলল রবিন।

'খাঁটি কথা। তবে, আসলে তুমি কি বলতে চেয়েছ, বুঝেছি, মুসা। ওই টমি গিলবার্টের মাঝে অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে। রহস্যজনক কিছু একটা!'

ঠিক সকাল সাড়ে ন'টায় রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

'প্যাসিও প্লেসে যা যা ঘটেছে, সব আবার তলিয়ে দেখা দরকার,' বলল কিশোর। 'চল, আগে হেডকোয়ার্টারে যাই।'

দশ মিনিট পর ট্রেলারের ভেতর এসে ঢুকল ওরা। পুরানো পোড়া ডেস্কটা ঘিরে বসল।

'একসঙ্গে তিনটে রহস্যের সমাধান করতে হচ্ছে এখন আমাদের,' আলোচনা শুরু করল কিশোর। এক নাম্বার, ওই ছায়া। কি ওটা, কার ছায়া, কি করে ঢোকে মিস্টার অলিভারের ঘরে? দুই, চোর—কুকুরের মূর্তিটা যে চুরি করেছে। কে সে? গির্জায় কি কাজ তার? শেষ, এবং তিন নাম্বারটা হল, পাদ্রীর ভূত। আসলেই কি সে ভূত? ছায়া আর চোরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'ছায়াটা কার, তা-তো জানিই আমরা,' বলল মুসা। 'তুমি আর মিস্টার অলিভার, দু'জনেই চিনতে পেরেছ। টমি গিলবার্ট।'

'দেখেছি সত্যি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তবে চিনতে পেরেছি বলব না। পলকের জন্যে দেখেছি। তাই নিশ্চিত হতে পারছি না। তোমরা দু'জনও যদি দেখতে, একমত হওয়া যেত।'

'ছায়াটা আর যাই হোক,' বলল রবিন, 'মিসেস ডেনভারের নয়। সে শুধু তালা খুলে দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকত, দেয়াল গলে আসত না।'

আবার মাথা ঝোকাল কিশোর। 'এবং আকারেও ছায়াটার সঙ্গে অনেক অমিল। মহিলা বেঁটে, মোটা। ছায়াটা লম্বা, হালকা-পাতলা। টমির সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কোন পথে কি করে ঢোকে সে এত নিঃশব্দে! আর, একজন লোক একই সময়ে দু'জায়গায় থাকে কি করে? দু'বার তাকে মিস্টার অলিভারের ঘরে দেখেছি, দু'বারই ওই সময়ে নিজের ঘরে ছিল সে। ঘুমোচ্ছিল,

এবং ঝিমোচ্ছিল।'

কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। 'হয়ত অন্য কারও ছায়া!'

'কিন্তু মান্দালাটার কথা জানে টমি,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, যেন দেখেছে নিজের চোখে। মিস্টার অলিভার কখনও তাকে ঘরে ডেকে নেননি, এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই।'

'অর্থাৎ, ছায়ার ব্যাপারে আমাদের প্রধান সন্দেহ, টমি গিলবার্ট,' ব্যাপারটার ওপর আপাতত ইতি টানল কিশোর। 'তবে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই, কোনরকম ব্যাখ্যাও দিতে পারছি না ছায়াটার। আচ্ছা, এবার চোরের কথায় আসা যাক। নিশ্চয় ব্যাটা মিস্টার অলিভারের ভাড়াটে, কিংবা কোন প্রতিবেশী। কারণ, তার জানা আছে, গির্জার একটা চাবি ঝোলানো থাকে কোটের হ্যাঙারের পাশে, রেকটরিতে। তার আরও জানা আছে, কুকুরের মূর্তি···আচ্ছা, বার বার এই মূর্তি মূর্তি বলতে ভাল্লাগছে না! একটা কিছু নাম দেয়া যাক এর। কি নাম?' বন্ধুদের দিকে তাকাল সে।

'ভূতুড়ে কুকুর,' বলল মুসা।

'নাহ, ভাল্লাগছে না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'কার্পাথিয়ান হাউণ্ড?···নাহ, এটাও পছন্দ না···তাহলে কি? কিশোর, তুমি একটা বল।'

'শ্বাপদ···শ্বাপদ···ছায়াশ্বাপদ হলে কেমন হয়?'

'ছায়াশ্বাপদ! চমৎকার! মুসা, তুমি কি বল?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মুসা।

'বেশ,' আবার আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'ছায়াশ্বাপদ এবং এর মূল্য কতখানি, জানা আছে চোরের। কে জানতে পারে?'

'ছায়াটা,' অনুমান করতে চাইছে মুসা, 'মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকে তাঁর ডায়েরীতে হয়ত লেখা দেখেছে। কিংবা ফোনে তিনি কারও সঙ্গে আলাপ করেছিলেন, সে-সময় শুনেছে।'

'মিসেস ডেনভার হতে পারে?' বলল রবিন। 'ও-তো মিস্টার অলিভারের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। দেখে ফেলাটা অসম্ভব নয়।'

'ও জানলে ওই পুরো এলাকা জেনে যেত ওটার কথা,' প্রতিবাদ করল মুসা।

'জানেনি, কি করে শিওর হচ্ছ? কিশোর, তোমার কি মনে হয়?' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল রবিন। 'ছায়াশ্বাপদ চুরি করার উদ্দেশ্যেই কি জ্যাক ইলিয়টের ঘরে ঢুকেছিল চোর?'

'বলা শক্ত। কি করে সে জানল, তখন ছায়াশ্বাপদ রয়েছে ওখানে? হয়ত মূল্যবান কিছু চুরির উদ্দেশ্যেই ঢুকেছিল, পেয়ে গেছে মূর্তিটা। ওই পাড়ার কেউ হয়ে থাকলে, নিশ্চয় জানা ছিল, বাড়িটা খালি পড়ে আছে। ঢুকে পড়েছে। ওর কপাল খারাপ, রাস্তার মোড়েই ছিল পুলিশ। মিকোর চেঁচামেচি শুনে তাড়া করে

এল তারা। ছুটে গিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়ল চোর। সেইন্ট প্যাট্রিকের স্ট্যাচু সেজে দাঁড়িয়ে গেল দেয়াল ঘেঁষে। সাহস আছে বলতে হবে!'

'তারপর, পুলিশ চলে গেল,' কিশোরের কথার পিঠে বলল রবিন। 'তালা দিতে এল দারোয়ান পল। তাকে আহত করে পালাল চোর।'

'আমার মনে হয়, শুধু বেরিয়ে যাবার জন্যে পলকে আহত করেনি চোর,' বলল কিশোর। 'তাহলে এত গুরুতর জখম করত না হয়ত, ওকে হাসপাতালে কিছু দিনের জন্যে সরিয়ে দিতেই কাজটা করেছে সে। গির্জায়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল ছায়াশ্বাপদ। পরের রাতে এসে আবার নিয়ে যাবার ইচ্ছে। পল থাকলে সেটা করতে অসুবিধে। তাই বেচারাকে প্রচণ্ড মার খেতে হল। মেরেই ফেলতে চেয়েছিল কিনা, কে জানে!'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন রাখল মুসা। 'যা শুনেছি, জিনিসটা খুব বেশি বড় নয়। পকেটে নিয়েই স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারত চোর। এত সব ঝামেলায় গেল কেন?'

'পারত, কিন্তু খুব বেশি ঝুঁকি হয়ে যেত,' বলল কিশোর। 'ওর হয়ত ভয় ছিল, স্কোয়াড কারগুলো আবার ফিরে আসতে পারে, কিংবা সবগুলো তখনও যায়ইনি এলাকা ছেড়ে—আড়ালে থেকে গির্জার ওপর চোখ রেখেছে পুলিশ। কিংবা হয়ত পাড়ার সব বাড়িতে তল্লাশি চালাবে রাতের কোন এক সময়ে। তারচেয়ে গির্জায় ছায়াশ্বাপদ লুকিয়ে রেখে যাওয়াটাই নিরাপদ মনে করেছিল সে।'

'তারপর পাদ্রীর ভূতের ছদ্মবেশে গতরাতে আবার এসে ঢুকেছে গির্জায়?'

'আমার তাই ধারণা। এমনিতেই এমন একটা গুজব ছড়িয়ে আছে ওই এলাকায়। বৃদ্ধ পাদ্রীর ছদ্মবেশ নিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। আমি সামনাসামনি দেখেও চিনতে পারিনি। হয়ত কেউই পারত না। বরং তাৎক্ষণিক একটা ধাঁধায় ফেলে দিত যে-কোন দর্শককে, আমাকে যেমন দিয়েছিল।'

'বেশ,' বলল রবিন, 'বুঝলাম। কিন্তু এই সাধু পুরুষটি কে?'

'আর কে?' সঙ্গে সেঙ্গে জবাব দিয়ে দিল মুসা, 'টমি গিলবার্ট। ভূত-প্রেত তার বিষয়। তাছাড়া গতরাতে ডিউটি ছিল না তার। ওই অদ্ভুত ছদ্মবেশ নেবার কথা তার মাথায়ই তো আসবে!'

'আমি কিন্তু মানতে পারছি না,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। টাকাপয়সার লোভ তার আছে বলে মনে হয় না। ও-ধরনের অদ্ভুত সাধনা যারা করে, তাদের প্রথম পাঠই হল, জাগতিক লোভ আর আকর্ষণ ত্যাগ করা।

'কিন্তু ওর টাকার দরকার,' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে রবিন। 'ভারতে যাবার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার।'

'ঠিক, ঠিকই বলেছে রবিন.' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'ভুলে যাচ্ছ কেন, পুলিশ যখন চোরটাকে তাড়া করেছিল, টমি ঘুমিয়ে ছিল

তার ঘরে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'পুলিশ যখন গির্জার ভেতরে খোঁজাখুঁজি করছে, টমি আমাদের সঙ্গেই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোর তখন মূর্তি সেজে গির্জার ভেতরেই ছিল।'

'কিন্তু, একই সঙ্গে দু'জায়গায় থাকতে পারে শুধু টমি,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'তার পক্ষেই গির্জার ভেতরে-বাইরে একই সময়ে থাকা সম্ভব।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'অতি কল্পনা! তবে, টমি কিছু একটা ঘটাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটার ওপর চোখ রাখা দরকার...' থেমে গেল টেলিফোনের শব্দে। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যালো...ও, মিস্টার অলিভার?...এক সেকেণ্ড।' একটা সুইচ টিপে দিল। 'হ্যাঁ, এবার বলুন।'

টেলিফোন লাইনের সঙ্গে স্পীকারের যোগাযোগ করে নিয়েছে কিশোর হেডকোয়ার্টারে বসা সবাই একই সঙ্গে কথা শোনার জন্যে।

'এইমাত্র টেলিফোন করেছিল একটা লোক,' স্পীকারে শোনা গেল অলিভারের কথা, কাঁপা কাঁপা, উত্তেজিত। 'কুকুরের মূর্তিটা আছে এখন ওর কাছে। তোমাদের সন্দেহ ছিল, এমন একটা জিনিস বিক্রি করতে পারবে না সে সহজে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পারছে। ভাল ক্রেতাকেই খুঁজে বের করেছে সে। আমি। দশ হাজার ডলার দাম চেয়েছে সে আমার কাছে!'

দশ

বোমা ফেটেছে যেন ট্রেলারের ভেতর। স্তব্ধ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

'কিশোর? আছ তুমি ওখানে?' আবার শোনা গেল অলিভারের উত্তেজিত কণ্ঠ।

'অ্যাঁ...হ্যাঁ! বলুন!' কোনমতে বলল কিশোর।

'আমি...আমি মনস্থির করতে পারছি না,' বললেন অলিভার। 'একটা চোরের সঙ্গে হাত মেলাব? কিন্তু মূর্তিটাও যে আমার দরকার! ওটা হাতছাড়া করতে পারব না কিছুতেই। টাকাটা দিয়েই দেব কিনা ভাবছি! আমারই জিনিস ওটা। জ্যাককে টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। কাজেই চোরের কাছ থেকে আমি আবার ওটা কিনে নিলে কারও কিছু বলার নেই। দু'দিন সময় দিয়েছে সে আমাকে।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'ইচ্ছে নেই। চোরটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। তাহলে হয়ত চিরদিনের জন্যেই হারাব মূর্তিটা।'

'ভেবে দেখুন ভাল করে,' বলল কিশোর। 'ভয়ানক এক অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছেন। পলকে কি করেছে সে, জানেন।'

'জানি। ভয় পেয়ে গিয়েছিল চোরটা, জান বাঁচানো ফরজ ভেবেছে। পলকে

বেহুঁশ করে পালিয়ে গেছে। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তার, তেমন কিছু করব না। তো, তোমরা কখন আসছ? একা একা ভাল লাগছে না আমার, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি।'

'ছায়াটা এসেছিল আর?'

'না। তবে, এসে পড়তে পারে...সত্যি বড় ভয় পাচ্ছি আমি!'

'তিনটার বাস ধরব আমরা,' দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল কিশোর। ওদের মত জানতে চাইছে। মাথা ঝোঁকাল ওরা। 'আঁধার নামার আগেই পৌঁছে যাব।'

গুড বাই জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'মেরেছে। এবার চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তাঁকে! বাড়তি কিছু কাপড়-চোপড় সঙ্গে নেব, ভাবছি। মিস্টার অলিভারের ওখানে দিনকয়েক থাকার দরকার হতে পারে। তিনটার আগেই বাস স্টেশনে চলে এস। ঠিক আছে?'

মাথা ঝোঁকাল মুসা। 'টমির ওপর চোখ রাখবে বললে...'

'পরে আলোচনা করব ওসব নিয়ে। এখন কিছু জরুরি কাজ সারতে হবে।'

বেরিয়ে চলে গেল রবিন আর মুসা। রবিনের কিছু কাজ আছে লাইব্রেরিতে, সেখানে যাবে। মুসা সোজা চলে গেল বাড়িতে। তার খিদে পেয়েছে।

কিশোরও বেরোল। লোহার একটা আলমারির মরচে পরিষ্কার করায় মন দিল সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘসে। আসলে কোন একটা কাজে মগ্ন থেকে ভাবতে চাইছে সে ঠাণ্ডা মাথায়। দুপুরের খাবার খেতে ডাকলেন মেরিচাচী। খেয়ে এসে সোজা নিজের ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর। ইলেকট্রনিক কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। শেষে যন্ত্রপাতিগুলো বাক্সে গুছিয়ে ভরে নিল। সময় হয়ে গেছে। বাক্সটা নিয়ে বাস স্টেশনের দিকে রওনা হল সে।

'আরে! ওই বাক্সের ভেতর কি?' কৌতূহল ঝরল রবিনের গলায়। 'নতুন কোন আবিষ্কার?'

'একটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা আর রিসিভার,' জানাল কিশোর। 'একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ব্যবহার হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' বলল মুসা। 'আজকাল বেশির ভাগ বড় দোকানেই এ-জিনিস ব্যবহার হচ্ছে। চোর ধরার জন্যে।'

'তোমারটা কোথায় পেলে?' জানতে চাইল রবিন।

'স্টোরে আগুন লেগেছিল,' বলল কিশোর। 'অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। এটাও নষ্ট হয়েছিল। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে চাচা কিনে নিয়ে এসেছেন। খুলে দেখলাম, খুব বেশি কিছু খারাপ হয়নি। সহজেই ঠিক করে নিলাম।'

'এর সাহায্যেই টমির ওপর চোখ রাখব?'

'হ্যাঁ। চত্বরের দিকে কোন জানালা নেই মিস্টার অলিভারের ঘরে। ব্যালকনিতে বসে চোখ রাখা যাবে না। আমরা যাকে দেখব, সে-ও আমাদের দেখে

ফেলবে। কাজেই, এই যন্ত্রটা ছাড়া উপায় নেই। সিঁড়ির নিচে বড় একটা ফুল গাছের ঝাড় আছে। ওটার ভেতর লুকিয়ে রাখব ক্যামেরাটা। ঘরে বসে আরামসে চোখ রাখতে পারব।'

'খাইছে! কিশোর, তোমার তুলনা হয় না!' জোরে হাততালি দিল মুসা। 'ব্যক্তিগত চ্যানেলে টিভি দেখব আজ!'

এক ঘন্টা পর। মিস্টার অলিভারের বাড়িতে এসে পৌঁছুল তিন গোয়েন্দা। ঢোকার মুখেই গেটে দেখা হয়ে গেল সদা-উপস্থিত মিসেস ডেনভারের সঙ্গে।

'আবার এসেছ?' বাক্সটার দিকে চেয়ে আছে মহিলা। 'এটার ভেতর কি?'

'একটা টেলিভিশন সেট,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'মিস্টার অলিভারের জন্যে বড়দিনের উপহার।'

মহিলার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। পুলের ধারে চেয়ারে বসে ধূমপান করছে জ্যাকবস। উপভোগ করছে পড়ন্ত বেলার রোদ। পাশে গামলার মত সেই অ্যাশট্রেটা। প্রতি দুই কি তিন সেকেণ্ড পর পরই ছাই ঝাড়ছে তাতে। কিশোর তাকাতেই হাসল। 'মিস্টার অলিভারের ওখানে থাকবে আজ রাতে?'

'ইচ্ছে আছে,' জবাব দিল কিশোর।

'ভাল,' অ্যাশট্রেতে ঠেসে সিগারেট নেভাল জ্যাকবস। পরীক্ষা করে দেখল, সত্যিই নিবেছে কিনা আগুন। চোখ তুলল। 'মানুষটা বড় বেশি একা। মাঝেমধ্যে সঙ্গ পেলে ভালই লাগবে। আমি তো একা থাকতেই পারি না। আমার ভাগ্নেটা গেছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। দুদিনেই একা একা লাগতে শুরু করেছে আমার।' উঠে দাঁড়াল সে। চলে গেল তার ফ্ল্যাটের দিকে।

দোড়গোড়াতেই ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা করছেন অলিভার। টেলিভিশন ক্যামেরাটা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। 'কখন সেট করবে?'

'সাঁঝের দিকে,' বলল কিশোর, 'অন্ধকার হয়ে এলে। এই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।'

'হ্যাঁ, সেটাই উপযুক্ত সময়,' বললেন অলিভার। 'তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চত্বরে আলো জ্বলে ওঠে আপনাআপনি।'

৫—২০-এ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল কিশোর। আশপাশটা দেখল। পেছনে চেয়ে নিচু গলায় বলল, 'বের করে নিয়ে এস। কেউ নেই।'

দ্রুত সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। একটা ধাতব তেপায়ার ওপর ক্যামেরাটা বসাল কিশোর, কায়দা করে লুকিয়ে রাখল ফুলঝাড়ের ভেতর। দ্রুতহাতে লেন্স অ্যাডজাস্ট করল, প্রায় পুরো চত্বরটাই এসে গেল ক্যামেরার চোখের নাগালে।

'ট্রানজিসটরাইজড করা আছে ক্যামেরাটা,' আবার ঘরে ঢুকে দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। 'ব্যাটারিতে চলে। দূরত্ব খুব বেশি না, তবে আমাদের কাজের জন্যে যথেষ্ট।'

সদর দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। একটা বুককেসের ওপর রাখল টেলিভিশনটা। বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে কানেকশন করে দিয়ে ডায়াল ঘোরাল। সেকেণ্ডখানেক পরেই আবছা আলো দেখা গেল পর্দায়, কাঁপছে।

'কই?' বলে উঠল মুসা, 'কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না!'

'যাবে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'চত্বরে আলো জ্বলে উঠলেই দেখতে পাবে।'

মিনিট কয়েক পরেই দপ করে জ্বলে উঠল আলো। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে ওরা টেলিভিশনের পর্দার দিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পুরো চত্বরটা। নির্জন।

প্রথমে টমি গিলবার্টকে দেখা গেল। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পাশের সরু গলি ধরে চলে গেল। ফিরে এল খানিক পরেই। হাতে একটা লণ্ড্রি ব্যাগ। আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

তারপর দেখা গেল একটা মেয়েকে, সোনালি চুল। সামনের গেট দিয়ে চত্বরে ঢুকল।

'লারিসা ল্যাটনিনা,' বললেন অলিভার।

গটগট করে নিজের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লারিসা। চাবি বের করে তালায় ঢোকাল। ঠিক এই সময় তার পেছনে এসে উদয় হল মিসেস ডেনভার। হাতে ছোট একটা প্যাকেট।

'নিশ্চয় ডাকে এসেছে, কিংবা কেউ দিয়ে গেছে প্যাকেটটা,' বললেন অলিভার। 'লারিসার জন্যে। ভাড়াটেরা যখন বাড়ি থাকে না, তাদের কোন জিনিস এলে সই করে রেখে দেয় ম্যানেজার। এটা তার দায়িত্ব।'

'নিশ্চয় কাজটা তার খুব পছন্দ,' বলল মুসা।

'ঠিক ধরেছ,' বললেন অলিভার। 'চুরি করে খুলে দেখে নিশ্চয়। ভাড়াটেদের সম্পর্কে জ্ঞান আরও বাড়ে তার। বদস্বভাব!'

প্যাকেটটা লারিসার হাতে তুলে দিয়েছে ম্যানেজার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। নিশ্চয় জানতে চাইছে ভেতরে কি আছে।

হতাশ একটা ভঙ্গি ফুটল লারিসার হাবভাবে। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে প্যাকেটের মোড়ক খুলতে শুরু করল।

এই সময় নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকবস। থেমে দাঁড়াল। লারিসা আর মিসেস ডেনভার কি করছে, দেখছে।

'লোকের গোপনীয়তা বলতে কিচ্ছু নেই এ-বাড়িতে!' বলেই ফেলল মুসা।

বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন অলিভার। 'ওই বুড়িটার কথা কেন শুনছে লারিসা!

নেব না, বলে মানা করে দিলেই হত! খুব বেশি সরল।'

মোড়ক খুলে ফেলেছে লারিসা। একটা টিনের বাক্স। ডালা খুলল। হাসি ফুটল তার মুখে। দুই আঙুলে কিছু একটা বের করে এনেই মুখে ফেলল। মিসেস ডেনভারকেও সাধল। মাথা নাড়ল ম্যানেজার।

'চকলেট,' বলল কিশোর।

'খামোকা সাঁতার কাটে!' বললেন অলিভার। 'অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া বাদ দিলেই হয়ে যেত। মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত না আর।'

বাক্স থেকে আরেকটা চকলেট বের করে মুখে ফেলল লারিসা। ডালা বন্ধ করল। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে গলার কাছে উঠে এল তার হাত। বাক্সটা খসে পড়ে গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চকলেটগুলো।

'আরে···!' কথা আটকে গেল মুসার।

টলে উঠল লারিসা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল। পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। হাত-পা ছুঁড়ছে, মোচড়াচ্ছে শরীরটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিন কিশোর। হ্যাঁচকা টানে সদর দরজা খুলে ফেলল কিশোর, বেরিয়ে এল। এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে চলল নিচে।

'মিস ল্যাটনিনা!' কানে আসছে ম্যানেজারের শঙ্কিত কণ্ঠ। 'কি হয়েছে?'

'ব্যথা!' গুঙিয়ে উঠল লারিসা। 'জ্বলে যাচ্ছে··· ওহ্‌হ্!···মাগো···'

ছুটে এসে দাঁড়াল কিশোর। নিচু হয়ে একটা চকলেট তুলে নিল। পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। অলিভার এলেন। হাঁপাচ্ছেন তিনি।

তীক্ষ্ণ চোখে চকলেটটা দেখল কিশোর। নাকের কাছে তুলে এনে শুঁকল। ফিরে চাইল।

লারিসার ওপর ঝুঁকে বসেছে জ্যাকবস। টমি গিলবার্টও বেরিয়ে এসেছে। বেরোচ্ছে ব্রায়ান এনড্রু।

কিশোরের হাত খামচে ধরল মিসেস ডেনভার। 'কি···কি আছে ওটাতে?'

তালুতে রেখেই চাপ দিয়ে চকলেটটা দলে-মুচড়ে ফেলল কিশোর। আবার নিয়ে এল নাকের কাছে। শুঁকল। চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি! জলদি অ্যামবুলেন্স ডাকুন! মনে হয় বিষ খাওয়ানো হয়েছে, মিস ল্যাটনিনাকে!'

এগারো

'অ্যামবুলেন্স ডাকার সময় নেই!' চেঁচিয়ে বলল জ্যাকবস। 'আমার গাড়িতে করেই নিয়ে যাচ্ছি ইমার্জেনসীতে!'

'আমি যাব আপনার সঙ্গে!' বলে উঠল মিসেস ডেনভার।

'বাক্সতে তুলে চকলেটগুলোও নিয়ে যান,' বলল কিশোর। 'পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।'

গ্যারেজ থেকে দ্রুত গাড়ি বের করল জ্যাকবস। পাঁজাকোলা করে লারিসাকে তুলে নিল মুসা। গাড়িতে তুলে দিল। একটা কম্বল এনে মেয়েটার গায়ে জড়াল মিসেস ডেনভার। চকলেটসহ বাক্সটা তার হাতে গুঁজে দিল কিশোর। ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

'বিষ!' এতক্ষণে কথা বললেন অলিভার। 'বেচারি! বিষ খাওয়াল কে?'

'বিষই কিনা জানি না, মিস্টার অলিভার!' পুলের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলাম চকলেটটাতে!'

দুই ঘন্টা পরে ফিরে এল জ্যাকবস আর মিসেস ডেনভার। সেন্ট্রাল হসপিটালে রেখে এসেছে লারিসাকে। ক্লান্ত, বিষণ্ন চেহারা দু'জনেরই।

'নিজেকে এত অপরাধী মনে হয়নি আর কখনও!' বলল ম্যানেজার।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে সবে রাতের খাওয়া শেষ করেছেন, এই সময় জ্যাকবসের গাড়ির শব্দ কানে এল। চারজনেই ছুটে নেমে এসেছে চত্বরে।

'পুলিশ!' মুখ বাঁকাল মিসেস ডেনভার। 'বিচ্ছিরি সব প্রশ্ন করতে শুরু করল! কতক্ষণ বাক্সটা আমার কাছে রেখেছি, কোথায় রেখেছি, কেন রেখেছি, এমনি সব প্রশ্ন। আমি কি করেছি না করেছি তাতে তোমাদের কি, বল!'

'আসলে কি ঘটেছে, বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ,' জ্যাকবসের কণ্ঠে ক্লান্তি।

'বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে? ওদের কি ধারণা, আমি বিষ খাইয়েছি মেয়েটাকে? ওদের জানা উচিত, জীবনে মানুষ তো দূরের কথা, কোন ইঁদুরকেও বিষ খাওয়াইনি আমি!' শেষদিকে ধরে এল ম্যানেজারের গলা। গটমট করে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল নিজের ফ্ল্যাটের। ভেতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল আবার। তালা লাগানর শব্দ হল।

'কি হয়েছিল, জ্যাকবস?' বেরিয়ে এসেছে এনড্রু।

'বিষাক্ত কিছু ছিল চকলেটে,' জানাল জ্যাকবস, 'ডাক্তারদের ধারণা। হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেছে অ্যানলাইসিসের জন্যে। মিস ল্যাটনিনার স্টমাক ওয়াশ করে একটা প্রাইভেট রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারারাত পর্যবেক্ষণে রাখবে ডাক্তাররা। পুলিশকে খবর দেয়া হল। ওরা এসেই ছেঁকে ধরল মিসেস ডেনভারকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে বেচারিকে। ভালই হয়েছে। শিক্ষা হবে এতে কিছুটা। আক্কেল থাকলে জীবনে আর অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছে, যে কাররই প্রথম সন্দেহ পড়বে তার ওপর।'

'চকলেট এসেছে কিভাবে, জানেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ডাকে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

খুলে গেল মিসেস ডেনভারের দরজা। এরই মাঝে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বেরিয়েই পুলের দিকে তাকাল। 'প্রতিটি খারাপ ঘটনার একটা ভাল দিকও থাকে। যা আবহাওয়া আর ঠাণ্ডা, ইদানীং শুধু লারিসাই নামত পুলে। দিন কয়েক আর নামতে পারবে না। এই সুযোগে পানি সরিয়ে পুলটা পরিষ্কার করে ফেলতে পারব। অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি।'

কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল জ্যাকবস। কাঁধ ঝাঁকাল। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। এনড্রুও চলে গেল।

ম্যানেজারের দিকে তাকালেন অলিভার। চোখে ঘৃণা। তিনিও এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ব্যালকনিতে উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মায়ামমতা বলতে কিছু নেই বুড়িটার! ওদিকে মারা যাচ্ছে মেয়েটা। আর বুড়ি বলছে, ভালই হয়েছে! পুল পরিষ্কারের সময় পাওয়া গেল! ওটাকে এবার তাড়াব আমি!'

'কে বিষ খাওয়াল মেয়েটাকে?' ঘরে ঢুকেই আরেকবার প্রশ্নটা করলেন অলিভার।

'এমন কেউ, যে মিস ল্যাটনিনার স্বভাব-চরিত্র জানে,' বলল কিশোর, 'যে জানে, সে কখন কি করে না করে। জানে, চকলেট তার প্রিয় জিনিস, পেলেই খাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন বিষ খাওয়ানো হল তাকে?'

কেউ কোন জবাব দিল না।

আড়াআড়ি পা মুড়ে মেঝেতেই বসে পড়ল কিশোর। টেলিভিশনের ওপর চোখ রাখতে সুবিধে।

'বেশ মজার জায়গায় বাস করেন আপনি, মিস্টার অলিভার,' টিভির পর্দার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। শূন্য চত্বর। 'মাত্র তিন দিন আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এখানে এসেছি, সে-ও তিন দিন। এরই মাঝে কয়টা ঘটনা ঘটল! দু'বার অদ্ভুত এক ছায়াকে দেখলাম, চুরি করে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ল মিসেস ডেনভার, দামি একটা জিনিস চুরি হল, তারপর সেই জিনিসের জন্যে টাকাও দাবি করল চোর। এখন, আপনার এক ভাড়াটেকে বিষ খাওয়াল কেউ।'

'গির্জার দারোয়ানের কথা বাদ দিলে কেন?' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'তাকে মেরে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে গেল। তুমি গিয়ে ভূত দেখলে গির্জায়, ভাটকা পড়লে।'

'একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঠিক মেলে না!' আপনমনেই বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিন্তু, আমার ধারণা, প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে কোথাও একটা

যোগসূত্র রয়েছে। একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে। ঘটনার কেন্দ্রস্থল এই বাড়িটা। যা-ই ঘটছে, এর ভেতরে, কিংবা আশেপাশে, কাছাকাছি।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল মুসা। 'আর ঘটছে, টমি গিলবার্ট যখন বাড়ি থাকছে তখন। ও কাজে চলে গেলে আর কিচ্ছু ঘটে না।'

ঝট করে মাথা তুললেন অলিভার। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পুরো ঘরে। চাপা গলায় বললেন, 'আস্তে! কে জানে, এ মুহূর্তে হয়ত এ-ঘরেই রয়েছে সে ছায়া হয়ে। আমাদের কথা শুনছে!'

উঠে পড়ল রবিন। সব কটা আলো জ্বেলে প্রতিটি কামরা ভাল করে দেখে এল। না, কোথাও ছায়াটা চোখে পড়ল না। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না অলিভার। শঙ্কা গেল না চেহারা থেকে। উঠে গিয়ে এঁটো বাসন-পেয়ালা ধোয়ায় মন দিলেন। টেলিভিশনের সামনে বসে রইল তিন গোয়েন্দা।

পরের কয়েকটা ঘন্টা কিছুই ঘটল না। চত্বরে কেউই বেরোল না, মিসেস ডেনভার ছাড়া। ময়লা ফেলার জন্য বেরিয়েছিল। ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েই আবার গিয়ে ঘরে ঢুকেছে। বিরক্ত হয়ে উঠছে ছেলেরা, চোখে ঘুম।

'দেখ!' হঠাৎ শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কিশোরের।

পর্দায় দেখা গেল, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে টমি। পুলের কিনারে এসে দাঁড়াল। চেয়ে আছে পানির দিকে। ঘুম চলে গেল মুসা আর রবিনের চোখ থেকেও।

জ্যাকবসের ঘরের দরজা খুলে গেল এই সময়। বেরিয়ে এল সে। ঠোঁটে সিগারেট, হাতে অ্যাশট্রে। কাছে এসে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল টমির দিকে চেয়ে। একটা টেবিলে অ্যাশট্রে রেখে তাতে সিগারেট চেপে নেবাল। গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। মুসা গিয়ে দাঁড়াল একটা জানালার কাছে, রাস্তার দিকে তাকাল।

'কোথাও যাচ্ছে সে,' জানালার কাছ থেকেই বলল মুসা। 'খুব জোরে চালাচ্ছে।'

'হয়ত হাওয়া খেতে যাচ্ছে,' বললেন অলিভার। 'ঘুম আসছে না হয়ত। অস্বস্তি বোধ করছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে অনেকেরই এমন হয়।'

ঘরে ফিরে গেল টমি। পর্দা টেনে দিল জানালার।

'খাইছে!' আবার টেলিভিশনের সামনে এসে বসেছে মুসা। 'ব্যাটা কি করছে, দেখতে পাব না আর!'

'কাপড় পরছে হয়ত,' বলল কিশোর। 'কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। মাঝরাত থেকে তার ডিউটি।'

ঠিক এই সময় নিবে গেল চত্বরের আলো। সেই সঙ্গে নিবে গেল টেলিভিশনের পর্দার আলো। হালকা ধূসর-নীল একটা উজ্জ্বলতা রয়েছে শুধু. টমির

জানালার আলো কোনাকুনিভাবে পড়েছে ক্যামেরার চোখে।

'আরও ভাল হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এবার আর কিছুই দেখতে পাব না!'

'অটোমেটিক টাইমার লাগানো আছে চত্বরের লাইটিং সিসটেমের সঙ্গে,' বললেন অলিভার। 'ঠিক এগারোটায় অফ হয়ে যায় বাতি।'

'আমাদেরও টেলিভিশন অফ করে দিতে হচ্ছে,' উঠে গিয়ে সুইচ টিপে সেটটা বন্ধ করে দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, আর দরকার কি ওটার?' বলল মুসা। 'তবে, টমি ব্যাটা কোথায় যাচ্ছে, দেখা দরকার। তোমরা বস। আমি ব্যালকনিতে যাচ্ছি। অন্ধকারে ও আমাকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। তেমন বুঝলে নেমে গিয়ে ফুল ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখব।'

'খবরদার, বেল-টেল বাজাবে না!' হুঁশিয়ার করে দিল কিশোর। 'আস্তে করে টোকা দেবে দরজায়। আমরা বেরোব।'

'ঠিক আছে,' উঠে গিয়ে স্কি-জ্যাকেটটা তুলে নিল মুসা। গায়ে চড়াল। সুইচ টিপে বসার ঘরের আলো নিবিয়ে দিল রবিন। মুহূর্তে দরজা খুলে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল মুসা। পেছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তবে এবার তালা লাগানো হল না ভেতর থেকে।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। জানে, দরজার ওপাশে তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কিশোর আর রবিন। সে ইঙ্গিত দেয়ামাত্র ছুটে বেরোবে ওরা।

আরও খানিকক্ষণ জ্বলল টমির ঘরের আলো, তারপর নিবে গেল। অপেক্ষা করে রইল মুসা। যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে টমি। সময় যাচ্ছে; কিন্তু বেরোল না সে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা রশ্মি এসে পড়েছে পুলের পানিতে, অন্ধকার গাঢ় হতে পারছে না ওই জায়গাটুকুতে। ওই আলোর জন্যেই অবছাভাবে চোখে পড়ছে টমির ঘরের বারান্দা। মুসার চোখ এড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরোতে পারবে না সে।

সময় যাচ্ছে। মাঝরাত পেরোল। শোনা গেল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। খানিক পরেই গেটে দেখা গেল একটা লোককে। সতর্ক হয়ে উঠল মুসা। পরক্ষণেই ঢিলা পড়ে গেল আবার সতর্কতায়। পুলের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা। ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস। অ্যাশট্রেটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পরক্ষণেই আলো জ্বলল তার পর্দা ঢাকা জানালায়।

চোখ মিটমিট করল মুসা। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড জ্যাকবসের ওপর চোখ ছিল, দৃষ্টি সরে গিয়েছিল বারান্দার ওপর থেকে। ঠিক ওই সময়ে বেরিয়ে এসেছে টমি জ্যাকবসের ঘরের আবছা আলো পড়ছে তার ওপর। ঘুমোনর পোশাক

পরনে। পুলের ধার ধরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে জ্যাকবসের ঘরের দিকে। হঠাৎ...

আবার চোখ মিটমিট করল মুসা। দু'হাতে রগড়াল। স্বপ্ন দেখছে না তো! টমি নেই! হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে!

দ্রুত দরজায় টোকা দিল মুসা। পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। দ্রুত চত্বর পেরিয়ে গিয়ে টমির দরজা আগলে দাঁড়াবে। কোন পথে ঘরে ঢোকে টমি, দেখবে।

ছুটছে মুসা। পুলের ধারে পৌছতেই পায়ের তলায় পড়ল কি যেন! নরম, জ্যান্ত! তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল!

আঁতকে উঠে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা। সে পা তুলতে না তুলতেই ওটাও লাফ দিয়েছে। পড়ল গিয়ে তার আরেক পায়ের তলায়। আরও জোরে আর্তনাদ করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠে আবার সামনে লাফ দিল মুসা। মাটিতে পা ঠেকল না। টের পাচ্ছে, প্যান্টের ঝুল আঁকড়ে ধরে ঝুলছে কিছু একটা। আঁচড় লাগছে পায়ের চামড়ায়। ঝপাং করে পড়ল গিয়ে সে পানিতে।

ঝট করে খুলে গেল এনড্রুর ঘরের দরজা।

দপ করে আবার জ্বলে উঠল চত্বরের আলো।

পুলের ধার খামচে ধরে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে মুসা। শব্দ তুলে মুখ থেকে ফেলছে ক্লোরিন মেশানো পানি।

তার কাছিকাছিই পুলের ধার ধরে সাঁতরাচ্ছে আরেকটা জীব। নিচু হয়ে ঘাড়ের চামড়া ধরে ওটাকে তুলে নিল এনড্রু। কালো একটা বেড়াল।

'তুমি...তুমি একটা অমানুষ!' মুসার দিকে চেয়ে ধমকে উঠল বেড়াল-মানব।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে ডাঙায় উঠে এল মুসা। ভেজা শরীরে সুঁচ ফোটাচ্ছে যেন কনকনে ঠাণ্ডা।

'মিস্টার অলিভার!' নাকা তীক্ষ্ণ গলা। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে মিসেস ডেনভার। গায়ে কম্বল জড়ানো। এলোমেলো চুল। 'মিস্টার অলিভার, ছেলেগুলোকে আটকে তালা দিয়ে রাখলেন না কেন? লোকের ঘুম নষ্ট করছে!' এমনভাবে বলল মহিলা, যেন সে-ই এই বাড়ির মালিক।

অলিভারের সাড়া নেই। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে কিশোর।

হঠাৎ আবার উদয় হয়েছে টমি তার ঘরের দরজায়।

'আমার...আমার ঘুম আসছিল না,' বিড়বিড় করে বলল মুসা।

জ্যাকবসের দরজাও খুলে গেছে। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে, 'আবার কি হল?'

'আমার বেড়ালটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ছোঁড়াটা!' রাগ এখনও পড়েনি বেড়াল-মানবের। ভেজা চুপচুপে জানোয়ারটাকে কোলে তুলে নিয়েছে, হাত বোলাচ্ছে গায়ে। 'আর ভয় নেই, খোকা,' মোলায়েম গলায় বলল এনড্রু। 'চল, গা

মুছিয়ে দিচ্ছি। চুলার ধারে বসলেই গা গরম হয়ে যাবে আবার। বাজে ছেলেদের ব্যবহারই ওরকম, মন খারাপ কোরো না।'

'আর যেন তোমাকে এসব করতে না দেখি!' মুসাকে হুঁশিয়ার করল মিসেস ডেনভার।

'না, ম্যাডাম, করব না,' তাড়াতাড়ি বলল গোয়েন্দা সহকারী।

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিসেস ডেনভার। গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল তার ঘরে।

'আজও ছুটি।' টমির দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

মাথা ঝোঁকাল টমি।

'কেমন কাটছে ছুটি? ভাল?'

'না···হ্যাঁ···ঠিক তা না!···কি যেন···'

'কি?'

'না, কিছু না,' চোখ রগড়াচ্ছে টমি। 'মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলাম!···চলি···'

দ্রুত ফিরে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল টমি।

অলিভারের ঘরে এসে ঢুকল মুসা, পেছনে কিশোর। বড় একটা তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছেন অলিভার। বাথরুমে গরম পানির শাওয়ার ছেড়ে দিয়েছে রবিন।

'টমি কোত্থেকে উদয় হল?' কিশোরের দিকে চেয়ে জ্যাকেট খুলছে মুসা। 'পুলের ধার ধরে জ্যাকবসের ঘরের দিকে যেতে দেখলাম। হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে! ওকে খুঁজতে গিয়েই এই বিপত্তি।'

'ওর ঘর থেকেই তো বেরোতে দেখলাম,' বলল কিশোর। 'তুমি তখন পানিতে।'

'অসম্ভব!' জ্যাকেটের চেনে আঙুল থেমে গেছে মুসার। 'আমি যখন পুলে পড়েছি, টমি তার ঘরে ছিল না। নিজের চোখে দেখেছি, জ্যাকবসের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়েই হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে। কোন্ দিকে গেল, দেখিনি। তবে নিজের ঘরে যায়নি, আমি শিওর!'

বারো

বাকি রাতটা ব্যালকনিতে বসে পালা করে পাহারা দিয়ে কাটাল রবিন আর কিশোর। অন্ধকার চত্বর। আলো নিবিয়ে দিয়েছে আবার মিসেস ডেনভার। চত্বরের বাতির মেইন সুইচ তার ঘরে। নির্দিষ্ট সময়ে অটোমেটিক কাজ করে লাইটিং সিসটেম, তবে দরকার পড়লে যে-কোন সময় ওই সুইচ টিপে আলো জ্বালানো-নেবানো যায়।

ভোর চারটা অবধি নির্জন, শূন্য রইল চত্বর। তারপরই বেরিয়ে এল মিসেস ডেনভার। পরনে টুইডের ভারি কোট। তাকে দেখেই ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর।

সারাটা রাত বসার ঘরে সোফায় বসে থেকেছেন মিস্টার অলিভার। ঘুমোতে যাননি। ওখানেই বসে বসে ঢুলেছেন।

'মিসেস ডেনভার বাইরে যাচ্ছে,' বলল কিশোর।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' শান্ত রয়েছেন অলিভার।

'এই ভোর রাতে!'

হাই তুললেন অলিভার। 'চব্বিশ ঘন্টাই বাজার খোলা থাকে, জানই। হপ্তায় একবার বাজার করে ডেনভার, বিষ্যুদ বারে। ভোর চারটের সময় বেরোয়।'

অলিভারের দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

'তার বক্তব্য, এই সময় বাজারে ভিড় থাকে না,' বললেন অলিভার। 'কেনাকাটা করতে সুবিধে। আমার ধারণা অন্য। এ-সময়ে ভাড়াটেরা সব ঘুমিয়ে থাকে। বুড়িটারও দেখার কিছু নেই। জ্যাকবস অফিসে যায় ভোর পাঁচটায়। এক ঘন্টা সময় হাতে থাকছে ডেনভারের। বাজার সেরে ফিরে আসতে পারে সে নিশ্চিন্তে।'

কথাবার্তায় তন্দ্রা থেকে জেগে উঠেছে রবিন আর মুসা।

'তার মানে,' বলল মুসা, 'আপনি বলতে চাইছেন, লোকে কে কি করছে না করছে, দেখার জন্যে বাড়ি থেকেই বেরোয় না মিসেস ডেনভার? ভাড়াটেরা সব না ঘুমোলে বাজারেও যায় না?'

'তাই,' মাথা ঝোঁকালেন অলিভার। 'আশ্চর্য এক চরিত্র! জাল ছেড়ে যেমন মাকড়সা কোথাও যায় না, ওই বুড়িটাও তেমনি। এই বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চায় না। খালি লোকের ওপর চোখ। যেন এসব দেখার জন্যেই বেঁচে আছে সে!'

উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালার সামনে দাঁড়াল রবিন। টেনে পর্দা সরিয়ে দিল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। ধূসর সিডান গাড়িটাকে দেখতে পেল সে।

'আশ্চর্য! হপ্তায় মাত্র একবার গাড়িটা চালায়!' জানালার কাছ থেকেই বলল রবিন। 'ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় না?'

'প্রায়ই দেখি গ্যারেজে খবর দেয়,' বললেন অলিভার। 'মেকানিকস আসে।'

এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। সামনেই মোড়। ঠিক এই সময় বুমম করে শব্দ হল। শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন অলিভার।

কিশোর আগেই উঠে পড়েছে। ছুটে যাচ্ছে জানালার দিকে।

পাগলের মত ডানে-বাঁয়ে কাটছে সিডানের নাক। হুডের নিচ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আবার চেঁচিয়ে উঠল মিসেস ডেনভার। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে গাড়ি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সামনের এক পাশ দিয়ে গুঁতো মারল রাস্তার পাশের দেয়ালে। ঘষে এগোল। বাম্পারের ধাক্কা লাগাল মোটা একটা পানির পাইপে। ভোঁতা শব্দ তুলে মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপর থেকে ছিঁড়ে গেল পাইপ। ওটার ওপরে এসে গাড়ি থামল। চারপাশ থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরোচ্ছে পানি। আবার শোনা গেল মিসেস ডেনভারের চিৎকার।

'দমকল ডাকতে হবে!' ফোন করতে ছুটল মুসা।

দরজার দিকে ছুট লাগিয়েছে রবিন। 'আগে বের করে আনা দরকার মহিলাকে!'

কিশোরও ছুটল রবিনের পেছনে।

হুড়মুড় করে চত্বরে নেমে এল দু'জনে। বেরিয়ে এসেছে জ্যাকবস, গায়ে ঘুমানর পোশাক। টমি গিলবার্টও বেরিয়েছে। পাজামা পরনে, গায়ে তাড়াহুড়ো করে একটা কোট চাপিয়েছে। গেটের দিকে ছুটেছে।

সবার আগে ছুটছে জ্যাকবস। 'মিসেস ডেনভার!' চেঁচিয়ে উঠল সে সিডান-টাকে দেখেই।

টমির পাশ কাটিয়ে এল ছেলেরা, জ্যাকবসকে পেছনে ফেলে এল। ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়িটার পাশে। বরফ-শীতল পানি ভিজিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর, গ্রাহ্যই করছে না।

স্টিয়ারিঙের পেছনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে চেঁচাচ্ছে মিসেস ডেনভার। তার এ-চিৎকার যেন বন্ধ হবে না আর কোনদিন।

'মিসেস ডেনভার!' হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান লাগাল কিশোর। খুলল না দরজা। বোধহয় তালা আটকানো।

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জ্যাকবস। জানালায় থাবা দিচ্ছে জোরে জোরে।

খুব ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল মিসেস ডেনভার। শূন্য দৃষ্টি। চেঁচানো থামেনি।

'দরজা খুলুন!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকবস। 'তালা লাগিয়েছেন কেন?'

হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল মিসেস ডেনভার। থাবা মারল লক-বাটনের দিকে। এক সেকেণ্ড পরেই হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল জ্যাকবস। টেনে-হিঁচড়ে মহিলাকে বের করে আনতে লাগল, রবিন সাহায্য করল তাকে।

সাইরেনের শব্দ কানে এল। কয়েক মুহূর্ত পরেই মোড়ের কাছে দেখা গেল ফায়ার ব্রিগেডের ইমার্জেনসী ট্রাক। কাছে এসে টায়ারের তীব্র কর্কশ আর্তনাদ তুলে থেমে গেল গাড়ি। লাফিয়ে নেমে এল একদল কালো রেনকোট পরা লোক। এক পলক দেখেই পুরো অবস্থাটা যাচাই করে নিল তাদের অফিসার। চেঁচিয়ে আদেশ দিল।

আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। গিয়ে থামল মোড়ের কাছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বন্ধ হয়ে গেল পানির ফোয়ারা।

মিসেস ডেনভারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কিশোর, রবিন, জ্যাকবস আর টমি। স্তব্ধ হয়ে গেছে মহিলা। প্রচণ্ড শক খেয়েছে।

'পানি বন্ধ করলেন কি করে?' একজন ফায়ারম্যানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল জ্যাকবস।

'মোড়ের কাছে মাস্টার ভালভ আছে একটা,' জানাল ফায়ারম্যান। মিসেস ডেনভারের দিকে তাকাল। 'কোথায় চলেছিলেন?'

জবাব দিল না মিসেস ডেনভার।

'ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার,' বলল জ্যাকবস। 'ঠাণ্ডা লেগে যাবে। নিউমোনিয়া বাধিয়ে বসলেও অবাক হব না।'

দু'দিক থেকে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে মিসেস ডেনভারকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে এল কিশোর আর রবিন। গাড়িতে পড়ে থাকা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ঘরের চাবি নিয়ে এসেছে জ্যাকবস। সঙ্গে এসেছে একজন ফায়ারম্যান। একজন পুলিশ অফিসারও এসে হাজির হয়েছে পেছন পেছন।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল অফিসার।

বসার ঘরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে মিসেস ডেনভার। 'কেউ গুলি করেছিল আমাকে।' চাপা গলা। ঠোঁট নড়লই না যেন কথা বলার সময়।

'ভেজা কাপড় খুলে ফেলুন জলদি,' শান্ত কণ্ঠে বলল অফিসার। 'তারপর, ভাল বোধ করলে, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

মাথা ঝোঁকাল মিসেস ডেনভার। টলমল করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে।

তারও দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে, এতক্ষণে খেয়াল করল যেন কিশোর। 'আমারও কাপড় বদলানো দরকার।'

'কিছু দেখেছিলে?' জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।

'আমি দেখেছি,' বলে উঠল রবিন। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে তারও। 'গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা শব্দ...'

'যাও,' রবিন আর কিশোরকে বলল অফিসার। 'আগে কাপড় বদলে এস। তারপর শুনব।'

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। কাঁপতে কাঁপতে এসে ঢুকল অলিভারের বসার ঘরে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন অলিভার আর মুসা। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল দু'জনেই।

'বুড়িটার কি অবস্থা?' জানতে চাইলেন অলিভার।

'ভালই,' বলল কিশোর। 'ঠাণ্ডায় কাঁপছে, আর কিছু না।'

'হুঁ,' আবার রাস্তার দিকে ফিরলেন অলিভার।

তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে নিল রবিন আর কিশোর। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার এসে ঢুকল মিসেস ডেনভারের ঘরে। পুলিশ অফিসার নেই, ঘটনাস্থলে চলে গেছে।

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। দুর্ঘটনাস্থলে চলল।

ফায়ারব্রিগেডের আরও একটি ট্রাক আর দুটো পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হয়েছে। সাদা পোশাক পরা পুলিশের গোয়েন্দাও এসেছে একজন। তার সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ অফিসার।

দুই গোয়েন্দাকে দেখেই এগিয়ে এল অফিসার।

যা যা দেখেছে, শুনেছে, পুলিশকে জানাল কিশোর আর রবিন।

'কেউ মহিলাকে গুলি করে থাকলে, মিস করেছে,' বলল সাদা-পোশাক পরা গোয়েন্দা।

'ঠিক গুলির শব্দ না,' বলল কিশোর। 'বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ।'

গাড়িটা পরীক্ষা করছিল দু'জন পুলিশ। এগিয়ে এল ওরা। 'গুলির ছিদ্র নেই।'

পানির পাইপের ওপর থেকে গাড়ি সরানর কাজে লাগল দমকলবাহিনী। সিডানের বাম্পারে শিকল বেঁধে, শিকলের অন্য মাথা আটকাল ট্রাকের পেছনের হুকে। টান দিল। সরে এল সিডান।

অন্য ট্রাকের হেডলাইটের আলো পড়েছে সিডানটা এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে। মাটিতে পড়ে থাকা লালচেমত এক টুকরো কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল ওটা। দেখল। 'ধোঁয়ার কালি মনে হচ্ছে!'

'কি?' ফিরে তাকাল গোয়েন্দা।

'ধোঁয়ার কালি,' আবার বলল কিশোর। 'শব্দটা হবার পর গাড়ির হুডের তলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।'

দ্রুতপায়ে সিডানের কাছে এগিয়ে গেল গোয়েন্দা। বনেট তুলে ফেলল। তার পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল পুলিশ অফিসার। কিশোরও এসে দাঁড়াল পাশে।

ইঞ্জিন-ব্লকের ওপর পড়ে আছে কয়েক টুকরো লালচে কাগজ, আর পোড়া-আধপোড়া কিছু তুলো। পুড়ে গেছে রিডিয়েটর হোস, ফ্যানের বেল্ট ছেঁড়া।

'না, গুলি করেনি,' মাথা নাড়াল সাদা-পোশাক পরা গোয়েন্দা। 'বিস্ফোরণ। বোমা ফাটানো হয়েছে।'

ঘটাং করে বনেটটা আবার নামিয়ে রাখল গোয়েন্দা। 'নিয়ে যাও!' ট্রাকের ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল। 'পুলিশ গ্যারেজে নিয়ে রাখবে।'

জ্যাকবস এসে হাজির হয়েছে আবার। কিশোরের প্রায় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে টমি গিলবার্ট। বেড়াল-মানব এনড্রুও এসে হাজির হয়েছে, পরনে

পাজামা, গায়ে একটা কম্বল জড়ানো।

'ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল!' বলে উঠল এনড্রু।

ঘুরে চাইল গোয়েন্দা। 'কোন শত্রু ছিল মহিলার?'

'ছিল মানে?' জবাবটা দিল জ্যাকবস। 'পুরো এক বাড়ি ভর্তি শত্রু। তবে ওদের কেউ বোমা মেরে মারতে চায় ওকে, মনে হয় না? এত শত্রুতা নেই।'

'আপনি?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা।

'আমার নাম ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস,' হাই তুলল স্টকব্রোকার। 'মিস্টার অলিভারের বাড়িতে ভাড়া থাকি।'

'আপনি কিছু দেখেছেন?'

'না। বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে এসে দেখি, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। পাইপ ছেঁড়া, ফোয়ারার মত পানি ছিটকে বেরোচ্ছে। এই ছেলেগুলোর সাহায্যে মহিলাকে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বের করলাম,' আবার হাই তুলল জ্যাকবস। 'রাতে ভাল ঘুম হয়নি।...যাই, ঘুমোইগে।...যদি আপনার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, দুপুরে আসবেন। তার আগে আর ঘুম থেকে উঠছি না আমি।' হাই তুলতে তুলতে চলে গেল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে জ্যাকবসের গমন পথের দিকে তাকাল পুলিশ অফিসার। তারপর তাকাল অলিভারের বাড়িটার দিকে। বিড়বিড় করল, 'আশ্চর্য? গত দু'দিনে জায়গাটাতে কয়েকটা অঘটন ঘটল পর পর! মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!'

পুবের আকাশে ধূসর আলো। সূর্য ওঠার দেরি নেই।

'চল, আমরাও যাই,' রবিনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'ঘুম পেয়েছে।'

'চল,' বড় করে হাই তুলল রবিন।

তেরো

রাতে ঘুম হয়নি, তাছাড়া প্রচণ্ড উত্তেজনা গেছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইছে অলিভারের। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তিন গোয়েন্দাও ঘুমোতে গেল।

অনেক বেলায় উঠলেন অলিভার। নাশতা তৈরি করে ডাকলেন ছেলেদের।

নাশতা শেষ হল। বসার ঘরে চলে এল সবাই। টেলিভিশন অন করে দিল কিশোর। খালি চত্বর। পুরো বাড়িটা নীরব।

'ব্যাংকে যেতে হবে আমাকে,' বললেন অলিভার। 'দশ হাজার ডলার তুলব। ছোট ছোট নোটে। তোমরা কেউ যাবে আমার সঙ্গে? এস না? খুশি হব।'

'নিশ্চয় যাব,' বলল কিশোর। 'তবে, কি করতে যাচ্ছেন, পুলিশকে জানিয়ে

রাখলে ভাল হত না?'

'না। ঝুঁকি কিছুতেই নেব না আমি। বিপদ দেখলে হাউণ্ডটা ধ্বংসই করে ফেলতে পারে চোর। ওর নির্দেশ মানতেই হচ্ছে আমাকে।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর, গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি। বড় একটা সুটকেস এনে গাড়িতে তুলল ড্রাইভার। পেছনেই এল মিসেস ডেনভার।

'আপনার ম্যানেজার চলে যাচ্ছে,' চোখ না ফিরিয়েই বলল কিশোর।

'সান্তা মনিকায় বুড়িটার এক বোন থাকে,' বলল অলিভার। 'অসুস্থ হলে, কিংবা কোনরকম বিপদে পড়লে, ওখানেই গিয়ে ওঠে।'

চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মোড়ের দিকে।

'ভাল বিপদে পড়েছে এবার,' টিপ্পনী কাটল মুসা। 'খালি ছোঁক ছোঁক করে লোকের পেছনে। এইবার দিয়েছে টাইট...'

'কাচ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দে থেমে গেল মুসা।

'আগুন! আগুন!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ। 'আগুন লেগেছে!'

চোখের পলকে দরজার কাছে ছুটে গেল চারজনে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে।

চত্বরের এক পাশে ধোঁয়া। জ্যাকবসের ঘরের জানালা দিয়ে বেরোচ্ছে। একটা লোহার চেয়ার তুলে নিয়ে দমাদম পিটিয়ে শার্সির কাচ ভাঙছে টমি। পরনে ঘুমানর পোশাক। খালি পা। ঘাড়ের কাছের চুল খাড়া হয়ে গেছে।

'মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার। ছুটে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করবেন।

রবিন আর কিশোর নড়ার আগেই সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গেছে মুসা। লাফিয়ে এসে নামল চত্বরে। পুলের ধার থেকে আরেকটা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুটল।

ঝট করে, বেড়াল-মানবের ঘরের দরজা খুলে গেল। প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল এনড্রু।

'মিস্টার জ্যাকবস!' ভাঙা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

জবাব নেই।

তাড়াতাড়ি চৌকাঠে পড়ে থাকা কাঠের টুকরো সরিয়ে ফেলতে লাগল মুসা। পর্দায় আগুন ধরে গেছে। অনেকখানি পুড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। থাবা দিয়ে নেবানর চেষ্টা করল পর্দার আগুন।

'এই যে!' চিৎকার শোনা গেল কিশোরের। পাশে কুলুঙ্গিতে হুকে ঝোলানো অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রটা দেখতে পেয়েছে। ছুটে গিয়ে ওটা খুলে নিয়ে এল সে।

তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ উঠল। যন্ত্রের মুখ থেকে সাদা ফেনামত জিনিস ছুটে গিয়ে পড়তে থাকল জ্বলন্ত পর্দায়। ছ্যাকক্ করে উঠল আগুনের শিখা, নিবে গেল।

চেয়ার দিয়ে বাড়ি মেরে জানালার পাল্লার ছিটকিনি ভেঙে ফেলল মুসা, ঝটকা দিয়ে দু'পাশে সরে গেল পাল্লাদুটো। চৌকাঠে উঠে বসল টমি, তার পাশেই কিশোর। জানালার ঠিক নিচেই রয়েছে সোফা, জ্বলছে। পাসেই ক্রিসমাস গাছ, ওটাতেও আগুন ধরে গেছে প্রায়। নির্বাপক যন্ত্রের মুখ ঘোরাল কিশোর, একনাগাড়ে ফেনা নিক্ষেপ করে গেল আগুনের ওপর।

মুসা আর রবিনও উঠে বসেছে চৌকাঠে। ধোঁয়ার জন্য শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমত, চোখ জ্বালা করছে। চেঁচিয়ে ডাকা হল জ্যাকবসের নাম ধরে, কিন্তু কোন সাড়া এল না।

লাফিয়ে ঘরের মেঝেতে নেমে পড়ল কিশোর আর মুসা। ঝুঁকে চোখ বাঁচানর চেষ্টা করতে করতে এগোল ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

বসার ঘর আর শোবার ঘরের দরজার মাঝামাঝি পাওয়া গেল জ্যাকবসকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।

'জলদি বের করে নিয়ে যেতে হবে ওকে!' ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে, কেশে উঠল মুসা। নিচু হয়ে বাহু ধরে টেনে চিত করল জ্যাকবসকে। জোরে চড় লাগাল দুই গালে।

নড়লও না জ্যাকবস।

'এখানে হবে না!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'বের করে নিয়ে যেতে হবে!'

দু'দিক থেকে দু'হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে জ্যাকবসকে নিয়ে চলল দু'জনে। ততক্ষণে নেমে পড়েছে রবিন আর টমি। একজন ছুটে গেল দরজা খুলতে, আরেকজন সাহায্য করতে এল মুসা আর কিশোরকে।

জ্যাকবসের পায়ের দিকে তুলে ধরল রবিন। তিনজনে মিলে বয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

কাশছে টমি। খুলে ফেলল দরজা।

দম বন্ধ হয়ে আসছে তিন গোয়েন্দার। ভারি দেহটাকে বয়ে নিয়ে কোনমতে এসে পৌঁছুল দরজায়। হাত লাগাল টমি। জ্যাকবসকে নিয়ে আসা হল পুলের ধারে। চিত করে শুইয়ে দেয়া হল। জ্যাকবসের মুখে এসে পড়ছে রোদ। ফেকাসে চেহারা, রক্ত নেই যেন মুখে।

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করলেন অলিভার।

স্থির দৃষ্টিতে জ্যাকবসের মুখের দিকে চেয়ে আছে এনড্রু। 'ও কি…ও কি…'

উবু হয়ে বসে লোকটার বুকে কান পেতেছে মুসা। সোজা হয়ে বলল, 'না, বেঁচেই আছে।'

পৌঁছে গেল দমকল-বাহিনী। অক্সিজেন আর অ্যামবুলেন্স নিয়ে এসেছে। এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে জ্যাকবসের ঘর থেকে। সেদিকে ছুটে গেল কয়েকজন ফায়ারম্যান।

ছুটে এসে চত্বরে ঢুকল দমকল বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন। সোজা ছুটে গেল জ্যাকবসের ঘরের দিকে।

অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে দু'জন ফায়ারম্যান এসে বসল জ্যাকবসের দু'পাশে। নাকে মুখে চেপে ধরল মাস্ক। ধীরে ধীরে চোখ মেলল স্টকব্রোকার। মিটমিট করল। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে। দুর্বল একটা হাত বাড়িয়ে ঠেলে মাস্কটা নাকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল সে।

'ভয় নেই, মিস্টার,' বলল একজন ফায়ারম্যান। 'খানিকটা ধোঁয়া ঢুকে গিয়েছিল ফুসফুসে, আর কিছু না।'

উঠে বসার চেষ্টা করল জ্যাকবস।

'না না, উঠবেন না,' বাধা দিল আরেক ফায়ারম্যান। 'ইমার্জেন্সীতে নিয়ে যাব আপনাকে।'

প্রতিবাদ করবে মনে হল, কিন্তু শেষে কি মনে করে করল না জ্যাকবস। শুয়ে পড়ল আবার পাথরের চত্বরে।

'জর্জ, স্ট্রেচারটা নিয়ে এস,' সঙ্গীকে বলল এক ফায়ারম্যান।

স্ট্রেচার এল। তাতে তুলে নেয়া হল জ্যাকবসকে। শান্ত রইল সে। কোনরকম বাধা দিল না। ধূসর একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হল তার দেহ। স্ট্রেচার তুলে নিল দু'জন ফায়ারম্যান।

'ওর সঙ্গে কারও যাওয়া দরকার,' বলল এনড্রু।

'আমার ভাগ্নে,' দুর্বল গলায় বলল জ্যাকবস। 'আমার ভাগ্নেকে একটা খবর দেবেন। ও শুনলেই চলে আসবে।'

অ্যামবুলেন্সে তোলা হল জ্যাকবসকে। সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল গাড়ি।

জ্যাকবসের ঘরের দজায় এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'সেই পুরানো কাহিনী।' আধপোড়া একটা সিগারেটের টুকরো ধরে আছে দু'আঙুলে, দেখাল। 'সিগারেট জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কোনভাবে সোফায় পড়েছে টুকরোটা, আগুন ধরে গেছে পর্দায়...'

'কপাল ভাল ওর,' বলে উঠল টমি। এখনও খালি পায়েই রয়েছে। চেহারা ফেকাসে। 'সময়মত দেখতে পেয়েছিলাম...'

'হ্যাঁ, সত্যিই ভাল,' মাথা ঝোকাল ক্যাপ্টেন। 'আরেকটু হলেই আগুন ধরে যেত ক্রিসমাস গাছটায়। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ত আগুন।'

'সিগারেট জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর।

'অনেকেই এ-কাণ্ড করে, খোকা,' বলল ক্যাপ্টেন। 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু একটা গামলার সমান অ্যাশট্রে আছে ওর,' ক্যাপ্টেনের কথা মানতে

পারছে না গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওতে সিগারেট কেন, জ্বলন্ত কয়লার টুকরো রেখে দিলেও ভয় নেই। সিগারেটটা অ্যাশট্রের বাইরে পড়ল কি করে?'

'ঘুমের ঘোরে হয়ত অ্যাশট্রের ভেতরে রাখতে চেয়েছিল। ভেতরে না রেখে, বাইরেই ফেলেছে। ব্যস, ধরে-গেছে আগুন। এটা স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল রবিন। 'খুব নাকি ঘুম পেয়েছিল তাঁর। সারারাত ঘুমাতে পারেননি। দুপুর পর্যন্ত টানা ঘুম দেবেন, বলেছেন সকালে। হয়ত এসে সোফাতেই শুয়ে পড়েছিলেন, সিগারেট ধরিয়েছিলেন। তারপর আর চোখ খুলে রাখতে পারেননি।'

'কিন্তু ওকে মাঝের দরজায় পেয়েছি, বেডরুমের দিকে মুখ। সোফায় ঘুমোলে, ঘুম থেকে উঠে বারান্দার দরজার দিকে না গিয়ে বেডরুমের দরজায় গেল কেন? বেরোনর চেষ্টা না করে ঘরের আরও ভেতরে গেল কেন?' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনার কি মনে হয়?'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘর ভর্তি ধোঁয়া, দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল বেচারা! জবাব দিল ক্যাপ্টেন। 'রওনা দিয়েছিল বেডরুমের দরজার দিকে। এগোতে পারেনি বেশি দূর। ধোঁয়া কাহিল করে ফেলেছিল।'

পোড়া সোফার অবশিষ্ট বয়ে এনে ধুপ করে বাইরে ফেলল দু'জন ফায়ারম্যান।

'যা নোংরা হয়েছে, পরিষ্কার করতে গেলে বোঝা যাবে,' বলে উঠল বেড়াল-মানব।

'মিসেস ডেনভার এ-অবস্থা দেখলে, তাকেও আবার হাসপাতালে পাঠানর দরকার হবে,' হাসল টমি। 'গেল কোথায় মহিলা? এত হৈ চৈয়েও দেখা নেই!'

'খানিক আগে ট্যাক্সিতে করে চলে গেছে,' বললেন অলিভার। 'যাবে আর কোথায়? বোনের ওখানে গেছে হয়ত।'

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার জ্যাকবসকে কোথায় নেবে?'

'সেন্ট্রাল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসা করলেই চলবে বুঝলে, তাই করে ছেড়ে দেবে ডাক্তাররা। অবস্থা খারাপ দেখলে ভর্তি করে নেবে।'

'সেন্ট্রাল হাসপাতাল!' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'মিসেস ল্যাটনিনাকেও ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মিস্টার জ্যাকবস...জ্যাকবসও ওখানে...'

'ওখানেই তো নেবে প্রথমে,' বাধা দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'ওটা ইমার্জেন্সী হাসপাতাল, সরকারী। রোগী পয়সা খরচ করতে রাজি থাকলে দেবে কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে পাঠিয়ে।'

'আমি সে কথা বলছি না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সিগারেটের ব্যাপারে, আগুনের ব্যাপারে এত সতর্ক লোকটা! সিগারেট খাবার সময় অ্যাশট্রে সঙ্গে রাখে! অথচ অসাবধানে সে-ই আগুন ধরিয়ে দিল ঘরে! নাহ্, বোঝা যাচ্ছে না!'

চোদ্দ

'জ্বিনের আসর হয়েছে বাড়িটাতে!' দমকলবাহিনী চলে যেতেই ঘোষণা করল এনড্রু। 'প্রথমে লারিসা, তারপর মিসেস ডেনভার, এখন আবার জ্যাকবস!'

'সব কিছুর মূলে ওই চুরি,' বললেন অলিভার। আড়চোখে টমির দিকে তাকালেন। লাউঞ্জে একটা চেয়ার বের করে তাতে আধশোয়া হয়ে আছে। চোখ আধবোজা, বোধহয় রোদের দিকে সরাসরি চেয়ে আছে বলেই। 'তিন রাত আগেও এসব কিছুই ঘটেনি। চোরটা গেল চত্বর দিয়ে, শুরু হয়ে গেল যত গণ্ডগোল।'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'এর একটাই মানে। ছায়াশ্বাপদটা রয়েছে...'

'ছা-য়া...কি বললে?' ভুরু কোঁচকালেন অলিভার।

'ছায়াশ্বাপদ, হাউণ্ডটার নাম রেখেছি আমি। বাংলা শব্দ। ইংরেজিতে ইনভিজিবল ডগ বলতে পারেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এ-বাড়ির সীমানার মধ্যেই কোথাও রয়েছে ছায়াশ্বাপদ। আর চোর-ও নিশ্চয় এ-বাড়িরই কেউ।'

'কি বলছ, খোকা?' চোখ কপালে উঠেছে বেড়াল-মানবের। 'এ-বাড়িতে কুকুর নেই, খালি বেড়াল।'

'জ্যান্ত কুকুর না ওটা,' বললেন অলিভার। 'ক্রিস্টালে তৈরি একটা মূর্তি। আর্টিস্ট জ্যাক ইলিয়ট বানিয়েছিল। সোমবার রাতে ওটার জন্যই এসেছিল চোর, জ্যাকের বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে।'

খুকখুক করে হেসে উঠল এনড্রু। 'তাই বলুন! মিসেস ডেনভার কবেই এসে বলেছে আমাকে, আপনি একটা কুকুর আনবেন। আমার বেড়াল যেন সাবধানে রাখি। হাহ্ হাহ্! এখন শুনছি একটা কাচের কুকুর! হাহ্!'

কাঁধ ঝাঁকালেন অলিভার। 'ওই বুড়িটার জন্যে আর গোপন রইল না কিছু! কুকুরটার কথা লিখেছি ডায়েরীতে। আমার কাগজপত্র ঘেঁটেছে। নিশ্চয় ওটা পড়েছে বুড়ি। আপনাকে যখন বলেছে, আরও অনেককেই হয়ত বলেছে। জানাজানি হয়ে গেছে। চোরের কানেও গেছে কথাটা।'

'হুঁ! আমাকে সন্দেহ-টন্দেহ করছেন না তো?' হাসি উধাও হয়ে গেছে বেড়াল-মানবের মুখ থেকে। 'যা-ই হোক, আর আমি এখানে থাকছি না। যা শুরু হয়েছে, প্রাণের নিরাপত্তাই নেই। কখন দেবে বিষ খাইয়ে, কিংবা বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে, কে জানে! তার চেয়ে কোন মোটেলে চলে যাব।'

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এনড্রু। বেরিয়ে এল শিগগিরই। এক হাতে সুটকেস, আরেক হাতে পোষা কালো বেড়ালটা। 'বিকেল পাঁচটায় একবার আসতেই হচ্ছে। বেড়ালগুলো আসবে, আমি না থাকলে না খেয়ে ফিরে যাবে। ওদেরকে মোটেলটা চিনিয়ে দেব নিয়ে গিয়ে। যদি কোন কারণে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার

পড়ে, উইলশায়ার ইন-এ খোঁজ করবেন। ফ্ল্যাটটা ছাড়ছি না। এখানকার পরিস্থিতি শান্ত হলেই ফিরে আসব আবার।'

চলতে গিয়েও কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল বেড়াল-মানব। অলিভারের দিকে তাকাল। 'আমি নেই, চট করে আবার আমার ঘরে ঢুকে পড়বেন না। তল্লাশি চালাতে চাইলে, পুলিশ এবং সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবেন।'

গটগট করে হেঁটে চলে গেল এনড্রু। খানিক পরেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল।

'চাইলে আমার ঘরে খুঁজে দেখতে পারেন, মিস্টার অলিভার,' বলল টমি গিলবার্ট। 'দুপুরে বাইরে যাব, কাজ আছে। তখন ঢুকতে পারেন ইচ্ছে করলে। সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে না।'

'দুপুরে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'আপনার ডিউটি রাতে না?'

'আজ দিনের শিফটে কাজ করব,' বলল টমি। 'আমার এক কলিগ অসুস্থ। তার কাজটা চালিয়ে নিতে হবে।'

'আমি জানি, আপনার ঘরে নেই ছায়াশ্বাপদ,' শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। 'এ-বাড়ির কোন ঘরেই নেই।'

একটু যেন হতাশ মনে হল টমিকে। কাঁধ ঝাঁকাল। ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?' জানতে চাইলেন অলিভার।

'সহজ,' বলল কিশোর। 'তাহলে মিসেস ডেনভারের শকুনি-চোখে এড়াতো না জিনিসটা। কার ঘরে কোথায় কোন্ সুতোটা আছে, আমার মনে হয় তা-ও তার জানা। নকল চাবি বানিয়ে মালিকের ঘরে ঢোকার যার সাহস আছে, ভাড়াটেদের ঘরে সুযোগ পেলেই ঢুকবে সে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সবারই বাক্স পেঁটরা-ড্রয়ার ঘাঁটে সে, আমি শিওর।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'তবে, এর মানে এই নয়, কাছাকাছি নেই মূর্তিটা। নইলে, এখান থেকে লোকজন সরাতে চাইছে কেন চোর? গতকাল মিস ল্যাটনিনাকে বিষ খাওয়াল। আজ বোমা ফাটাল মিসেস ডেনভারের গাড়িতে। মিস্টার জ্যাকবসের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে খেদাল। ভয়েই পালাল বেড়াল-মানব···মিস্টার অলিভার, জ্যাকবসের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ও হয়ত কিছু জানাতে পারবে। কি করে আগুন লাগল, হয়ত কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'তোমার ধারণা, ওই আগুন লাগা নিছক দুর্ঘটনা নয়?'

'সম্ভবত।'

'তাহলে? কে লাগিয়েছে আগুন? টমি? সবার আগে ও-ই হাজির হয়েছে। ওকে আসতে দেখেনি কেউ। হয়ত, দেয়াল গলে জ্যাকবসের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আগুন লাগিয়ে আবার দেয়াল গলেই বেরিয়ে এসেছে। তারপর যেন বাঁচাচ্ছে

জ্যাকবসকে. এরকম অভিনয় করে গেছে।'

'দূ-র!' প্রতিবাদ করল মুসা। 'অতিকল্পনা!'

'ব্যাপারটা প্রমাণ করে ছাড়ব আমি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রবিন। 'ডক্টর রোজারের সঙ্গে কথা বলব।' ডক্টর লিসা রোজারকে চেনে কিশোর আর মুসাও। রবিনের দূর সম্পর্কের খালা। রুক্সটন বিশ্ববিদ্যায়ের প্যারাসাইকোলজির প্রফেসর, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। প্রেততত্ত্ব আর ডাকিনী বিদ্যার ওপর প্রচুর পড়াশোনা আছে, ওসবের ওপর গবেষণা করছেন এখন। আগুন লাগাক বা না লাগাক, দেয়াল গলে যে টমিই আসে-যায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিভাবে কাজটা করে সে, জানতে হবে।'

'ওসব ভূত-প্রেতের মধ্যে আমি নেই,' বলল মুসা। 'বাস্তব কাজ করব। টমিকে অনুসরণ করব আজ দুপুরে। কোথায় যায়, দেখব। সত্যিই বাজারে কাজে যায় কিনা, দেখতে হবে। আর, এনড্রুর ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব। দেখে আসব, সত্যি উইলশায়ার ইন-এ গিয়েছে কিনা।'

'আমি যাব হাসপাতালে,' ঘোষণা করল কিশোর। 'কয়েকটা হাসপাতাল ঘুরে আসতে হবে হয়ত। কিছু তথ্য দরকার। আশা করছি, ল্যাটনিনা আর জ্যাকবসের কাছ থেকে জানা যাবে কিছু।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যেন অলিভারের. 'আরে! আমার ব্যাংকে যাওয়া! তোমাদের একজন যাবে বলেছিলে। এত টাকা একা আনার সাহস আমার নেই এখন!'

'যাব,' তবে আগে কাজগুলো সেরে আসি,' বলল কিশোর।

'ততক্ষণ একা থাক! একটা লোক নেই এতবড় বাড়িটায়! আমি পারব না!' আঁতকে উঠেছেন অলিভার।

'আপনার কোন বন্ধু নেই?'

'ওই মিকো ইলিয়ট, সে-ই কাছাকাছি থাকে।'

'তাকেই ডাকুন। বসে বসে গল্প করুন দু'জনে। আমরা বেশি দেরি করব না।'

আবার বসার ঘরে ঢুকল চারজনে। ফোন করতে গেলেন অলিভার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে, কথা দিল মিকো।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল রবিন। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলল।

মিনিট বিশেক পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছুল রবিন। প্রফেসর লিসা রোজারকে তার অফিসেই পাওয়া গেল। সুন্দর চেহারা। বয়েস চল্লিশ মত হবে।

টাকমাথা, গোলগাল চেহারা এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলছেন লিসা রোজার, রবিনের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। 'আরে! রবিন। তুই হঠাৎ।...আয়, আয়!'

ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রবিন। 'কেমন আছ,

খালা?'

'ভাল। তোরা সব কেমন? তোর মা কেমন আছে?'

'ভাল। তারপর? কি মনে করে? খালাকে দেখতে আসার সময় হল তোর?'

'খালা, একটা কাজ। মানে, ইয়ে···,' দ্বিধা করছে রবিন। টাকমাথা ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। 'একটা কথা···'

'ইনি প্রফেসর ডোনাল্ড রস,' পরিচয় করিয়ে দিলেন মহিলা। 'অ্যানথ্রপলজির প্রফেসর। ডোনাল্ড, ও শেলি,' মানে আমার বোনের ছেলে। ওর কথা বলেছি তোমাকে। গোয়েন্দাগিরির শখ।'

'তাই নাকি? খুব ভাল শখ,' হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর রস।

প্রফেসরের সঙ্গে হাত মেলাল রবিন।

'হ্যাঁ, কি বলছিলি, বল,' বললেন ডক্টর রোজার।

'খালা, একটা উদ্ভট ঘটনা,' দ্বিধা যাচ্ছে না রবিনের। 'মানে ভূতুড়ে···'

'এত দ্বিধা করছিস কেন? ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই আমার কারবার, জানিসই তো,' ডেস্কে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা চিঠি দেখালেন মহিলা। 'এই যে চিঠিটা, ডুবুক থেকে এক লোক পাঠিয়েছে। তার বোনের ভূত নাকি তাড়া করে তাকে আজকাল। মজার ব্যাপার হল, তার কোন বোনই নেই, ছিলও না কখনও।'

'যতসব বদ্ধ পাগল নিয়ে তোমার কারবার, লিসা,' চেয়ারে হেলান দিলেন রস। 'ইয়াংম্যান, ভূতের কথা কি যেন বলছিলে?'

অলিভারের বাড়িতে ভূতুড়ে যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রবিন। গির্জায় পাদ্রীর প্রেতাত্মা দেখেছে কিশোর, সে কথাও বাদ দিল না।

'হুম্‌ম্‌!' গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন লিসা রোজার। 'আমি গিয়েছিলাম ওই গির্জায়।'

'তুমি শুনেছ প্রেতাত্মার কথা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শুনেছি,' বললেন লিসা রোজার। 'যেখানেই এই ধরনের গুজব শুনি, যাই। সরেজমিনে তদন্ত করি। তোর বন্ধু কিশোর যাকে দেখেছে, তার সঙ্গে বছর তিনেক আগে মারা যাওয়া পাদ্রীর নাকি মিল আছে। লম্বা সাদা চুল, বৃদ্ধ···। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, শুধু হাউসকীপার তামারা ব্রাইসই দেখেছে ভূতটাকে। তামারার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছি। আয়ারল্যাণ্ডের এক ছোট্ট শহর ডুঙ্গালওয়ে থেকে এসেছে সে। ওখানকার গির্জায় ভূত আছে, অনেকেই বলে। ভূতের ব্যাপারে রীতিমত বিখ্যাত জায়গাটা। বহুদিন আগে নাকি কোথায় যাবার জন্যে জাহাজে চেপেছিল এক পাদ্রী। সাগরে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যান তিনি। লোকে বলে, তাঁরই প্রেতাত্মা এসে ঠাঁই নিয়েছে ডুঙ্গালওয়ে গির্জায়। গিয়েছিলাম। কয়েক রাত কাটিয়েছি ওখানে। কোন ভূত-টুত আমার নজরে পড়েনি। ওখান থেকে এসেছে তো, গির্জায় পাদ্রীর ভূত থাকবেই, বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে হয়ত তামারা ব্রাইসের। যাই

হোক, অলিভারের ঘরে ঢোকে যে ছায়াটা, ওটা পাদ্রীর প্রেতাত্মা নয়।'

'আমারও তাই ধারণা। ও নিশ্চয় টমি গিলবার্ট।'

সামনে ঝুঁকলেন লিসা রোজার। 'বলছিস, দু'বার ছায়াটা দেখেছে কিশোর: এবং দু'বারই টমি তার ঘরে সেই সময় ঘুমিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

মৃদু হাসলেন ডক্টর রোজার। 'চমৎকার! নীরবে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে ছেলেটা!'

'মিস্টার অলিভারের কাছে ব্যাপারটা মোটেই চমৎকার নয়,' গম্ভীর হয়ে গেছে রবিন। 'কিভাবে করে টমি?'

উঠে গিয়ে ফাইল ক্যাবিনেট খুললেন লিসা রোজার। ফিতে বাঁধা কয়েকটা ফাইল বের করে এনে রাখলেন ডেস্কে। আমার মনে হয়, ঘুমের ঘোরে ছায়া শরীরে বেরিয়ে আসে সে। ঘুরে বেড়ায়।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন।

আবার চেয়ারে বসলেন প্রফেসর রোজার। একটা ফাইল খুললেন। 'ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালিয়েছি আমরা এ-ব্যাপারে, তবে খুব কমই সে-সুযোগ পাওয়া যায়। এসব যারা করে, লোককে জানিয়ে করে না। ল্যাবরেটরিতে আসা তো দূরের কথা। অনেক খোঁজখবর নিয়ে, এমন এক-আধজনকে বের করে, অনেক বলে কয়ে নিয়ে আসতে হয়। কারও কারও ধারণা, অন্য কাউকে জানালে তার এ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। গত বছর এসেছিল এক মহিলা, সাধারণ এক গৃহবধু। মনট্রোজে থাকে। ওর নাম বলতে চাই না।'

মাথা ঝোঁকাল রবিন।

'মহিলার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম,' বললেন আবার লিসা রোজার। 'ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে এবং সেটা সত্যি।'

'তারমানে,' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল প্রফেসর রস। 'তুমি বলতে চাইছ, মহিলা যা দেখে, সেটা পরে সত্যি হয়?'

'ঠিক তা নয়। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি,' ফাইলের কাগজে চোখ বোলালেন লিসা রোজার। 'ঘুমের ঘোরেই আকরনে তার মায়ের জন্মদিনের উৎসবে হাজির হয়েছিল ওই মহিলা। সে সবাইকে দেখেছিল, তাকে কেউ দেখেনি। পরিষ্কার বলেছে সে, কি কি দেখেছে। তার দুই বোন সেদিন সেই উৎসবে হাজির ছিল। মাঝারি সাইজের একটা কেক, সাদা মাখনের একটা প্রলেপ, তার ওপর লাল চিনি দিয়ে লেখা ছিল মহিলার মায়ের নাম। ক'টা মোম কোন্ কোন্ রঙের ছিল, ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে সে। রাতে স্বপ্ন দেখেছে। সকালে উঠে তার স্বামীকে বলল ব্যাপারটা। হেসে উড়িয়ে দিল স্বামী। দিন কয়েক পরেই একটা চিঠি আর কয়েকটা ছবি এল মহিলার মায়ের কাছ থেকে। জন্মদিনের উৎসবে তোলা, রঙিন-

ফটোগ্রাফ। যা যা স্বপ্নে দেখেছিল মহিলা, ঠিক মিলে গেল ছবির সঙ্গে। অস্বস্তিতে পড়ে গেল স্বামী বেচারা। এরপর আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটল ওরকম। কোথাও গিয়েছে, হয়ত স্বপ্নে দেখে মহিলা। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তার বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায় সব, অথচ ওই জায়গায় সশরীরে কখনও যায়নি মহিলা। রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল স্বামী। খোঁজখবর নিয়ে শেষে একদিন আমার কাছে নিয়ে এল স্ত্রীকে।'

'ল্যাবরেটরিতে মহিলার ওপর পরীক্ষা চালিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ। কয়েকদিন ল্যাবরেটরির একটা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম মহিলাকে। একটা মাত্র দরজা ঘরটার। রাতে বন্ধ করে দিতাম। চোখ রাখতাম বিশেষ ভাবে তৈরি একটা ফোকর দিয়ে। ওখান দিয়ে পুরো ঘরটাই ভালমত দেখা যায়। প্রথম রাতে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে তার ঘরে ঢুকলাম। দেয়াল-তাক আছে ওঘরে কয়েকটা। সব চেয়ে ওপরের তাকে রাখলাম মুখবন্ধ একটা খাম! ভেতরে এক টুকরো কাগজে দশ অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখেছি। সংখ্যাটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। খামটা রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। চোখ রাখলাম ফোকরে। যতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মহিলা, নড়েনি ওখান থেকে। একবারও ঘুম ভাঙেনি তার সারারাতে। সকালে উঠে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে কি কি আছে। প্রথমেই খামটার কথা বলল মহিলা। রঙ, আকার সব ঠিক ঠিক। তবে ভেতরে কি আছে, বলতে পারল না। পরের রাতে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে তার অজান্তে আবার রেখে এলাম খামটা, আরেকটা তাকে। খামের ভেতরের কাগজটা সেদিন বের করে নিয়েছি, ওটা রাখলাম খামের ওপরে, নাম্বার লেখা পিঠটা ওপরের দিকে। ভোরে উঠে জিজ্ঞেস করতেই কাগজটার কথা বলল মহিলা। ঠিক বলে দিল নাম্বারটা।'

'সেদিনও সারারাত চোখ রেখেছিলে ওর ওপর?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রবিন। 'রাতে একবারও ঘুম ভাঙেনি মহিলার? কোন ফাঁকে উঠে দেখে নেয়নি তো নাম্বারটা?'

'আমি নিজে চোখ রেখেছি ফোকরে,' বললেন প্রফেসর। 'মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাইনি। একবারও ঘুম ভাঙেনি মহিলার, বিছানা ছেড়ে ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, নিশ্চয় তার শরীরের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ছায়া শরীর। ঘুরে বেড়িয়েছিল সারা ঘরে।'

কি যেন ভাবছে রবিন। বলল, 'কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না!'

'নিশ্চয় প্রমাণ হয়, ছায়া শরীরে মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিল টমি,' জবাবটা দিলেন ডক্টর রস। 'মান্দালার কথা জেনেছে সে ওভাবেই।'

'কিন্তু তার ছায়া দেখা গেছে,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'মহিলার দেখা যায়নি।'

'বেশ,' বললেন লিসা রোজার। 'আরেকটা ঘটনার কথা বলছি। অরেঞ্জে বাস করে এক লোক, আমার এক রোগী। সারাজীবন স্বপ্নে যা যা দেখেছে, সব সত্যি

ঘটেছে। মনট্রোজের ওই গৃহবধুর মত। তবে, মহিলার সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে, তার ছায়া শরীর দেখা গেছে।' আবার ফাইল দেখলেন প্রফেসর। 'হলিউডে লোকটার এক বন্ধু আছে। আসল নাম বলব না, ধরে নিই, তার নাম জোনস। একরাতে; জোনস তার ঘরে বসে বই পড়ছে। হঠাৎ জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল তার কুকুরটা। জোনস ভাবল, নিশ্চয় আঙিনায় চোর ঢুকেছে। দেখতে চলল সে। হলঘরেই দেখা হয়ে গেল অরেঞ্জে বাস করে যে, সে বন্ধুর সঙ্গে। এতরাতে বন্ধুকে দেখে অবাক হল জোনস। কেন এসেছে, জানতে চাইল। কোন কথা বলল না বন্ধু। নিঃশব্দে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বোকা হয়ে গেল যেন জোনস। শেষে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সে-ও উঠে এল। কোথাও নেই তার বন্ধু। একেবারে হাওয়া। তখুনি অরেঞ্জে ফোন করল জোনস। বাড়িতেই পাওয়া গেল বন্ধুকে। কয়েকবার রিঙ হবার পর ফোন ধরেছে। ঘুমজড়িত গলা, স্পষ্ট। কেন ফোন করেছে, জানতে চাইল বন্ধু। জানাল জোনস। বন্ধু আশ্চর্য হল। সে-ও নাকি স্বপ্ন দেখছিল জোনসকে। দেখেছে, শোবার ঘরে বসে বই পড়ছে। কুকুর ডেকে উঠল। জোনস এসে ঢুকল হলঘরে। বন্ধু এত রাতে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল সে। আর কিছু মনে নেই তার। এর পরপরই টেলিফোন ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করে বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালেন লিসা রোজার। 'আশ্চর্যই, এবং ভয় পাওয়ার মত। স্বপ্নে যে ঘুরে বেড়ায়, ঘুম থেকে উঠে সে-ও ভয় পায়, তাকে যারা ঘুরতে দেখে, তারাও।'

'টমির ছায়া দেখে ভয় পান মিস্টার অলিভার, সন্দেহ নেই,' বলল রবিন। 'কিন্তু ঘুম থেকে উঠে টমি ভয় পায় বলে তো মনে হয় না!'

'তার কেস্‌টা একটু আলাদা। যা শুনলাম, এই ঘুরে বেড়ানো রীতিমত চর্চাই করে সে।'

'তার মানে,' ঘাবড়ে গেছে রবিন। 'তাকে ঠেকানর কোন উপায়ই নেই মিস্টার অলিভারের?'

'না। তবে অলিভারের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসব "ঘুরে বেড়ানো" লোকেরা ক্ষতিকর নয়। ছায়া শরীর নিয়ে কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না এরা। শুধু দেখা বা শোনার ক্ষমতা থাকে তখন।'

'তুমি বলছ, কোন জিনিস ছুঁতে পারে না ওরা?'

'হয়ত ছুঁতে পারে,' বললেন লিসা রোজার। 'তবে নড়াতে পারে না। মনট্রোজের মহিলার কথাই ধরা যাক, সাধারণ একটা খাম খুলতে পারেনি সে।'

'সুতরাং, ছায়াশরীরে ঘুরে বেড়ানর সময় কোন কিছু ধরতে, বা চুরি করতে পারবে না টমি গিলবার্ট?'

'আমার তো মনে হয়, না।'

'টমি গিলবার্ট ভারতে যেতে চাইছে,' খবরটা জানাল রবিন : 'ওখানে গিয়ে ধ্যানতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণা আর চর্চা করার ইচ্ছে।'

মাথা ঝোঁকালেন প্রফেসর। 'শুনেছি, ভারতীয় ঋষিরা নাকি এসব বিদ্যায় ওস্তাদ। আমাদের এসব দেশে অবশ্য ওসব গালগল্প বিশ্বাস করে না লোকে। তবে, পুরো ব্যাপারটা একেবারে ভিত্তিহীন হয়ত নয়। সম্মোহন কিংবা ভেন্ট্রিলোকুইজম-এ তো বিশ্বাস করে লোকে। আজকাল ছায়া শরীর নিয়েও গবেষণা হচ্ছে, বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন কিছু কিছু বিজ্ঞানী।'

'বুঝলাম, তুমিও বিশ্বাস কর,' বলল রবিন। 'কিন্তু পাদ্রীর ভূতের ব্যাপারটা কি? ওটা বিশ্বাস কর?'

কাঁধ ঝাঁকালেন লিসা রোজার। 'বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ পাইনি এখনও। যেখানেই ভূত আছে শুনেছি, ছুটে গিয়েছি। রাত কাটিয়েছি। কিন্তু আজ অবধি কোন ভূতের ছায়াও নজরে পড়েনি। এই বিশ্বাস কেন জন্মাল লোকের মনে, সেটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি, অনেক ভেবেছি। কোন কূল-কিনারা পাইনি। শেষে দুত্তোর বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্ভবত, ভূত বিশ্বাস করে আসছে লোকে। কেন? কে জানে!'

পনেরো

রবিন বেরিয়ে যাবার পর পরই সেন্ট্রাল হাসপাতালে ফোন করল কিশোর। জানল, জ্যাকবসকে হ্যামলিন ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দিন দুয়েক তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে চান ডাক্তাররা। লারিসা ল্যাটিনিনা এখনও সেন্ট্রাল হাসপাতালে রয়েছে। প্রথমে তার সঙ্গে কথা বলা স্থির করল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল।

সহজেই কেবিনটা খুঁজে বের করল কিশোর। খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে আছে লারিসা। বালিশে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। বিষণ্ণ।

'আরে!' দরজায় সাড়া পেয়েই ফিরে তাকিয়েছে লারিসা। 'তুমি মিস্টার অলিভারের মেহমান না?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'কিশোর পাশা। কেমন লাগছে এখন?'

'ভালও না খারাপও না,' মুখ বাঁকাল লারিসা। 'তবে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল আমাকে কেউ, ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া খিদে। জাউ আর দুধ ছাড়া কিচ্ছু খেতে দেয় না ডাক্তাররা,' বিরক্ত ভঙ্গিতে পায়ের ওপর ফেলে রাখা কম্বলটায় লাথি লাগাল সে। 'একটা উপদেশ দিচ্ছি, কক্ষণো বিষ খেয় না!'

'চেষ্টা করব না খেতে!' হাসল কিশোর। ভাল করে তাকাল লারিসার দিকে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে কেমন এক ধরনের ঘা, সাদা সাদা। 'কি

বিষ ছিল, জেনেছেন?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম,' লারিসার কণ্ঠে বিরক্তি। 'সাধারণ কি একটা কেমিক্যালের কথা বলল ওরা, নামটা মনে করতে পারছি না এখন। তবে আর্সেনিক কিংবা স্ট্রিকনিন নয়, এটা শিওর।'

'বেঁচে গেছেন সেজন্যেই,' মাথা দোলাল কিশোর। 'স্ট্রিকনিন খেলে আর এখন এখানে থাকতেন না।'

'জানি! এরপর থেকে চকলেট খাওয়াই বাদ দেব কিনা, ভাবছি,' বিষণ্ণ হাসি হাসল লারিসা।

'কোথা থেকে এসেছে ওগুলো, জানতে পেরেছে পুলিশ?'

'না। সাধারণ কেমিক্যাল, যে-কোন কেমিস্টের দোকান থেকে কেনা যায়। আর চকলেট তো একটা বাচ্চা ছেলেও কিনতে পারে।'

সারা ঘরে নজর বোলাল কিশোর। ছোট একটা আলমারির ওপর রাখা ফুলদানীতে একগোছা ফুলের ওপর এসে থামল দৃষ্টি। 'কারও উপহার?'

মাথা ঝোঁকাল লারিসা। 'এক বান্ধবী দিয়েছে। একই জায়গায় কাজ করি আমরা। রোজই এক গোছা করে দিয়ে যায়। কথা বলে যায় খানিকক্ষণ।'

'লোকের সঙ্গে মেশামেশি ভালই আছে আপনার, না?'

হেসে ফেলল লারিসা। 'পুলিশের মত জেরা শুরু করে দিয়েছ। পুরো সকালটা আজ জ্বালিয়ে খেয়েছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে। জানার চেষ্টা করেছে, আমার কোন শত্রু আছে কিনা। যত্তোসব! লোকের সাথেও নেই আমি, পাঁচেও নেই, আমার শত্রু থাকতে যাবে কেন?'

'আমারও তাই ধারণা,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, মিস্টার অলিভার আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আবার তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলে তিনি খুশি হবেন।'

'খুব ভাল লোক,' বলল লারিসা। 'আমি খুব পছন্দ করি। ভাল লোকের ওপরই যতরকম অত্যাচার। চোরছ্যাচোড় বদমাশ···হ্যাঁ, ভাল কথা, কুকুরটা কি এসেছে তাঁর?'

স্থির হয়ে গেল হঠাৎ কিশোর। 'কুকুর!'

'হ্যাঁ। ওটা এলে চোরের উপদ্রব কমবে।'

'মিস্টার অলিভার বলেছেন?'

'না,' মাথা নাড়ল লারিসা। 'মিসেস ডেনভার।···কবে যেন বলল, কবে যেন···হ্যাঁ হ্যাঁ, গত শনিবারে। পুলে সাঁতার কাটছিলাম, কিনারে বসে ডাকপিয়নের অপেক্ষা করছিল মহিলা, আর বকর বকর করছিল। মিস্টার অলিভার কুকুর আনাচ্ছেন জেনে ম্যানেজারের খুব দুঃশ্চিন্তা। বলেছে আমাকে। আমি বললাম, রাজ্যের যত বেড়ালকে যখন সইতে পারছেন, একটা কুকুর সইতে

পারবেন না কেন?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'হুঁ!...আচ্ছা, বাসায় রয়ে গেছে, এমন কোন জিনিস দরকার আপনার? বললে দিয়ে যাব এক সময়।'

'না, দরকার নেই,' মাথা নাড়ল লারিসা। 'যা যা লাগে, চাইলেই পাওয়া যায় এখানে। খালি পছন্দসই খাবার দিতে চায় না। এছাড়া সব রকমভাবে সাহায্য করে নার্সেরা।' চুপ করল একটু। 'হয়ত, আগামীকালই ছেড়ে দেবে ওরা আমাকে। কাল নাহলে পরশু তো ছাড়বেই।'

লারিসাকে 'গুড বাই' জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। মনে ভাবনা। যা সন্দেহ করেছিল; মিসেস ডেনভারের কল্যাণে ছায়াশ্বাপদের কথা অলিভারের বাড়ি আর কারও জানতে বাকি নেই। বাইরেরও ক'জন জানে, কে জানে! ডাকপিয়নসহ হয়ত পোস্ট অফিসেরও সবাই জানে গির্জার ওরা জানে নিশ্চয়। হয়ত পুরো পাড়াই খবরটা জেনে গেছে। তবে, লোকেরা জানে, জ্যান্ত কুকুর আনবেন অলিভার।

মূর্তিটার কথা ক'জন জানে? টমি গিলবার্ট? জ্যাকবস? জিজ্ঞেস করতে হবে স্টকব্রোকারকে। ওখানেই যাবে এখন কিশোর। হ্যামলিন ক্লিনিক কোথায়, চেনে না সে। ট্যাক্সি নেয়া স্থির করল।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে এল কিশোর। সারির সবচেয়ে আগের গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যামলিন ক্লিনিক কোথায়, চেনেন?'

'অবশ্যই। উইলশায়ার আর ইয়েলের মাঝামাঝি।'

'যাবেন?'

'এস।'

অবাক হয়ে দেখল কিশোর, প্যাসিও প্লেসের দিকে ছুটেছে ট্যাক্সি। আরে! মিস্টার অলিভারের বাড়িতে চলে যাবে নাকি? দূর, কি বোকামি করেছে! অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেই হত। তাঁর বাড়ির মাত্র দুটো ব্লক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ছোটখাট একটা আধুনিক বাড়ি। গেটের কপালে বড় করে লেখাঃ হ্যামলিন ক্লিনিক।

ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাসপাতালে ঢুকে পড়ল কিশোর। রিসেপশন রুমে ঢুকেই থমকে গেল। সেন্ট্রাল হাসপাতালের তুলনায় এটো রাজবাড়ি। প্রাইভেট ক্লিনিক, যারা প্রচুর পয়সা খরচ করতে পারে, তাদের জন্যে। পুরু কার্পেটে ঢাকা মেঝে। দামি আসবাবপত্র। ঝকঝকে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে হালকা লাল পোশাক পরা স্মার্ট রিসেপশনিস্ট। কাছে এসে জ্যাকবসের রুম নাম্বার জানতে চাইল কিশোর। মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। একটা খাতা খুলে নাম মিলিয়ে কেবিন নাম্বার বলে দিল।

দোতলায় কোণের দিকে বেশ বড়সড় একটা ঘর। দুটো খোলা জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে। বিছানায় শুয়ে আছে জ্যাকবস। লাল মুখ ফেকাসে সাদা হয়ে গেছে।

বিছানার পায়ের কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে তার ভাগ্নে বব বারোজ। চোখমুখ কালো করে রেখেছে।

কিশোরকে দেখেই বলে উঠল জ্যাকবস, 'উপদেশ দিতে এসেছ তো? যেতে পার। অনেক হয়েছে। সারাটা দিন আমার কান ঝালাপালা করে ফেলেছে বব।'

'সব সময় বলেছি, আবারও বলছি,' ঘোষণা করল বব। 'ওই সিগারেট তোমাকে খাবে! এবারে বেঁচেছ কোনমতে, এর পরের বার আর বাঁচবে না।'

'একশো বার বলছি, আমি ক্লান্ত ছিলাম,' মুখ গোমড়া করে ফেলেছে জ্যাকবস। 'ক্লান্ত ছিলাম, সেজন্যেই ঘটল এটা। জানিসই তো, খুব হুঁশিয়ার থাকি আমি। সিগারেট নিয়ে বেডরুমেও যাই না।'

'তাহলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাওয়ার জন্যে বুঝি সোফায় শুয়েছিল?'

গুঙিয়ে উঠল জ্যাকবস। 'উফ, আর পারি না! বাচাল ভাগ্নের চেয়ে খারাপ জীব আর কিছু নেই পৃথিবীতে!'

'তাই ঘটেছিল, না?' মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল কিশোর। 'সিগারেট মুখে নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'তাই হয়ত হবে!' স্বীকার করল জ্যাকবস। 'এছাড়া আর কি হতে পারে? মনে আছে, মিসেস ডেনভার অ্যাক্সিডেন্ট করার পর ঘরে ঢুকেছি···ভীষণ ঘুম পেয়েছিল···শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম সোফায় বসে···তারপর আর কিছু মনে নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। জেগে উঠে দেখলাম ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। চোখ জ্বালা করছে। ভাল দেখতে পাচ্ছি না। ওর মাঝেই দরজাটা খুঁজে বের করতে গেলাম। তারপর তো বেহুঁশ!'

'ভুল দিকে দরজা খুঁজতে গিয়েছিলেন,' বলল কিশোর। 'বেডরুমের দিকে চলে গিয়েছিলেন।'

মাথা ঝোঁকাল জ্যাকবস। 'তুমি বের করে এনেছ আমাকে।'

'আমি একা নই,' জানাল কিশোর। 'রবিন, মুসা আর টমিও সঙ্গে ছিল। টমিকেই ধন্যবাদ দেয়া উচিত আপনার। আগুন লেগেছে, সে-ই দেখেছে প্রথমে।'

'অদ্ভুত একটা ছেলে!' বিড়বিড় করল জ্যাকবস। 'দেখতে পারতাম না ওকে। অথচ ও-ই আমার জান বাঁচাল।'

'মিস্টার জ্যাকবস,' বলল কিশোর। 'মিস্টার অলিভার একটা কুকুর আনাচ্ছেন, শুনেছেন আপনি?'

'কুকুর!' বালিশ থেকে মাথা তুলে ফেলল জ্যাকবস। 'কুকুর দিয়ে কি করবে?'

'জানি না। শুনলাম, কুকুর আনবে শুনে মিসেস ডেনভার খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

'ওই মহিলা! ও-তো খামোকাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। কতখানি সত্যি বলেছে তাই বা কে জানে! এত বেশিকথা বলে, মিথ্যে না বললে পাবে কোথায় কথা?'

আবার বালিশে মাথা রাখল জ্যাকবস। টান টান করল শরীরটা। 'ওই বাড়িতে আর থাকছি না আমি।' কিশোরের দিকে তাকাল। 'তোমরাও চলে যাও ওখান থেকে। বাড়িটা মোটেই নিরাপদ না।'

উঠে দু'পা এগিয়ে এল বব। 'ওসব নিয়ে ভেব না এখন। ডাক্তার বলেছে, চুপচাপ বিশ্রাম নিতে। আমি যাচ্ছি, ঘরদোর পরিষ্কার করে ফেলিগে। কিছু মেরামতের থাকলে তা-ও করে ফেলব। আগে ভাল হয়ে ওঠো, তারপর খুঁজে পেতে ভাল আরেকটা বাড়ি দেখে উঠে যাব।'

হাসল জ্যাকবস। 'আসলে ছেলেটা তুই খারাপ না। বব। একেক সময় ভাবি, আমি তোর গার্জেন, না তুই আমার!'

'যাচ্ছি,' কিশোরের দিকে ফিরল বব। 'তুমি?'

'আমিও যাব।'

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে।

'খুব বেশি বিড়ি খায় আমার মামা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল বব। 'খাটেও সাংঘাতিক, দুশ্চিন্তাও বেশি। আগুন লেগেছে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে।'

ঝট করে চোখ ফেরাল কিশোর ববের দিকে।

'না না, খারাপ অর্থে বলিনি,' তাড়াতাড়ি বলল বব। 'হাসপাতালে একটু বিশ্রাম নিতে পারবে। ইদানীং খুব বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, ঘুমাতই না বলতে গেলে। বড় বেশি ভাবত। অযথাই চমকে চমকে উঠত। এটা লক্ষ্য করছি ক্রিসমাসের পর থেকে। ব্যবসা সুবিধের যাচ্ছে না কিছুদিন ধরে। সেটাই কারণ হতে পারে। তার ওপর অতিরিক্ত সিগারেট। শরীর তো খারাপ হবেই। এবার আর না ঘুমিয়ে পারবে না। ঘুমোতে না চাইলে ঘুমের বড়ি খাওয়াবে ডাক্তাররা। সিগারেট ছুঁতেও দেবে না। দিন দুয়েক বিশ্রাম হবে।'

'এবং সেটা ভালই হবে,' রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। 'ইদানীং ওই বাড়িটাতেও অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে! যে রাতে চোর এসেছিল, তুমি ও-বাড়িতে ছিলে না, না?'

'নাহ্...একটা মজা মিস করেছি। বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। মামার কাছে শুনলাম, চোর এসেছিল।'

'মিস্টার অলিভার যে কুকুর আনাচ্ছেন, এটা শুনেছ?'

'না। বুড়িটাকে সহ্যই করতে পারি না আমি, কথা বলতে এলে পালাই। নইলে হয়ত শুনতে পেতাম।'

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে পৌঁছুল ওরা। চত্বর পেরিয়ে জ্যাকবসের ফ্ল্যাটের কাছে এল।

ভাঙা জানালার দিকে চেয়ে শিস দিয়ে উঠল বব। শার্সিতে ভাঙা কাচের কয়েকটা টুকরো লেগে আছে এখনও। পর্দার জায়গায় ঝুলছে কয়েক ফালি পোড়া

ন্যাকড়া।

'কাচের মিস্ত্রিকে খবর দিতে হবে আগে,' পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল বব। একটা চাবি বেছে নিয়ে তালায় ঢোকাল। 'বাইরের অবস্থা দেখেই ভেতরে কি হয়েছে বুঝতে পারছি। এমন হবে জানলে কে যেত মামাকে একা ফেলে!' মোচড় দিয়ে তালা খুলে ফেলল। দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে।

কিশোরও ঘুরে দাঁড়াল। ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে এগোল। মনে ভাবনা। লারিসা ল্যাটনিনার বিষ খাওয়াটা কি নিছকই দুর্ঘটনা? জ্যাকবস কি সত্যিই জানে না কুকুর আনার কথা? যতখানি নিরীহ আর নিরপরাধ মনে হচ্ছে বব বারোজকে, আসলেও কি তাই? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহ পুরোপুরি গিয়ে পড়ে টমি গিলবার্টের ওপর। সে-ই একমাত্র লোক, যে জানতে পারে হাউণ্ডের মূর্তিটার কথা। আরও একটা 'যদি' আছে এখানে—যদি সত্যিই মিস্টার অলিভারের ঘরের ছায়াটা সে-ই হয়। আরেকটা কথা মনে এল কিশোরের। কেউ একজন চাইছে, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা আর তার আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজন সরিয়ে দিতে। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এরপর কাকে সরানর পালা? নিশ্চয় তিন গোয়েন্দা!

ষোলো

বেল বাজাল কিশোর।

দরজা খুলে দিল মিকো ইলিয়ট। 'এস। মাত্র ফিরেছে তোমার বন্ধু রবিন। কিছু একটা শোনানর জন্যে অস্থির হয়ে আছে। তোমার অপেক্ষাই করছে।'

একটা সোফায় বসে আছে রবিন। কোলের ওপর খোলা নোট বুক।

পুরানো ধাঁচের একটা চেয়ারে বসা মিস্টার অলিভার। কিশোরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'লারিসা কেমন আছে?'

'ভাল,' জানাল কিশোর।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। জ্যাকবস? তাকে দেখতে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম। তেমন আহত মনে হল না। তবে বিশ্রাম দরকার। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ডাক্তাররা পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইছেন।'

'অ।'

'আপনার কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না,' মাথা নাড়লেন অলিভার। 'বসে না থেকে মিকোকে নিয়ে ব্যাংকে গিয়েছিলাম। টাকা তুলে নিয়ে এসেছি,' ল্যাম্প রাখা টেবিলটা দেখালেন। মুদি দোকান থেকে জিনিসপত্র আনার একটা বাদামী ব্যাগ পড়ে আছে। 'টাকা কত তুলে এনেছি, কত জমা দিয়েছি। জীবনে এত অস্বস্তি বোধ করিনি আর কখনও!'

'বুদ্ধিটা ভালই বের করেছ,' বলে উঠল মিকো। 'বাজারের ব্যাগে করে টাকা নিয়ে আসা। দশ হাজার ডলার! কেউ কল্পনাই করতে পারবে না।'

ব্যাগের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হাসল কিশোর। 'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি।'

আবার বাজল বেল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিকো।

মুসা ঢুকল। ধপাস করে বসে পড়ল রবিনের পাশে। 'কোন লাভ হল না!' হতাশ কণ্ঠ। 'মিথ্যে কথা বলেনি টমি। কাজেই গেছে। আর ব্রায়ান এনড্রুও মিছে কথা বলেনি। সে-ও মোটেলে উঠেছে।'

'লাভ হল না বলছ কেন? জেনে আসাতে সুবিধেই হয়েছে,' মুসাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সামনে ঝুঁকল রবিন। 'সবাই এসে গেছ। এবার আমার কথা শুরু করি।'

'কি জেনে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একই সময়ে একই সঙ্গে দু'জায়াগায় থাকতে পারে কিছু কিছু মানুষ,' কণ্ঠে রহস্য ঢালল রবিন। ধীরে ধীরে বলে গেল সব, যা যা জেনে এসেছে প্রফেসর লিসা রোজারের কাছ থেকে।

'তার মানে,' রবিন থামলে বলল কিশোর। 'টমি দেয়াল ভেদ করে যেখানে খুশি ঢুকতে পারে, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।'

'লিসা-খালা তো তাই বলল।'

'যাক! আজ নিশ্চিন্ত!' জোরে শ্বাস ফেলল মুসা। 'ম্যানেজারকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে পারবে না ব্যাটা। কাজেই ছায়া হয়ে এ-ঘরে আসতে পারবে না।'

উঠে গিয়ে ব্যাগটাসহ টাকাগুলো ছোট একটা আলমারিতে ভরে তালা দিয়ে দিলেন অলিভার। 'সতর্কতা। আশা করি, ছায়া-মাথাটা এই আলমারিতে সেঁধিয়ে দিতে পারবে না হারামজাদা!'

'যদি পারেও, ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পারবে না,' কথার পিঠে বলল রবিন। 'ছায়া চোখ দিয়ে লোকে দেখতে পারে, কিন্তু ছায়া আঙুল দিয়ে কিছু নাড়তে পারে না। কাজেই ভয় নেই।'

'এজন্যেই, মিসেস ডেনভারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে নেবার পর আর কোন জিনিস নাড়াচাড়া হয়নি,' বললেন অলিভার। 'ঘাঁটাঘাঁটি করত শুধু ওই বুড়িটাই। টমি ব্যাটা শুধু বাইরে যা আছে দেখতে পারে, দেখে চলে যায়।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'এখন বোঝা যাচ্ছে, মান্দালাটার কথা জানল কি করে টমি। ছায়াশ্বাপদের কথাও সে জানে। আপনি মিস্টার ইলিয়টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, সে শুনেছিল। তবে, যেহেতু ছায়াশরীর কিছু ধরতে পারে না, চোর টমি নয়। চুরিটা যখন হয়, তার ঘরে ঢুকছিল টমি। বারদুই নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে। 'বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ডক্টর রোজারের কথা অবিশ্বাসও করা যায় না। তিনি বিজ্ঞানী। আলতু-ফালতু কথা বলেন না। তাছাড়া, ওই ছায়ার

ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর থিওরি পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না আর।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসা। দৃষ্টি রাস্তার দিকে। হঠাৎ বলল সে, 'জ্যাকবসের ভাগ্নে চলে যাচ্ছে।'

'তারমানে, এ বাড়িতে এখন আমরা ছাড়া আর কেউ নেই,' যে আলমারিতে টাকা রেখেছেন অলিভার, সেটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'ব্যাগ ভর্তি টাকা!' রহস্যময় শোনাল তার কণ্ঠ। 'যেহেতু ব্যাগের ভেতরে রয়েছে, টাকাগুলো অদৃশ্য!' হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই চোখ। 'কোন জিনিস আরেকটা জিনিসের ভেতরে থাকলেই অদৃশ্য।'

'কিশোর, কি বলছ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!' বলল রবিন।

'একটা গল্প শোনাব?'

'কিশোর!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। ফিরে তাকিয়েছে। 'আর ভুগিও না! বলে ফেল!'

'খুনের গল্প,' কারও দিকেই তাকাল না কিশোর। 'অনেকদিন আগে একটা বইয়ে পড়েছিলাম। অদৃশ্য একটা অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছিল। লোকটাকে।'

'তাই?' আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অলিভার।

'ঘরে বসে ডিনার খাচ্ছিল একটা লোক আর তার স্ত্রী,' বলল কিশোর। 'তাদের সঙ্গে সেরাতে খেতে বসেছিল লোকটার এক বন্ধু। দরজা-জানালা সব বন্ধ ঘরের। কি একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হল লোকটা আর তার বন্ধুর মাঝে। হাতাহাতি শুরু হল এক পর্যায়ে। হাতের নাড়া লেগে টেবিলে বসানো একমাত্র মোমটা উল্টে-পড়ে নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। অন্ধকারে স্বামীর আর্তনাদ শুনতে পেল স্ত্রী। টের পেল, তার জামার ঝুলে টান পড়েছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। চিৎকার শুনে ছুটোছুটি করে এল চাকর-বাকরেরা। আবার আলো জ্বালানো হল। দেখা গেল, মেঝেতে মরে পড়ে আছে লোকটা। রক্তাক্ত। বুকের বাঁ পাশে একটা ক্ষত। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে বন্ধুটি। মহিলার জামার নিচের দিকে রক্তের দাগ। পুলিশ এল। কিন্তু বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েও আবার ছেড়ে দিতে হল। কারণ, যে অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে লোকটাকে, সেটা পাওয়া গেল না।'

'আশ্চর্য!' বলে উঠল মিকো। 'কি দিয়ে খুন করা হয়েছিল?'

হাসল কিশোর। 'ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না লোকটার স্ত্রী। ত্যাঁদোড় এক গোয়েন্দার কাছে গিয়ে ধর্না দিল। পাওয়া গেল অস্ত্রটা। আবার বন্ধুকে অ্যারেস্ট করল পুলিশ। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুনের দায়ে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসিতে। খুন করা হয়েছিল ছুরি দিয়ে।'

'ছুরি!' চেঁচিয়ে উঠল মিকো। 'কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল?'

'বড় একটা কাঁচের ফানেলে পানি ভরে তাতে মানিপ্ল্যান্ট লাগিয়েছিল খুন হওয়া লোকটার স্ত্রী। খুন করেই মহিলার জামায় ছুরির রক্ত মুছে ফেলল বন্ধুটা। ছুরিটা নিয়ে ঢুকিয়ে রাখল ফানেলে।'

'ওটা তো প্রথমেই পুলিশের চোখে পড়ে যাবার কথা!' হাঁ হয়ে গেছে মুসা।

'না, কথা না। কারণ ছুরিটা তৈরি হয়েছিল শক্ত ক্রিস্টাল দিয়ে। পানিভর্তি কাঁচের ফানেলে ঢুকিয়ে রাখতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পানি আর কাঁচের সঙ্গে মিশে গেল স্বচ্ছ জিনিসটা।' অলিভারের দিকে তাকাল সে হঠাৎ। 'মিস্টার অলিভার, কেন বিষ খাওয়ানো হল মিস ল্যাটনিনাকে? কারণ, রোজ রাতে নিয়মিত সাঁতার কাটতে নামত সে সুইমিং পুলে।'

'ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল মিকো।

'এবং মিসেস ডেনভার,' বলে গেল কিশোর, 'যতই ছোঁক ছোঁক করুক, আগে তো কেউ কোন ক্ষতি করেনি তার। তার গাড়িতে বোমা মারা হল কবে? পুলের পানি পরিষ্কার করবে, বলার পর। মিস্টার অলিভার, আমরা ক্রিস্টালে তৈরি একটা মূর্তি খুঁজছি। যেটা ওই ছুরির মত জিনিস দিয়েই তৈরি। যেটা পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'পুল!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'পুলের পানিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিটা!'

কোমরে হাত রেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আগামীকাল দশ হাজার ডলার দিয়ে মূর্তিটা কিনতে হবে, মিস্টার অলিভার। কেন? আজই যদি পুল থেকে তুলে নিয়ে আসি ওটা? এখনই উপযুক্ত সময়। বাইরের কেউ নেই এখন বাড়িতে।'

'ঠিক! ঠিক বলেছ!' উত্তেজনায় কাঁপছেন অলিভার।

হাসল কিশোর। 'রবিন, পেছনের গেটে গিয়ে দাঁড়াও তুমি। কেউ আসে কিনা দেখবে। মুসা, সামনের গেটে তুমি থাকবে। রাস্তার দিকে নজর রাখবে।'

'তুমি?' জানতে চাইল মুসা।

'সাঁতার কাটতে যাব,' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করেছে কিশোর।

রবিন আর মুসা গিয়ে দাঁড়াল দুই গেটে। কিশোরকে অনুসরণ করে পুলের কিনারে এসে দাঁড়ালেন অলিভার আর মিকো।

খালি গা। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল কিশোর। একটু দ্বিধা করে নেমে পড়ল সে পানিতে। গলা পনিতে এসে ডুব দিল।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন অলিভার আর মিকো। এত দেরি করছে কেন কিশোর! আসলে তিরিশ সেকেণ্ডও যায়নি, এটা খেয়াল করছে না তারা।

ভুস্‌স্‌ করে ভেসে উঠল কিশোর। ডান হাতটা তুলল পানির ওপর। হাতে কিছু একটা ধরা।

'পেয়েছে! পেয়েছে!' প্রায় নাচতে শুরু করলেন অলিভার।

'চুপ! আস্তে!' থামিয়ে দিল তাঁকে মিকো।

পুলের কিনারে চলে এল কিশোর। জিনিসটা বাড়িয়ে দিল অলিভারের দিকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে নিলেন অলিভার। অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম। নিখুঁত সৃষ্টি। পেশীগুলো পরিষ্কার, প্রায় চৌকোনা ভোঁতা মাথাটাকে জ্যান্তই মনে হচ্ছে। বড় বড় চোখ দুটো সোনালি, দুই কশে সোনালি ফেনা। সামনের পায়ের নিচ থেকে কানের ডগার উচ্চতা ছয় ইঞ্চি। সামনের দুই পায়ের ফাঁকে ক্রিস্টালে তৈরি মানুষের খুলির একটা খুদে প্রতিকৃতি আঁকড়ে ধরে রেখেছে। কুকুরটার কোমরে মোটা লম্বা সুতো বাঁধা। স্বচ্ছ, প্লাস্টিকের সুতো।

'এত সহজ!' বলল কিশোর। 'পানিতে নামারও দরকার হয়নি চোরের। সুতোয় ধরে আস্তে করে পানিতে ছেড়ে দিয়েছে মূর্তিটা, ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে গভীর পানিতে চলে গেছে ওটা। হাত থেকে সুতো ছেড়ে দিয়েছে চোর। স্বচ্ছ সুতো, পানির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। কুকুরটার চোখ আর কশের ফেনা সোনালি, তলার সোনালি মোজাইকের সঙ্গে মিলে গেছে।'

'বুদ্ধি আছে চোর-ব্যাটার!' স্বীকার করল মিকো।

'দিন ওটা।' অলিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর।

'দেব!'

'হ্যাঁ। আবার পুলের তলায় রেখে দেব।'

'কেন!'

'কারণ, আজ রাতে এটা নিতে আসবে চোর। টেলিভিশন মনিটর অন করে দেব। ঘরে বসেই দেখতে পাব চোরকে।'

'বুঝেছি,' মূর্তিটা ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করছেন অলিভার।

'দিয়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক,' বলল মিকো।

'কিন্তু···কিন্তু মূর্তিটার ক্ষতি হতে পারে!···ভেঙেটেঙে ফেলতে পারে···'

'ভাঙবে না। ও ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবে চোর। ভাঙা মূর্তি বিকোবে না।'

ইচ্ছের বিরুদ্ধে মূর্তিটা আবার কিশোরের হাতে তুলে দিলেন অলিভার।

ডুব দিয়ে আবার আগের জায়গায় জিনিসটা রেখে এল কিশোর। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে পানি থেকে উঠে এল। 'একটা তোয়ালে আর কিছু ন্যাকড়া দরকার। পুলের ধারে এত পানি দেখলে সন্দেহ করে বসবে চোর। পানিতে নেমেছি, অনুমান করে ফেলবে। তাছাড়া চত্বরে ভেজা ছাপ থাকাও উচিত না।'

প্রায় ছুটে চলে গেল মিকো। মিনিটখানেক পরেই অলিভারের ঘর থেকে একটা তোয়ালে আর কিছু ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এল। তোয়ালেটা কিশোরের হাতে তুলে দিয়ে নিজে পুলের কিনারে ঝরে পড়া পানি পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

দ্রুতহাতে গা মুছতে লাগল কিশোর।

সামনের গেট থেকে ছুটে এল মুসা। 'এনড্রু আসছে!'

'রবিনকে ডাকো!' মিকোর দিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'আপনারা দু'জন ওপরে চলে যান!' তাড়াতাড়ি ভেজা পায়ের তলা মুছে ফেলতে লাগল সে।

সবার শেষে অলিভারের বসার ঘরে ঢুকল কিশোর। অন্য চারজন আগেই ঢুকে পড়েছে। দরজা বন্ধ করে দিল মিকো। টেলিভিশনের সুইচ অন করল কিশোর।

গেটে দেখা দিল বেড়াল-মানব। চত্বর দিয়ে হেঁটে চলল নিজের ফ্ল্যাটের দিকে।

'পুলের দিকে তাকালও না!' বিড়বিড় করল কিশোর। ভেজা প্যান্ট খুলে ফেলে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে।

'কেন?' রবিন শুকনো একটা শার্ট এনে দিল বন্ধুকে। 'তাকাল না কেন?'

'মনে হয় গেট থেকেই খেয়াল করেছে. পুলের পানিতে ঢেউ বোঝাই যায়, কেউ নেমেছিল। কিনারের পানিও পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়নি।'

'ও চোর নয় তাহলে!' বলল মুসা।

'হয় চোর নয়, কিংবা সন্দেহ করে ফেলেছে, পুলে নেমেছিল কেউ। মূর্তিটা পাওয়া গেছে। আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে তার ওপর। তা যদি হয়ে থাকে, অসম্ভব ধূর্ত সে!...দেখা যাক, কি হয়!'

একটা দুটো করে বেড়াল ঢুকতে শুরু করল চত্বরে। এনড্রুর ঘরের বারান্দায় জমায়েত হল কয়েক ডজন। অর্ধচন্দ্রকারে বসে পড়ল। একগাদা প্লেট হাতে বেরিয়ে এল এনড্রু। একটা করে প্লেট রাখল প্রতিটা বেড়ালের সামনে। আবার ঘরে ঢুকল। বড় একটা পাত্রে করে খাবার নিয়ে বেরোল। প্লেট ভরে খাবার দিল বেড়ালগুলোকে।

জানোয়াগুলো খাচ্ছে, আর সামনে বসে দেখছে এনড্রু। কথা বলছে ওগুলোর সঙ্গে। আশ্চর্য শৃঙ্খলা! একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করল না বেড়ালগুলো, কামড়াকামড়ি খামচাখামচি কিছুই করল না। শান্তভাবে যার যার প্লেটের খাবার শেষ করে চলে গেল একে একে।

প্লেটগুলো নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল এনড্রু। খানিক পরেই দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে চলে গেল সে-ও।

টেলিভিশনের পর্দায় একনাগাড়ে চোখ রাখল তিন গোয়েন্দা। এগারোটার সময় যথারীতি আলো নিবে গেল। বেড়াল-মানবের পর আর কেউ ঢোকেনি চত্বরে। বসার ঘরে বসেই ডিনার খেয়ে নিয়েছে ওরা তিনজনে।

জ্যাকেট তুলে নিল মুসা সোফার ওপর থেকে। গায়ে চড়াল। 'ব্যালকনিতে যাচ্ছি। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব।'

'আমিও আসছি,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। টেলিভিশনের সুইচ অফ করে দিল।

'আমিও,' রবিনও উঠল। 'আজ রাতে কিছু একটা ঘটবেই। মিস করতে চাই না। বঞ্চিত করতে চাই না চোখকে।'

সতেরো

মাঝরাতে গেট খোলার শব্দ হল। চত্বরে ঢুকল টমি গিলবার্ট। ঘরে চলে গেল। কয়েক মিনিট আলো দেখা গেল তার জানালায়, তারপর নিবে গেল।

ব্যালকনিতে অপেক্ষা করে আছে তিন গোয়েন্দা।

একটা দরজা খুলল, বন্ধ হল, শোনা গেল মৃদু আওয়াজ।

পুলের ওপাশে একটা ছায়া দেখা গেল। কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা।

ধীরে ধীরে পুলের ধারে এসে দাঁড়াল ছায়াটা। আস্তে করে নেমে পড়ল পানিতে। ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়েছে পানিতে এক জায়গায়, দেখা গেল ছোট ছোট ঢেউ, সাঁতরে এগোচ্ছে ছায়াটা।

পুলের ঠিক মাঝখানে দেখা গেল একটা মাথা, আবছা! পরক্ষণেই ডুবে গেল। পানির নিচে দেখা গেল আলোর রশ্মি। পানি-নিরোধক টর্চ। নড়াচড়া করছে রশ্মিটা।

হঠাৎ নিবে গেল আলো। পানির ওপরে প্রায় নিঃশব্দে ভেসে উঠল আবার মাথাটা।

যেখান দিয়ে নেমেছিল, সেখান দিয়েই আবার উঠে পড়ল ছায়াটা। ফিরে চলল। মৃদু শব্দ হল দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার।

আস্তে করে দরজায় টোকা দিল মুসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা। 'টমি!' ফিসফিস করে বলল সে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। পেছনে মিস্টার অলিভার আর মিকো ইলিয়ট।

অন্ধকারই রয়েছে টমির জানালা।

'ছায়াশরীরে বেরিয়েছিল হয়ত!' ফিসফিস করল মুসা।

'মোটেই না!' সবার আগে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। বেল বাজাল। এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার বাজাল। 'গিলবার্ট!' ডাকল চেঁচিয়ে। 'গিলবার্ট, দরজা খুলুন! নইলে পুলিশ ডাকব। ওরা দরজা ভেঙে ঢুকবে।'

দরজা খুলে গেল। ঘুমোনর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে টমি। খালি পা, আবছা দেখা যাচ্ছে। 'কি হয়েছে? মাঝরাতে ডাকাডাকি কেন? ঘুমিয়েছিলাম...'

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দিয়েছে কিশোর। আলো জ্বলে উঠল। ঘাড়ের ওপর লেপটে আছে টমির ভেজা চুল।

'ঘুমোননি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'পুলে নেমেছিলেন।'

'না-আ! আমি...,' থেমে গেল টমি। চুল বেয়ে টপ করে পানি পড়েছে এক

ফোঁটা। 'আমি শাওয়ারে গোসল করছিলাম।'

'আগে বললেন ঘুমিয়েছিলেন, এখন শওয়ার। দুটোই মিথ্যে কথা,' শুধরে দিল কিশোর। 'আসলে পুলে নেমেছিলেন। পুলের ধার থেকে আপনার দরজা পর্যন্ত এসেছে ভেজা পায়ের ছাপ।'

দরজার বাইরে তাকাল টমি। সত্যিই, দরজায় ভেজা ছাপ। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বেশ, নেমেছিলাম পুলে। তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? সারাদিন পরিশ্রম করেছি, সাঁতার কেটে শান্ত করে নিয়েছি শরীরটাকে।'

'হাউণ্ডটা কোথায়?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার। 'বজ্জাত! চোর!'

'কি যা-তা বলছেন!' কিছুই বুঝতে না পারার ভান। কিন্তু সামাল দিতে পারল না টমি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চোখ, ঝট করে ঘুরে গেছে রান্নাঘরের দিকে।

'কোন একটা তাকে রেখেছেন নিশ্চয়,' রান্নাঘরের দরজার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'খুব বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। লুকোনর সময় পাননি।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!' বিড়বিড় করল টমি।

'মিস্টার অলিভার,' বলল কিশোর। 'পুলিশই ডাকুন। সঙ্গে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে বলবেন।'

'জোর করে কারও বাড়ি সার্চ করার নিয়ম নেই!' বলল টমি। 'তাছাড়া মাঝরাতে ওয়ারেন্ট জোগাড় করতে পারবে না পুলিশ!'

'সেটা তাদের ব্যাপার,' শান্ত কিশোর। 'না পারলে সকালতক অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে চত্বর থেকে নড়ছি না। আপনার ফ্ল্যাট ঘিরে রাখব আমরা। আমাদের চোখ এড়িয়ে বেরোতে পারবেন না, মূর্তিটা কোথাও ফেলেও দিয়ে আসতে পারবেন না।'

'তোমরা...তোমরা তা করতে পার না!' চেঁচাতে শুরু করেছে টমি। 'আমাকে, আমাকে অপমান করা হচ্ছে!'

'অপমান করলাম কোথায়?' হাত নাড়ল কিশোর। 'চত্বরে বসে থাকব আমরা, আপনার দরজার দিকে চেয়ে থাকব, এতে কোন দোষ ধরতে পারবে না উকিল। কেন অযথা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন? মূর্তিটা দিয়ে দিন, আমরা সব ভুলে যাব। পুলিশ ডাকার দরকারই হবে না।'

ঝাড়া কয়েক সেকেণ্ড কিশোরের দিকে চেয়ে রইল টমি। পিছিয়ে গেল দরজার কাছ থেকে। 'চুলোর ভেতরে রেখেছি।' মুখ কালো হয়ে গেছে তার। 'খামোকা এসব করতে গেলেন, মিস্টার অলিভার। মূর্তিটা আপনাকেই দিয়ে দিতাম।'

ব্যঙ্গ করে হাসলেন অলিভার। 'তাই নাকি? নিশ্চয় দশ হাজার দেবার পর?'

'দশ হাজার!' সত্যিই বিস্মিত হয়েছে টমি। 'কিসের দশ হাজার?'

'জানেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সত্যিই জানেন না টাকাটার কথা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল টমি। 'ভেবেছিলাম, মূর্তিটা মিস্টার অলিভারকে দিলে

কিছু পুরস্কার পাব। কিন্তু দশ হাজার ডলার, জানতাম না!'

টমির পাশ কাটিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন অলিভার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন আবার। হাতে হাউণ্ডের মূর্তি। কোমরে বাঁধা সুতো মূর্তির শরীরে পেঁচানো।

'মিস্টার অলিভার,' বলে উঠল কিশোর। 'টমি চোর নয়। ঘুমের ভেতরে তার ছায়াশরীর শুধু ঘরে বেড়ায়, দেখে, শোনে। তার বেশি কিছু করতে পারে না।'

চমকে উঠল টমি। ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা। উঠল-নামল কণ্ঠা, ঢোক গিলেছে।

'কি দেখেছিলেন, গিলবার্ট?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'ঘুমের ঘোরে মূর্তিটার ব্যাপারে কি দেখেছিলেন? কি শুনেছিলেন?'

কাঁপছে টমি। 'ইচ্ছে করে দেখিনি, শুনিওনি! ছায়াশরীর ঘুরে বেড়ায়, এতে আমার কোন দোষ নেই! ওটা এক ধরনের স্বপ্ন!'

'কি দেখেছেন স্বপ্নে?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

'একটা কুকুর, কাচের। দেখলাম, অনেক রাতে, অন্ধকারে পুলের ধারে এসে বসল একটা মানুষ। পানিতে নামিয়ে রাখছে কাচের কুকুরটা। মুখ ঢেকে রেখেছিল মানুষটা, চিনতে পারিনি।'

'আমার মনে হয়,' সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর, 'টমি গিলবার্ট সত্যি কথাই বলছেন।'

আঠারো

রক্ত ফিরে আসছে টমির মুখে। 'দেখ, কিশোর, মূর্তিটা আমি পুল থেকে তুলে এনেছি ঠিকই। কিন্তু সত্যি বলছি, ওটা সকালেই দিয়ে দিতাম মিস্টার অলিভারকে। আমি ওটা চুরি করিনি।'

'বুঝতে পারছি,' বলল কিশোর, 'আপনি করেননি। চুরিটা যখন হয়, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তবে, মূর্তিটা তুলে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার অলিভারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। লুকিয়ে রাখলেন কেন? কাজটা অন্যায় করেছেন।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মিকো। 'যাও, জলদি কাপড় বদলে এস, টমি। অলিভারের ঘরে থাকবে। তোমাকে চোখে চোখে রাখতে পারব।'

জ্বলন্ত চোখে মিকোর দিকে তাকাল টমি। 'আপনি-আমাকে আদেশ করার কে?' চেঁচিয়ে উঠল। 'বাড়িটা কি আপনার?'

'একই কথা তোমার বেলায়ও খাটে,' বলে উঠলেন অলিভার। 'ছায়াশরীরেই হোক আর তরল শরীরেই হোক, তুমি আমার ঘরে ঢোকো কার হুকুমে? মিকো যা বলছে কর, নইলে জেলের ভাত খাওয়াব, চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকার অপরাধে। চোরাই মাল লুকিয়ে রাখার অপরাধে।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল টমি। গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। টান দিয়ে খুলল আলমারির পাল্লা। কয়েক মুহূর্ত পরে বন্ধ করে দিল ধাক্কা দিয়ে। মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল সে। গায়ে কালো সোয়েটার, পরনে হালকা রঙের প্যান্ট।

'রাতটা আমার বসার ঘরে কাটবে, এবং ঘুমোতে পারবে না!' কড়া আদেশ জারি করলেন অলিভার।

গোমড়ামুখে মাথা ঝোঁকাল টমি।

মূর্তিটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিলেন অলিভার। 'কিশোর, তুমি বলেছিলে, আজ রাতে চোরটাকে ধরবে?'

'ধরতে তো চাই। তবে চেঁচামেচি করে ভাগিয়ে দিলাম কিনা, কে জানে! এখনও সময় আছে অবশ্য। আবার ফিরে আসতে পারে সে।'

নীরবে মূর্তিটা কিশোরের হাতে তুলে দিলেন অলিভার। মিকো আর টমিকে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর ঘরে।

আবার আস্তে করে পুলের পানিতে মূর্তিটা ছেড়ে দিল কিশোর। দুই সঙ্গীকে নিয়ে বসল ব্যালকনিতে। ঠাণ্ডা, অন্ধকার দীর্ঘ মুহূর্তগুলো পেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে। পুব আকাশে ধলপহর দেখা দিল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল শীতের কুয়াশামাখা ধূসর ভোর। চোর আর এল না সে রাতে।

'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল,' লাল চোখ ডলছে কিশোর। 'চোরটার আসার কোন দরকারই নেই। আগে টাকাটা নিয়ে নেবে মিস্টার অলিভারের কাছ থেকে, তারপর জানিয়ে দেবে কোথায় রেখেছে হাউণ্ডের মূর্তি। খুব সহজ। কেন খামোকা নিজে ওটা তুলে নিতে আসার ঝুঁকি নেবে?'

পেছনে খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছেন অলিভার। 'নশতা?' ফিটফাট পোশাক পরনে, বেশ তাজা দেখাচ্ছে তাঁকে।

সবাই খেতে বসল, টমি গিলবার্ট ছাড়া। কাজের ঘরে একটা চেয়ারে বসে আছে গোমড়ামুখে। কিছু খেতে কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না সে।

নাশতা শেষ করেই কাজে লেগে গেল কিশোর। পুরানো একগাদা খবরের কাগজ আর কাঁচি নিয়ে বসল। কেটে কেটে একের পর এক আয়তক্ষেত্র বানাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্র দুই ইঞ্চি চওড়া, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা।

'কি করছ?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল রবিন।

'শিগগিরই চোরটা জানাবে, কখন টাকা দিতে হবে তাকে। ওর জন্যে টাকার তোড়া তৈরি করে রাখছি,' হাসল কিশোর। 'কুকুরটা কোথায়, জানেন এখন মিস্টার অলিভার। কাজেই সত্যি সত্যি টাকা দেবার কোন দরকারই নেই আর।'

'তাহলে ওই কাগজের তোড়া দেবারই দরকার কি?' জানতে চাইল মুসা।

'চোরটা কে জানার জন্যে,' বলল কিশোর। 'তোড়াগুলোতে ম্যাজিক

অয়েন্টমেন্ট মাখিয়ে দেব। ব্যাগটা ফেলে দিয়ে এলেই হল। তোড়ায় হাত দেবে চোর, কালো দাগ পড়ে যাবে হাতে। তারপর চেপে ধরব ওকে।'

'এমন ভাবে বলছ, যেন লোকটা আমাদের পরিচিত,' বললেন অলিভার।

'অবশ্যই পরিচিত,' কিশোরের গলায় খুশির আমেজ। 'ও জানে, লারিসা ল্যাটনিনা চকলেটের পাগল। জানে, মিসেস গুডনভার ভোর রাত চারটেয় বাজার করতে যায়। নিশ্চয় চোর এ-বাড়ির ভাড়াটে।'

'ব্রায়ান এনড্রু!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ও ছাড়া আর কেউ না!'

হাসল শুধু কিশোর, কিছু বলল না।

'তুমি জান, সে কে?' জিজ্ঞেস করলেন অলিভার।

'জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না,' বলল কিশোর। 'টাকাটা নিতে এলে প্যাকেটটা ধরলে, তখন আর অসুবিধে হবে না।'

নীরবে কাজ করে চলল কিশোর।

ডাকপিয়ন এল বেলা দশটায়। ততক্ষণে দশটা তোড়া বানিয়ে ফেলেছে কিশোর। সাজিয়ে রেখেছে বসার ঘরের টেবিলে।

ডাকবাক্সে একটা মাত্র চিঠি ফেলে গেল পিয়ন।

খামটা নিয়ে এল কিশোর। ওপরে টাইপ করে লেখা অলিভারের ঠিকানা। তাঁর দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। মাথা কাত করলেন অলিভার।

খামটা ছিঁড়ে ফেলল কিশোর। ভেতর থেকে বেরোল একটা ভাঁজ করা কাগজ। তাতে টাইপ করে ইংরেজিতে লেখাঃ "বাদামী কাগজে মুড়ে টাকাগুলো পার্কের কোণের ডাস্টবিনে ফেলে রেখে আসতে হবে আজ বিকেল ঠিক পাঁচটায়।"

খামটা উল্টে পাল্টে দেখল কিশোর। উইলশায়ার ডাকঘরের ছাপ। গতকালের তারিখ। 'গুড' হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। অয়েন্টমেন্ট মাখাতে শুরু করল কাগজের তোড়ায়। সবকটা তোড়াতে ভালমত মাখাল। তারপর বাদামী একটা বড় কাগজ পেঁচিয়ে সুন্দর করে প্যাকেট করল। বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই, ভেতরে টাকা আছে, না শুধু খবরের কাগজ কাটা।

'ব্যস, হয়ে গেল,' অলিভারের দিকে তাকাল কিশোর। 'বিকেল পাঁচটায় গিয়ে ডাস্টবিনে প্যাকেটটা রেখে আসবেন। দস্তানা পরে নেবেন। প্যাকেটের ওপরেও মলম মাখিয়েছি। আগে পুলিশে একটা ফোন করে নেবেন। হয়ত প্যাকেটটা তুলে নেবার সময়ই চোরকে ধরতে পারবে ওরা।'

'যদি অন্য কেউ তুলে নেয় প্যাকেটটা?' বললেন অলিভার। 'সুন্দর প্যাকেট। কোন ছেলেছোকরার চোখে পড়লে তুলে নিতেও পারে।'

'তা পারে। তবে সেটা হতে দেবে না চোর। নিশ্চয় আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। আপনি ফেলে দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এসে তুলে নেবে।'

'আমরা কি যাব?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ। পাঁচটায় আমরাও গিয়ে লুকিয়ে থাকব, চোখ রাখব ডাস্টবিনটার ওপর। মিস্টার অলিভার, আপনি আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করবেন না। কোনদিকেই তাকাবেন না। সোজা গিয়ে প্যাকেটটা ফেলে রেখে চলে আসবেন।'

উনিশ

বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

রেকটরির পাশের ছোট্ট ফুলের ঝোপে লুকিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। রাস্তার ধারের ছোট পার্কটা নির্জন। শুধু একজন ঝাড়ুদার রয়েছে। একটা ঝুড়ি আর ঝাড়ু হাতে নিয়ে পার্কের ময়লা পরিষ্কার করছে। চকলেটের মোড়ক, বিস্কুটের বাক্স, ছেঁড়া কাগজের টুকরো-টাকরা ইত্যাদি তুলে নিয়ে রাখছে ঝুড়িতে। ভরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে।

'উইলশায়ারের দিক থেকে আসবে চোর,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

একটা খবরের কাগজের ভ্যান এসে থামল পার্কের গেটের সামনে। পেছন থেকে লাফিয়ে নামল একজন হকার, বগলে একগাদা কাগজ। পথের পাশের ফুটপাতে কাগজগুলো সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। চলে গেল ভ্যানটা। খদ্দেরের অপেক্ষা করছে হকার। পরিচিত দৃশ্য।

ছেলেদের মাথার ওপরে নিঃশব্দে খুলে গেল একটা জানালা। 'মনে হয়,' শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ; 'তোমরা আমার ঘরে এসে বসলেই বেশি আরাম পাবে। বাইরে ঠাণ্ডা।'

মুখ তুলে তাকাল [illegible]। খোলা জানালায় মুখ বাড়িয়ে আছে ফাদার স্মিথ। দাঁতের ফাঁকে পাইপ। 'ওই [illegible]পের ভেতরে কেন? ঘরে এস। সামনের দরজা খুলে দিচ্ছি। ঘুরে চল এস।'

অনুভব করল কিশোর, ঝাঁঝাঁ করছে কান।

'এত ছোট ঝোপে লুকোনো যায় না,' আবার বললেন ফাদার। 'দেখে ফেলবেই। চলে এস। আবার পুলিশের কাজে নাক গলাচ্ছ, দেখলে খেপে যাবে ওরা।'

আর কি করবে? উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। রেকটরির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল সদর দরজার সামনে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

'তোমাদেরকে আসতে দেখেছি,' বললেন ফাদার। 'ওই যে দু'জন লোক একজন ঝাড়ুদার, আরেকজন হকার, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। ব্যাপারটা কি? গির্জায় চোর ঢোকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?'

'ওরা দু'জন কারও অপেক্ষা করছে, কি করে জানলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'আমরা তো বুঝতে পারিনি!'

'একজনকে চিনি আমি,' হাসলেন ফাদার। 'ছদ্মবেশ নিয়েও ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে। সার্জেন্ট হেগান। হাসপাতালে পলকে জেরা করতে গিয়েছিল। ওখানেই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। অন্য লোকটাকে চিনি না। তবে হকার সে নয়, বাজি রেখে বলতে পারি।'

'ধর্মপ্রচারে না এসে ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল আপনার, ফাদার!' বলে উঠল রবিন। 'পল কেমন আছে?'

'ভালই। চোর ওকে মেরেছে, এতে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে খুশিই হয়েছে সে বেশি। খবরের কাগজে নাম উঠেছে তার। বোকা গাধা!' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরালেন ফাদার। 'বোকা মেয়ে মানুষটাও নেই আজ, বিকেলটা ছুটি। কোথায় জানি গেছে। এখানে, এই পার্লারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে পারছি সেজন্যেই। নইলে এতক্ষণে চেঁচিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দিত।'

হেসে ফেলল কিশোর। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। 'পাঁচটা বাজে প্রায়!' ঘোষণা করল সে।

মিস্টার অলিভারকে আসতে দেখা গেল, হাতে বাদামী কাগজের প্যাকেট। পার্কে যাওয়ার রাস্তাটার মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোণের দিকে একটা ডাস্টবিন, উপচে পড়ছে, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ওটার সামনে দাঁড়ালেন অলিভার। এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর কয়েকটা বাক্সের ওপর আস্তে করে রেখে দিলেন প্যাকেটটা। আর কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে ফিরে আসতে লাগলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উইলশায়ারের রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো লোকটা হাঁটতে শুরু করল। ভবঘুরে। ছেঁড়া ময়লা কোট, নিচে শার্ট নেই। প্যান্টের এক পায়ের নিচের দিকে ঝুল প্রায় আধ হাত নেই, ছিঁড়ে পড়ে গেছে কোন্ কালে।

'আহা!' আস্তে মাথা নাড়লেন ফাদার। 'বেচারা!'

পার্কের গেটের দিকে এগোচ্ছে ভবঘুরে। তার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে রয়েছে ঝাড়ুদার। নুয়ে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা কি যেন তুলছে। কাগজ গুনছে হকার।

ডাস্টবিনের কাছে এসে দাঁড়াল ভবঘুরে। ডাস্টবিন ঘাঁটতে শুরু করল। পরিত্যক্ত খাবার খুঁজছে যেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। হাতে বাদামী প্যাকেট। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা তার কোটের ভেতরে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হকার। ছুটল ভবঘুরের দিকে।

হাত থেকে ঝাড়ু-ঝুড়ি ফেলে দিয়ে ছুটল সার্জেন্ট হেগান।

দুটো লোককে প্রায় একই সঙ্গে ছুটে আসতে দেখল ভবঘুরে। ঘুরেই সে ছুটল উল্টো দিকে। জানালার চৌকাঠে উঠে গেল মুসা। লাফিয়ে পড়ল বাইরে, মাটিতে।

তীব্র হর্ন বাজাল একটা ছুটন্ত কার, কোনমতে পাশ কাটিয়ে ভবঘুরেকে ধাক্কা

দেয়া এড়াল। কেয়ারই করল না লোকটা। ছুটছে প্রাণপণে।

প্রায় লাফিয়ে এসে রাস্তায় উঠল মুসা, ছুটল। চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিশ, রিভলভারের মুখ আকাশের দিকে করে বাতাসে গুলি ছুঁড়ল। রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছে ভবঘুরে, ডানে ঘুরে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আর থাকতে পারছি না, ফাদার!' বলেই জানালার চৌকাঠে উঠে বসল কিশোর। লাফিয়ে নামল মাটিতে। ছুটল। তাকে অনুসরণ করছে রবিন।

'এই যে, ছেলেরা!' চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিশ, যে হকারের ছদ্মবেশ নিয়েছে, 'পথ থেকে সর! গোলাগুলি চলতে পারে!'

শাঁ করে মোড় নিল একটা স্কোয়াড কার, টায়ারের কর্কশ শব্দ উঠল। কাছে চলে এল নিমেষে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে একজন পুলিশ। চেঁচিয়ে তাকে বলল সার্জেন্ট হেগান, 'সামনের মোড়ের দিকে গেছে!'

'দাঁড়া!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর।

ফিরে তাকাল সার্জেন্ট। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিশোরের গলা শুনে দাঁড়িয়ে গেছে মুসাও।

'কি হল?' জিজ্ঞেস করল হেগান।

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। হাঁপাচ্ছে। 'কোথায় গেছে লোকটা, জানি আমি। লুকোতে চেষ্টা করবে না সে। চমৎকার অ্যালিবাই রয়েছে।'

'ও, তুমিই সেই ছেলে, যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিস্টার অলিভার,' বলল সার্জেন্ট। 'তো খোকা, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'এখান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে। হ্যামলিন ক্লিনিকে।'

স্কোয়াড কারের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সবই শুনল পুলিশ অফিসার। ডাকল, 'এস, গাড়িতে ওঠ।'

পেছনের সিটে উঠে বসল তিন গোয়েন্দা। দেখতে দেখতে ক্লিনিকের গেটে পৌঁছে গেল গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দু'পাশের দরজা। লাফিয়ে নেমে এল আরোহীরা।

রিসেপশন রুমে ঢুকে পড়ল ওরা হুড়মুড় করে। চোখ তুলে তাকাল রিসেপশনিস্ট। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেই চুপ হয়ে গেল। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল বারান্দায়।

দুপদাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা! থমকে দাঁড়াল ডিউটি-নার্স। 'কাকে চাই? রিসেপশন আমাকে কিছু বলল না তো!'

'দরকার নেই,' বলল কিশোর। ছুটে গেল বারান্দা দিয়ে। তার পেছনে আর সবাই। হাঁ করে চেয়ে রইল নার্স।

দরজা বন্ধ জ্যাকবসের কেবিনের। ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল

কিশোর।

বিছানায় শুয়ে আছে জ্যাকবস। গলার কাছে টেনে দিয়েছে কম্বলটা। বিছানার উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা টেলিভিশনটা অন করা।

চোখ ফিরিয়ে তাকাল জ্যাকবস। 'কি ব্যাপার?'

'প্যাকেটটা কোথায়, মিস্টার জ্যাকবস?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আলমারিতে? নাকি কম্বলের তলায় নিয়ে শুয়ে আছেন?'

উঠে বসল জ্যাকবস। মুখ লাল হয়ে গেছে, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে যেন। গা থেকে খসে পড়ে গেল কম্বল। চেক চেক একটা জ্যাকেট গায়ে, নিচে শার্ট নেই।

টান দিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল কিশোর। ওপরের তাকেই পাওয়া গেল প্যাকেটটা। খোলা হয়নি এখনও।

গুঙিয়ে উঠল জ্যাকবস।

'প্যাকেটটা ধরেছেন,' বলল কিশোর। 'আপনার হাতে মলম লেগে গেছে। শিগগিরই ভরে যাবে কালো কালো দাগে।'

চোখের সামনে হাত নিয়ে এল জ্যাকবস।

সামনে বাড়ল সার্জেন্ট হেগান। 'উকিলকে ডাকবেন নাকি?'

'আর উকিল ডেকে কি করব!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যাকবস।

কিশোরের দিকে ফিরল সার্জেন্ট। অলিভার বললেন, 'তোমরা খুব চালাক! ঠিকই বলেছেন। সুন্দর অ্যালিবাই! প্রাইভেট হসপিটাল! কে ভাবতে পেরেছিল...'

'নিজের ফ্ল্যাটে নিজেই আগুন লাগিয়েছেন জ্যাকবস,' বলল কিশোর। 'হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্যে। তিনি জানেন, এ-সময়ে এ-হাসপাতালে রোগীর ভিড় থাকে না। শহরের বেশির ভাগ লোকই বাইরে চলে গেছে বড় দিনের ছুটিতে। ফলে ডিউটি-নার্স আর ডাক্তারের সংখ্যাও কমিয়ে দেয়া হয়। ওদের চোখ এড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে যাওয়া কিছু না। তাছাড়া হাসপাতালটা বাসার কাছে। হাসপাতালের পেছনে ঝাড়ুদার ঢোকার পথ দিয়ে সহজেই ঢোকা কিংবা বেরোনও যায়। আসলে কিন্তু খুব বেশি আহত হননি জ্যাকবস। যা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করেছেন ভান। গাঁটের পয়সা খরচ করে কেউ যদি প্রাইভেট হাসপাতালে আসতে চায়, ডাক্তারদের কি? তাই তাঁর এখানে আসার ব্যাপারে সেন্ট্রাল হাসপাতালের ডাক্তাররাও আপত্তি করেননি। তাই না, মিস্টার জ্যাকবস?'

বিশ

শহরের বাইরে গিয়েছিলেন চিত্র-পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। জানুয়ারির মাঝামাঝি ফিরে এলেন।

অফিসে, বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন চিত্র-পরিচালক। এ পাশে

বসেছে তিন গোয়েন্দা। গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা রিপোর্ট পড়ছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। দীর্ঘক্ষণ পরে মুখ তুললেন। 'চমৎকার! রবিন লিখেছেও খুঁটিয়ে। নিজের ছায়াদেহ নিয়ে ঘুরতে বেরোনো! সাংঘাতিক ব্যাপার! বড় বড় ভূতও ওস্তাদ মানবে টমি গিলবার্টকে!'

'ওর এই বিশেষ ক্ষমতার কথা সে একবারও স্বীকার করেনি,' বলল রবিন। 'বলে, স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রফেসর লিসা রোজারের কাছে সব শুনে এসেছি। কিভাবে স্বপ্ন দেখে টমি, জানি আমরা।'

'হ্যাঁ,' কিশোরের দিকে ফিরলেন চিত্র-পরিচালক। 'কিশোর, কি করে জানলে, জ্যাকবসই চোর?'

'কিছু যোগ কিছু বিয়োগ করে,' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। 'প্রথমেই সন্দেহ করলাম, চোর মিস্টার অলিভারের ভাড়াটেদের কেউ হবে। সে জানে গির্জার চাবি রেকটরির কোথায় রাখা হয়। মিস ল্যাটনিনা আর মিসেস ডেনভারের স্বভাবচরিত্র জানাও তাদের কাছাকাছি যারা থাকে, তাদের পক্ষেই সহজ। জানে, ওই দু'জনকে সরাতে পারলে পুলটা নিরাপদ। টমিকে সন্দেহ করলাম। পরে বুঝলাম, সে চোর নয়। চুরিটা যখন হয়, সে ঘুমিয়েছিল তার ঘরে। একই সময় দু'জায়গায় থাকার ক্ষমতা অবশ্য তার আছে। তবে বড় জোর দেখতে এবং শুনতে পারে ছায়াশরীরে যখন থাকে। কোন জিনিস নাড়াচাড়া করতে পারে না। তার মানে ছায়াশরীর নিয়ে কারও ঘরে ঢুকে কোন জিনিস চুরি করতে পারে না সে। বাদ দিলাম তাকে সন্দেহ থেকে। বব বারোজকেও সহজেই বাদ দেয়া গেল। সে ছিলই না চুরির রাতে প্যাসিও প্লেসে। পুরুষ ভাড়াটেদের মাঝে বাকি রইল ব্রায়ান এনড্রু আর জ্যাকবস। চুরির সময় ও-বাড়িতে দু'জনের কাউকেই দেখা যায়নি। দু'জনেই শুনেছে, মিসেস ডেনভারের পুলের পানি পরিষ্কার করার কথা। পরে মনে পড়েছে আমার, কথাটা শুনে একটু যেন চমকে উঠেছিল জ্যাকবস। এনড্রুর কোন ভাবান্তরই হয়নি। তাছাড়া সে রাতে গাড়ি নিয়ে কোথাও বেরিয়েছিল জ্যাকবস।'

'নিশ্চয় বোমার সরঞ্জাম কিনতে?' বলে উঠলেন চিত্র-পরিচালক। 'এসব জিনিস বাড়িতে রাখে না লোকে হরহামেশা।'

'অতি সাধারণ কয়েকটা কেমিক্যাল কিনে নিয়ে এল জ্যাকবস,' আবার বলল কিশোর। 'সাধারণ একটা বোমা বানিয়ে বসিয়ে রাখল মিসেস ডেনভারের গাড়ির ইঞ্জিনে। মোটেই মারাত্মক ছিল না বোমাটা। প্রচণ্ড শব্দ আর ধোঁয়া বেরোনর জন্যে তৈরি, ক্ষতি সামান্যই করে। ভয় দেখিয়ে মহিলাকে তাড়াতে চেয়েছে আসলে জ্যাকবস। যাতে, অন্তত দুটো দিন পুলটা পরিষ্কার করাতে না পারে ম্যানেজার। রহস্যটা সমাধান প্রায় করে এনেছিলাম, কিন্তু ঘরে আগুন লাগিয়ে একটা গোলকধাঁধায় ফেলে দিল আমাকে জ্যাকবস। আগুন লাগাটা দুর্ঘটনা নয়, তখনই

বুঝেছি। খটকা লাগল। সিগারেটের ব্যাপারে খুবই সতর্ক জ্যাকবস, সঙ্গে অ্যাশট্রে নিয়ে ঘোরে, ছাই থেকে আগুন লেগে যাবার ভয়ে। ধরে নিলাম, এনড্রু চোর। আগুন লাগিয়ে জ্যাকবসকেও সরাতে চেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগল মনে, কেন সরাতে যাবে? পুলের সঙ্গে জ্যাকবসের কোন সম্পর্ক নেই। কোন যুক্তিই খুঁজে পেলাম না। দ্বিধায় পড়ে গেলাম। সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল, যখন চিঠি নিয়ে এল পিয়ন। খামে উইলশায়ার পোস্ট অফিসের ছাপ। তাছাড়া সময় ঠিক করেছে বিকেল পাঁচটা, বেড়ালকে খাবার খাওয়াবার সময় তখন এনড্রুর। কিছুতেই এই সময়ে টাকা আনতে যাবে না সে। শিওর হয়ে গেলাম, জ্যাকবসই চোর।'

হাসলেন চিত্র-পরিচালক। 'ঠিক। পাঁচটায় কিছুতেই অনুপস্থিত থাকবে না এনড্রু। মোটেল থেকে এসেও বেড়ালদেরকে খাওয়ায়। একবার গরহাজিরা দিলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে বেড়ালের পাল। বেড়াল-মানবের অনুপস্থিতি জানিয়ে দেবে। কিছুতেই এই ঝুঁকি নিত না এনড্রু হলে। ঠিকই ভেবেছ তুমি।' ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিন্তু চুরি করতে গেল কেন জ্যাকবস? টাকার এতই টান পড়েছিল?'

'টান পড়েছিল, পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে জ্যাকবস। তার ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছিল। অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল ব্যাংকে। এমনিতেই টাকা পরিশোধ করতে না পারার দায়ে জেলে যেতে হত তাকে। কাজেই নিয়েছে ঝুঁকি।'

'সেই পুরানো প্রবাদ!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চিত্র-পরিচালক। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট! নইলে জ্যাকবসের মত লোক একাজ করতে যেত না! ভীষণ চাপে পড়েই কাজটা করে ফেলেছে বেচারা!'

'আয় যখন ভাল ছিল, ভাগ্নের পড়ার খরচের জন্যে, তার নামে ব্যাংকে অনেক টাকা জমা করেছে জ্যাকবস মাসে মাসে,' বলল কিশোর। 'দশ হাজার ডলারের বেশি হবে। ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দিয়েছে বব তার টাকা থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা এখন আর শুধু তার হাতে নেই। আরও কয়েকটা কেস ঝুলছে জ্যাকবসের মাথায়। পল মিলনকে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছে, মিস ল্যাটনিনাকে বিষ খাইয়েছে, মিসেস ডেনভারের গাড়িতে বোমা ফাটিয়েছে। জানালা ভেঙে অন্যের ঘরে ঢুকে জিনিস চুরি করেছে, সেটা আবার ফেরত দেয়ার কথা বলে দশ হাজার ডলার দাবি করেছে মালিকের কাছে। এগুলো মস্ত অপরাধ।'

'হুঁ!' মাথা ঝোঁকালেন চিত্র-পরিচালক। 'আচ্ছা, ছায়াশ্বাপদ কবে, কে মিস্টার অলিভারের কাছে নিয়ে আসবে, জ্যাকবস জানল কিভাবে?'

'টমি বলেছে,' বলল কিশোর। 'সেদিন সকালেই মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিল সে। ফোনে তাঁকে কথা বলতে শুনেছে মিকো ইলিয়টের সঙ্গে। মিসেস ডেনভার জ্যাকবসকে বলেছিল, কুকুর আনার কথা। সে ব্যাপারেই টমির সঙ্গে কথা বলছিল জ্যাকবস। এক পর্যায়ে টমি বলে বসেছে, ওটা জ্যান্ত কুকুর নয়, ক্রিস্টালের

মূর্তি। অনেক দাম। কথায় কথায় তার কাছ থেকে খবর বের করে নিয়েছে স্টকব্রোকার। তারপর মিউজিয়মে চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, মূর্তিটা কে বানিয়েছে, কেমন মূল্যবান। ছায়াশ্বাপদ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জেনে এসেছে শো-গ্যালারি থেকে। মনে মনে প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে। মিকো ইলিয়টকে অনুসরণ করে এসেছে গ্যালারি থেকেই। জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে মিকো ঘরে থাকতেই...'

'বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল একেবারে!' মন্তব্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'হ্যাঁ। তবে ওর কপাল খারাপ, রাস্তার মোড়েই পুলিশ ছিল। তাড়া খেয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকতে পারত, কিন্তু তাহলে ধরা পড়ে যেত। গির্জাটাই নিরাপদ জায়গা মনে করেছে। ঠিকই মনে করেছিল। পুলিশকে তো ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিল।'

'কিন্তু সে জানত না, সে-সময়ে মিস্টার অলিভারের বাড়িতে হাজির তিন গোয়েন্দা,' বুক ফোলাল মুসা। মুখে হাসি।

'আসলেই তার কপাল খারাপ,' বলল কিশোর। 'ফাঁকি তো প্রায় দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সে কি আর জানত, পুলে যখন মূর্তিটা ছাড়ছে, কাছেই ছায়াশরীরে দাঁড়িয়েছিল টমি গিলবার্ট?'

'টমি আছে এখনও ও-বাড়িতে?' জানতে চাইলেন পরিচালক।

'না,' বলল মুসা। 'বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন তাঁকে মিস্টার অলিভার। কাছেপিঠে ওরকম একটা প্রেতসাধককে রেখে শান্তিতে থাকতে পারবেন না, বুঝে ফেলেছেন। পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসের কোথায় একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এখন সে।'

'ওখান থেকেও তো আসতে পারে তার ছায়াশরীর?'

'পনেরো দিন হয়ে গেল,' জবাব দিল রবিন। 'এর মাঝে একবারও আসেনি, জানিয়েছেন মিস্টার অলিভার। মিসেস ডেনভারকেও বিদেয় করে দিয়েছেন। ভাড়াটেদের শান্তি নষ্ট করবে তাঁর ম্যানেজার, এটা কিছুতেই চান না। নতুন ম্যানেজার রেখেছেন। কমবয়েসী একটা মেয়ে। কারও সাতেও থাকে না পাঁচেও না। কাজ যা করার করে, বাকি সময় ঘরে বসে নিজের কাজ করে, বই পড়ে, কিংবা টিভি দেখে। যেচে পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলতেও যায় না।'

'যাক, সব সমস্যারই সমাধান হল,' বললেন পরিচালক। 'একটা ছাড়া। বৃদ্ধ ফাদারের ভূত...'

'ওটা কারও ভূত না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'জ্যাকবসই ফাদারের ছদ্মবেশে গিয়েছিল...'

'জানি,' হাত তুললেন পরিচালক। 'আমি সেকথা বলছি না। বলছি, গুজব আছে, গির্জায় ফাদারের ভূত দেখা যায়। যা রটে, তা কিছুটা তো বটে! কেন জানি

মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা, আছে! কি দেখল, কাকে দেখল তামারা ব্রাইস? সবই কি তার কল্পনা?'

'হ্যাঁ, সেটা একটা রহস্য,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'সময় পেলে খোঁজ করে দেখব ভালমত। হয়ত রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারব।...তো আজ আসি, স্যার।'

'এস,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'পারলে শিগগিরই ফাদারের ভূতের সন্ধান করতে যেও। আর, এর মাঝে নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলে জানাব। নাউ, থ্যাংক ইউ, মাই বয়েজ!'

—o—

মমি

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে ব্যস্ততা।

চাচীকে সাহায্য করছে কিশোর পাশা, আর তার দুই বন্ধু মুসা আমান ও রবিন মিলফোর্ড।

তিন চাকার ছোট্ট গাড়ি নিয়ে ইয়ার্ডের ভেতরে এসে ঢুকল পোস্টম্যান। একগাদা পুরানো লোহা-লক্কড়ের কাছে দাঁড়ানো মারিয়া পাশার দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল একবার, তারপর এগিয়ে গেল কাঁচে ঘেরা ছোট্ট অফিস ঘরের দিকে। বারান্দার দেয়ালে ঝোলানো চিঠির বাক্সে একগাদা চিঠি ফেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

'হায় আল্লাহ!' বলে উঠলেন মেরিচাচী, ভুলেই গিয়েছিলাম! কিশোর বাপ, এক দৌড়ে পোস্ট অফিসে যা তো! একটা জরুরি চিঠি রেখে গেছে তোর চাচা, পোস্ট করে দিয়ে আয়।'

অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দোমড়ানো একটা খাম বের করলেন মেরিচাচী। হাত দিয়ে ডলে সমান করে বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

'রেজিস্ট্রি করে পাঠাস,' বললেন মেরিচাচী। আরেক পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন কিশোরকে। 'সকালের ডাক ধরাতে পারিস কিনা দেখিস।'

'পারব,' কিশোরের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। 'মুসা আর রবিনকে খাটিয়ে নাও এই সুযোগে।' দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। তাড়াতাড়ি সাইকেল বের করে চড়ে বসল।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল কিশোর। সেদিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন মেরিচাচী। মুসা আর রবিনকে বললেন, 'চল, চিঠিপত্রগুলো দেখে ফেলি। আজকাল কিশোরের নামেও অনেক চিঠি থাকে।'

খুশি মনেই মেরিচাচীকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

বাক্স খুলে চিঠিগুলো নিয়ে অফিসে এসে বসলেন মেরিচাচী। একটা চিঠি খুলে দেখলেন। 'হুঁম্‌ম্‌, একটা বাড়ির মাল নিলাম হবে।...এটা, বিল...একটা স্টীম বয়লার বিক্রি করেছিলাম, তার বিল।...আরেকটা বিল।...ও, এটা এসেছে আমার বোনের কাছ থেকে।...এটা?...একটা বিজ্ঞাপন টেলিভিশনের...।' একটার পর একটা চিঠি খুলে দেখছেন, আর মন্তব্য করছেন চাচী। রাশেদ চাচার নামে ব্যক্তিগত চিঠিও আছে গোটা দুয়েক। ওগুলো খুললেন না। আরও দুটো চিঠির নাম

ঠিকানা দেখে সামান্য ভুরু কোঁচকালেন। মৃদু একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। খুললেন না এ দুটোও, আড়চোখে তাকালেন একবার মুসা আর রবিনের মুখের দিকে। বড়ই হতাশ হয়েছেন যেন, এমনি ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'নাহ,' কিশোরের জন্যে কিছুই নেই। দুই গোয়েন্দার দিকে সরাসরি তাকালেন। 'তবে, তিন গোয়েন্দার নামে আছে দুটো, এই যে। নেবে নাকি? না কিশোরের হাতে দেব?'

মেরিচাচীর কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোঁ মেরে চিঠি দুটো তুলে নিল মুসা। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, 'হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি!' ছুটে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

মুসার পেছনেই বেরোল রবিন। ফিরে চাইলে দেখতে পেত, সস্নেহ হাসি ফুটছে মেরিচাচীর ঠোঁটে।

পেছনে ফিরে তাকাল একবার মুসা, 'আমাদের অফিশিয়াল কিছু হতে পারে, গোপনীয়। তাই ওখানে খুললাম না। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে খুলব।'

মাথা কাত করল রবিন।

দুই সুড়ঙ্গের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। লোহার পাতটা সরিয়েই ঢুকে পড়ল পাইপের ভেতরে।

মোবাইল হোমের ভেতরে অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল মুসা। ফিরে তাকাল। রবিনও ঢুকছে।

দুটো চিঠিরই কোণের দিকের ঠিকানা পড়ল মুসা। 'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত গলায়। 'একটা এসেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে। এটাই আগে খুলি।'

রবিনও উত্তেজিত। 'না, এটা পরে। কাজের কিছু থাকলে ওটাতেই আছে। আচ্ছা, কিশোরের ফেরার অপেক্ষা করবে?'

'এত সৌজন্য না দেখালেও চলবে,' ঝাঁঝাল কণ্ঠ মুসার। 'একটু আগে কি বলল? আমাকে আর তোমাকে খাটিয়ে নিতে। ওসব অপেক্ষা-টপেক্ষার দরকার নেই। খোল। রেকর্ড রাখার আর পড়াশোনার দায়িত্ব তোমার ওপর। তার মানে চিঠি খোলারও।'

মুসার কথায় যুক্তি আছে, আর কিছু বলল না রবিন। একটা চিঠি নিয়ে সাবধানে ছুরি ঢুকিয়ে দিল এক প্রান্তে। কাটল। 'আচ্ছা মুসা, চিঠিটা পড়ার আগে চিন্তা করে দেখি, দেখেই কিছু বোঝা যায় কিনা। কি বল? শার্লক হোমস চিঠি দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারতেন ওটা সম্পর্কে। কিশোরও তাই বলে, শুধু দেখেই নাকি অনেক কিছু বলে দেয়া যায়। এস, চেষ্টা করে দেখি।'

'শুধু দেখেই কি আর বলা যাবে?' সন্দেহ ফুটেছে মুসার চোখে।

জবাব দিল না রবিন। গভীর মনোযোগে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করছে খামটা।

হালকা নীল রঙ। নাকের কাছে তুলে শুঁকল। লাইলাক ফুলের গন্ধ। ভেতরের কাগজটা বের করল। গন্ধ আর রঙ খামটার মতই। চিঠির কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটা ছবি ছাপা, দুটো বেড়ালের বাচ্চা খেলছে।

'হুঁম্‌ম্‌!' গম্ভীর হল রবিন। কপালে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে টোকা দিল বার দুই, যেন মগজটাকে খোলাসা করে নিতে চাইছে। 'হ্যাঁ, আমার কাছেই এসেছে এটা (সিনেমায় দেখা শার্লক হোমসের কথা আর ভঙ্গি নকলের চেষ্টা করছে)। পাঠিয়েছেন এক মহিলা। বয়েস, এই, পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেঁটেখাট, মোটা। চুলে রঙ মাখানো। কথা বলেন প্রচুর। বেড়াল বলতে পাগল। মনটা খুব ভাল। মাঝে মাঝে সামান্য খেয়ালী হয়ে পড়েন। এমনিতে তিনি হাসিখুশি, তবে এই চিঠি লেখার সময় খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন।'

ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার দুই চোখ। 'খাইছে! শুধু ওই খাম আর চিঠির কাগজ দেখেই এত কিছু জেনে গেলে!'

'নিশ্চয়,' রবিন নির্লিপ্ত। 'আর হ্যাঁ, মহিলা খুব ধনী। সমাজসেবা করেন।'

রবিনের হাত থেকে খাম আর চিঠিটা নিল মুসা। উল্টেপাল্টে দেখল। ভুরু কুঁচকে গেছে। অবশেষে আগের জায়গায় ফিরে গেল আবার ভুরু। 'বেড়ালের বাচ্চার ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মহিলা বেড়াল ভালবাসেন। স্ট্যাম্পের পাতা থেকে তাড়াহুড়ো করে খুলেছেন স্ট্যাম্প, একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে, তারমানে খামখেয়ালী। লেখার স্টাইল দেখে বোঝা যাচ্ছে, হাসিখুশি। নিচের লাইনগুলো আঁকাবাঁকা, লেখাও কেমন খারাপ, অর্থাৎ কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ঠিক জায়গায় নজর দিতে পারলে ডিডাকশন খুব সহজ।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল মুসা। 'শার্লক হোমস কিংবা কিশোর পাশার শাগরেদ হতে পারলে, এ-বিদ্যা শেখা আরও সহজ। কিন্তু, তুমিও কম না। মহিলার বয়স, আকৃতি, ধনী, চুলে রঙ করেন, বেশি কথা বলেন, এগুলো জানলে কি দেখে?'

হাসল রবিন। 'খামের কোণে মহিলার ঠিকানা রয়েছে। সান্তা মনিকার। জায়গাটা ধনীদের এলাকা, জানই। আর ওখানকার ধনী বয়স্কা মহিলাদের সময় কাটানর জন্যে সমাজসেবা ছাড়া আর তেমন কিছুই করার নেই।'

'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু চুলের রঙ? বয়স? বেশি কথা বলে? আকৃতি? এসব কি করে বুঝলে?'

'বুঝেছি,' সহজ গলায় জবাব দিল রবিন। 'লাইলাক ফুলের রঙ আর গন্ধ পছন্দ মহিলার, সবুজ কালিতে লেখেন। বয়স্কা মহিলাদেরই এসব রঙ আর গন্ধ বেশি পছন্দ। আমার খালাও পছন্দ করেন। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মোটাসোটা, বেঁটে, বেশি কথা বলেন, চুলে রঙ লাগান—তবে চিঠি লেখিকার

ব্যাপারে এসব সত্যি নাও হতে পারে। স্রেফ অনুমান করেছি। শিওর বলতে পারব না।' চিঠির নিচে সইটা আরেকবার দেখল রবিন। 'তবে একেবারে ভুল, তাও বলব না। আমার খালা আর এই মিসেস ভেড়া চ্যানেলের অনেক কিছুতেই মিল দেখতে পাচ্ছি।'

হাসল মুসা। 'আমাকে বোকাই বানিয়ে ফেলেছিলে। তবে, ডিডাকশন ভালই করেছ। শেষগুলো সত্যি হলে একশোতে একশোই দেয়া যায়। আচ্ছা, এবার দেখা যাক, কি লিখেছেন মহিলা।'

চিঠিটা মুসাকে শুনিয়ে জোরে জোরে পড়ল রবিন। মিসেস চ্যানেলের একটা আবিসিনিয়ান বেড়াল ছিল, নাম স্ফিঙ্কস। মহিলার খুব আদরের প্রাণী। হপ্তাখানেক আগে নিখোঁজ। পুলিশকে খবর দিয়েও লাভ হয়নি, তারা বেড়ালের ব্যাপারে উদাসীন। খবরের কাগজে ইদানীং তিন গোয়েন্দার খুব নাম দেখে চিঠি পাঠিয়েছেন। যদি তাঁরা তাঁর বেড়ালটা খুঁজে বের করে দেয়, কৃতজ্ঞ হবেন।

'বেড়াল নিখোঁজ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'আমাদের জন্যে কেসটা ভালই। সহজ, বিপদ নেই, কোনরকম ভয়ের কারণ নেই। মহিলাকে রিং করে বলি, কেসটা নিলাম...'

'দাঁড়াও,' মাথা তুলল রবিন। 'মিস্টার ক্রিস্টোফার কি লিখেছেন, পড়ি আগে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' ফোনের দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছে মুসা।

দ্বিতীয় খামটা খুলে ফেলল রবিন। খুব দামি বণ্ড পেপারে লেখা একটা চিঠি। ওপরে এক পাশে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের নাম-ঠিকানা ছাপা।

মুসাকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল রবিন। প্রথম বাক্যটা পড়েই থমকে গেল। তারপর খুব দ্রুত চোখ বোলাল পরের লাইনগুলোর ওপর। মুখ তুলে দেখল, অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে গোয়েন্দা-সহকারী।

'সর্বনাশ!' জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে যেন রবিন। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে। 'নাও, নিজেই পড়। আমি বললে বিশ্বাস করবে না।'

নীরবে চিঠিটা নিল মুসা। রবিনের মতই দ্রুত পড়ে শেষ করল। মুখ তুলে তাকাল রবিনের দিকে। বিস্ময়ে কোটর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার চোখ। 'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল। 'তিন হাজার বছরের পুরানো মমি কথা বলে।'

দুই

রকি বীচ থেকে মাইল বারো দূরে, হলিউডের বাইরে একটা গিরি সঙ্কট। পাহাড়ের ঢালে এখানে কয়েকটা বড়সড় বাংলোমত বাড়ি, প্রচুর পয়সা খরচ করে তৈরি

হয়েছে। বাড়িগুলোকে ঘিরে আছে গাছপালা, ঝোপঝাড়। পুরানো স্প্যানিশ রীতির একটা বড় বাড়ি আছে, একটা অংশকে ব্যক্তিগত জাদুঘর বানিয়ে নিয়েছেন বাড়ির মালিক প্রফেসর বেনজামিন, একজন বিখ্যাত ইজিপটোলজিস্ট—মিশর-তত্ত্ববিদ। প্রাচীন মিশর ও পিরামিড সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান।

বাড়িটার জানালাগুলো আবার ফরাসী রীতির বড় বড়, জানালা প্রায় মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। একটা বিশেষ ঘরের জানালা বন্ধ। সেই জানালার পাশে সারি দিয়ে সাজানো কয়েকটা মূর্তি, প্রাচীন মিশরীয় কবর খুঁড়ে বের করে আনা। একটা মূর্তি ভারি কাঠের তৈরি। শরীর মানুষের, মুখটা শেয়ালের। প্রাচীন দেবতা, আনুবিস। শার্সি ভেদ করে ঢুকছে পড়ন্ত বিকেলের রোদ, মেঝেতে ছায়া পড়েছে আনুবিসের। শেয়ালের মত মুখের ছায়া অনেকটা বেশি লম্বা হয়ে পড়েছে মেঝেতে, দেখলেই গা ছমছম করে।

মিশরের পিরামিড আর প্রাচীন কবর থেকে তুলে আনা আরও সব জিনিসে প্রায় ঠাসা ঘরটা। দেয়ালে ঝুলছে ধাতব মুখোশ, সে মুখোশের বিকৃত ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। মাটির তৈরি চাকতি আর ছোট ছোট ফলক, সোনার গয়না, সবুজ পাথর থেকে খোদাই করা 'পবিত্র' গোবরে পোকার প্রতিকৃতি সাজানো রয়েছে কাচের বাক্সে। একটা জানালার কাছে রাখা আছে একটা মমির-কফিন, কাঠের তৈরি ডালা আটকানো। অতি সাধারণ কফিন। গায়ে সোনার পাত নেই, নেই রঙে আঁকা কোনরকম নকশা বা ছবি। বিলাসিতা বা আড়ম্বরের কোন ছাপই নেই ওটাতে।

কফিনটা এক রহস্য, এমনকি প্রফেসর বেনজামিনের কাছেও। ওটা তাঁর গর্বের বস্তু।

প্রফেসর বেনজামিন, ছোটখাট একজন মানুষ, শরীরের তুলনায় ভুঁড়িটা সামান্য বড়, চেহারা আরও সম্ভ্রান্ত করে তুলেছে কাঁচা পাকা দাড়ি। চোখে গোল্ড-রিম চশমা।

তরুণ বয়সটা এবং তারপরেরও অনেকগুলো বছর মিশরেই কাটিয়েছেন প্রফেসর। প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক অভিযানে অংশ নিয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন অনেক পুরানো কবর, ঢুকেছেন পিরামিডের তলায়। দেখেছেন হাজার হাজার বছর আগের ফারাও, তাদের রানী আর চাকর-বাকরের মমি—বিচিত্র অলঙ্কার আর জিনিসে জড়ানো। মূর্তি আর অন্যান্য জিনিসপত্র ওখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কয়েক বছর আগে ফিরে এসেছেন দেশে। প্রাচীন মিশরে তাঁর আবিষ্কার আর অভিযানের ওপর একটা বই লিখেছেন।

ওই কফিন আর ভেতরের মমিটা তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে মাত্র এক হপ্তা হল। এটা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে। সে সময় এবং তার পরের অনেকগুলো বছর খুব ব্যস্ত ছিলেন, নজর দিতে পারেননি মমিটার দিকে।

ওটা গচ্ছিত রেখেছিলেন কায়রোর এক জাদুঘরে। দেশে ফিরে চিঠি লিখেছেন। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মমিটা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রফেসরের ঠিকানায়, ওটার ওপর প্রচুর গবেষণা চালানর ইচ্ছে আছে তাঁর।

মি. ক্রিস্টোফার তিন গোয়েন্দাকে চিঠি পাঠানর দু'দিন আগে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর বেনজামিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। মাঝে মাঝে হাতের পেন্সিল দিয়ে আস্তে টোকা দিচ্ছেন কফিনের ডালায়। এত সাধারণ একটা কাঠের কফিনে কেন রাখা হয়েছে এই মমি! বুঝতে পারছেন না প্রফেসর। কেমন অস্বস্তি বোধ করছেন।

প্রফেসরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর খানসামা হুপার। লম্বা, রোগাটে একজন মানুষ। অনেক বছর ধরে কাজ করছে তাঁর এখানে।

'স্যার, আবার খুলতে চান এটা?' বলল হুপার। 'গতকাল ওই কাণ্ড ঘটার পরেও?'

'আবার ঘটুক, তাই আমি চাই,' জোর দিয়ে বললেন প্রফেসর। 'জানালাগুলো খুলে দাও। কতবার না বলেছি, বন্ধ ঘরে দম আটকে আসে আমার!'

'এই দিচ্ছি, স্যার,' তাড়াতাড়ি কাছের জানালাটা খুলে দিল হুপার। অন্যগুলোও খুলতে এগোল।

কয়েক বছর আগে একটা কবরে আটকা পড়ে যান প্রফেসর বেনজামিন। দু'দিন ওই বন্ধ ঘরে আটকে থাকার পর বের করে আনা হয় তাঁকে। সেই থেকেই বন্ধ যে-কোন রকম ঘরের ব্যাপারে একটা আতঙ্ক জন্মেছে তাঁর।

সবক'টা জানালা খুলে দিয়ে এল হুপার। ডিবার ডালার মত আলগা চারকোনা কফিনের ডালা। তুলে ওটা কফিনের পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখল সে। দু'জনেই সামান্য ঝুঁকে তাকাল কফিনের ভেতরে।

'বাহ্, তোমার সাহস আছে বলতে হবে, হুপার,' প্রশংসা করলেন প্রফেসর। 'অনেকেই মমির দিকে তাকাতে সাহস করে না। অথচ একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বিটুমিন আর অন্যান্য আরকে ভিজিয়ে, লিনেন জড়িয়ে রাখা হত হাজার হাজার বছর আগের মিশরীয় রাজ-রাজাদের দেহ। হয়ত ওদের বিশ্বাস ছিল, দেহটা ঠিক থাকলে মৃত্যুর পরের জগতে ঢোকা খুব সহজ হবে। আরেক দুনিয়ায় গিয়ে যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্যে সঙ্গে দেয়া হত সব রকমের দরকারি জিনিসপত্র। চাকর-বাকরদেরও মেরে মমি বানিয়ে রেখে দেয়া হত রাজার পাশের কোন কক্ষে। আরেক জগতে চাকরেরও অভাব হবে না রাজার, এই বিশ্বাসে। কী অদ্ভুত ধর্ম, আর বিশ্বাস!' আবার মমিটার দিকে তাকালেন তিনি। ভেতরের দিকে কফিনের গায়ে খোদাই করা আছে, 'রা-অরকন'-এর নাম। মমি জড়িয়ে থাকা লিনেনের একটা অংশ খোলা। ফলে রা-অরকনের চেহারা দেখা যাচ্ছে। গাঢ় রঙের কাঠ কুঁদে তৈরে যেন মুখ। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কথা

বলতে চায় বুঝি! চোখ বোজা।

'রা-অরকনকে আজ খুব শান্ত মনে হচ্ছে, স্যার,' বলল হুপার। 'আজ হয়ত কথা বলবে না।'

'না বললেই ভাল। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি কথা বলে এটা খুবই অস্বাভাবিক!'

'হ্যাঁ, স্যার!'

'অথচ, গতকাল ফিসফিস করে কি যেন বলেছিল!' আপনমনেই বললেন প্রফেসর। 'গতকাল এঘরে একা ছিলাম হুপার, তখন কথা বলে উঠছিল মমিটা। অদ্ভুত ভাষা, বুঝিনি! তবে কথার ধরনে মনে হয়েছে আমাকে কিছু একটা করতে বলছে ও!'

মমিটার ওপর আবার ঝুঁকলেন প্রফেসর। 'রা-অরকন, আজও কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? বলুন। আমি শুনছি।'

চুপ করে রইল মমি। এক মিনিট কাটল। দুই। ঘরে এসে ঢুকেছে একটা মাছি, ওটার ভনভন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

'আমার কল্পনাও হতে পারে,' আপন মনেই কথা বলছেন প্রফেসর। 'না, কাল কোন কথা বলেনি মমি। ওটা নিছকই আমার কল্পনা। হুপার, ওয়ার্কশপ থেকে ছোট করাতটা নিয়ে এস। কফিন থেকে ছোট এক টুকরো কাঠ কেটে নেব, আজই পাঠাব ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে। কার্বন টেস্ট করিয়ে মমিটার আসল বয়স জানার দরকার।'

'ঠিক আছে, স্যার, যাচ্ছি।' বেরিয়ে গেল হুপার।

কফিনের ওপর ঝুঁকলেন প্রফেসর। টোকা দিয়ে দিয়ে দেখলেন। কোথা থেকে কাটলে ভাল হবে? একটা জায়গায় ফাঁপা মনে হল টোকার শব্দ। চিলতে কাঠ ভরে ফোকরের মুখ বন্ধ করা হয়েছে যেন।

কাজে মগ্ন প্রফেসর। হঠাৎ কানে এল চাপা বিড়বিড় শব্দ, কফিনের ভেতর থেকেই আসছে! ঝট করে সোজা হয়ে গেলেন তিনি। চোখে অবিশ্বাস। আবার ঝুঁকে মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, মমিই! ফিসফিস করে কি যেন বলছে! সামান্য ফাঁক করা ঠোঁটের ভেতর থেকেই যেন বেরিয়ে আসছে শব্দগুলো। মিশরীয় ভাষা, কোন সন্দেহ নেই। তবে ঠিক কোন ভাষা, বোঝা গেল না। তিন হাজার বছর আগের কোন ভাষা হবে, অনুমান করলেন তিনি। একটা শব্দও বুঝতে পারছেন না প্রফেসর। কেমন খসখসে কণ্ঠস্বর, কথার ফাঁকে ফাঁকে চাপা হিসহিসানী। এতই নিচু কণ্ঠস্বর, কোনমতে শুনতে পাচ্ছেন তিনি। মাঝে মাঝে বেড়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার ঝপ করে খাদে নেমে যাচ্ছে আওয়াজ। মমিটা তাকে কিছু বোঝানর জোর চেষ্টা চালাচ্ছে যেন।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন প্রফেসর। ভাষাটা বোধহয় আরবী, তবে অনেক প্রাচীন। দু'য়েকটা শব্দও কেমন পরিচিত লাগছে না!

'বলে যান, রা-অরকন!' অনুরোধ জানালেন প্রফেসর। 'বোঝার চেষ্টা করছি আমি।'

'স্যার?'

বোমা ফাটল যেন ডাকটা! চমকে উঠে পাঁই করে ঘুরলেন প্রফেসর। এতই মগ্ন ছিলেন, হুপার এসে ঢুকেছে, টেরই পাননি। নীরব হয়ে গেছে রা-অরকন।

করাতটা মালিকের দিকে বাড়িয়ে দিল হুপার।

'হুপার!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আবার কথা বলেছে মমি! তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই শুরু করেছে! যেই ঘরে ঢুকেছ, থেমে গেছে!'

হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেল হুপার। ভ্রূকুটি করল। 'তার মানে, আপনি একা না হলে ওটা কথা বলে না! কি বলল, বুঝতে পেরেছেন, স্যার?'

'না!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'ইস্‌স্‌, কেন যে ভাষাবিদ হলাম না! প্রাচীন আরবীই বলছে বোধহয়। হিট্টাইট কিংবা শ্যালডিনও হতে পারে!'

ভারি ভারি সব শব্দ! উচ্চারণ করতেই কষ্ট হয় হুপারের, মানে বোঝা তো দূরের কথা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। চোখে পড়ছে গিরিপথের ওপারে প্রায় একশো গজ দূরে ঢালের গায়ে আরেকটা বাড়ি। নতুন তৈরি হয়েছে, আধুনিক ধাঁচ।

'এত ভাবনার কি আছে, স্যার?' হাত তুলে বাড়িটা দেখাল হুপার। প্রফেসর উইলসন তো কাছেই থাকেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন। রা-অরকনের কথা তিনি বুঝতে পারবেন। অবশ্য যদি তাঁর সামনে কথা বলে মমিটা।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আরও আগেই ডাকা উচিত ছিল জিমকে। জান না বোধহয়, রা-অরকনকে খোঁজার সময় ওর বাবা ছিল আমার সঙ্গে। আহা, বেচারা! মমিটা খুঁজে পাওয়ার এক হপ্তা পরেই নৃশংসভাবে খুন করা হল তাঁকে! কে, কেন করল, কিচ্ছু জানা যায়নি!...যাকগে, তুমি এখনি ফোন কর জিমকে। বল, আমি ডাকছি। এখুনি যেন চলে আসে।'

'যাচ্ছি, স্যার।'

হুপার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কথা বলে উঠল মমি। শুরু হয়ে গেল তার গা ছমছম-করা ফিসফিসানী।

মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গিয়ে কথা বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন আরেকবার প্রফেসর। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সোজা হলেন। তাকালেন গিরিপথের ওপারের বাড়িটার দিকে। গিরিখাতগুলো এখানে অদ্ভুত। পথের অনেক নিচে নেমে গেছে ওপাশে পাহাড়ের ঢাল। ভাষাবিদ জিম উইলসনের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পথের সমতলের বেশ অনেকখানি নিচে।

দেখতে পাচ্ছেন প্রফেসর, বাড়ির একপাশের দরজা দিয়ে বেরোলেন ভাষাবিদ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেস গ্যারেজে। গাড়ি বেরোল। ছোট্ট একটা ব্রিজ পেরিয়ে নামল পেঁচানো সরু গিরিপথে। চোখ যেদিকেই থাক, প্রফেসরের কান রয়েছে মমির দিকে। ফিসফিস থামিয়ে দিয়েছে ওটা, বোধহয় কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েই হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন প্রফেসর। যদি কথা না বলে মমিটা? প্রফেসর উইলসন এসেও কিছু করতে পারবেন না। কথা না শুনলে মানে বলবেন কি করে?

'কথা থামাবেন না, রা-অরকন! প্লীজ!' অনুরোধ করলেন প্রফেসর বেনজামিন। 'প্লীজ, আবার বলুন! আমি শুনছি। বোঝার চেষ্টা করছি।'

নীরব হল মমি। বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল। খানিক পরেই খুলে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকলেন জিম উইলসন।

'এই যে জিম, এসে পড়েছ,' বলে উঠলেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন উইলসন।

'এদিকে এস। অদ্ভুত একটা ভাষা শুনতে পাবে!'

পাশে এসে দাঁড়ালেন উইলসন। চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর, 'রা-অরকন, প্লীজ! কথা বলুন, যা বলছিলেন এতক্ষণ, আবার বলুন!'

নীরব রইল মমি, এ-ঘরে আসার আগের তিনশো শতাব্দী যেমন ছিল।

'কাকে কি বলছেন বুঝতে পারছি না!' উইলসনের কণ্ঠে বিস্ময়। হালকা-পাতলা শরীর, মাঝারি উচ্চতা, হাসি-খুশি সুন্দর চেহারা। বয়স, এই পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। ভারি চমৎকার কণ্ঠস্বর। 'ওই শুকনো লাশকে কথা বলতে বলছেন নাকি!'

'হ্যাঁ,' কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন প্রফেসর। 'ফিসফিস করে কথা বলে। অদ্ভুত ভাষায়। শুধু আমার সঙ্গে। অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই...।' ভাষাবিদের চাহনী দেখে থেমে গেলেন তিনি। 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? রা-অরকন আমার সঙ্গে কথা বলে, বিশ্বাস করতে পারছ না?'

গাল চুলকালেন। 'বিশ্বাস করা কঠিন। তবে নিজের কানে শুনলে...'

'চেষ্টা করে দেখি,' মমির ওপর ঝুঁকলেন প্রফেসর। 'রা-অরকন, কথা বলুন। বোঝার চেষ্টা করব আমরা।'

দু'জনেই অপেক্ষা করে রইলেন। রা-অরকনের মমি নীরব।

'কোন লাভ নেই,' শব্দ করে শ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'তবে, কথা বলেছিল ও। বিশ্বাস কর। আবার হয়ত আমি একা হলেই বলবে। তোমাকে শোনাতে পারলে ভাল হত। কি বলছে বুঝতে পারতে।'

ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে প্রফেসরের কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না

উইলসন। 'হ্যাঁ, তা হয়ত পারতাম।...আপনার হাতে ওটা কি? করাত...মমিটা কেটে ফেলবেন নাকি?'

'না, না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'কফিনের কোণ থেকে সামান্য কাঠ নিয়ে কার্বন টেস্টের জন্যে পাঠাব। রা-অরকনকে কবে কবর দেয়া হয়েছিল জানা যাবে।'

'মূল্যবান জিনিসটা কেটে নষ্ট করবেন!' ভুরু কোঁচকালেন উইলসন। 'তার কি দরকার আছে?'

'এই মমি আর কফিন সত্যিই মূল্যবান কিনা, এখনও জানি না। জানতে হলে কার্বন টেস্ট করতে হবে। তবে, অদ্ভুত রহস্যটার সমাধান করব আগে। কি বলে, জানব। তার আগে পাঠাচ্ছি না। সত্যি জিম, খুব অবাক হয়েছি! মমি কথা বলে! তা-ও আবার একা আমার সঙ্গে।'

'হুঁম্ম্।' বৃদ্ধ প্রফেসরের জন্যে করুণা হচ্ছে উইলসনের। 'এক কাজ করবেন? কয়েকদিনের জন্যে কফিনসহ মমিটা আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন। আমি একা থাকলে হয়ত আমার সঙ্গেও কথা বলতে পারে ওটা। বললে, বুঝতে পারবই। সমাধান হয়ে যাবে হয়ত রহস্যটার।'

উইলসনের দিকে তাকালেন প্রফেসর। গম্ভীর হয়ে গেছেন। 'থ্যাংক ইউ, জিম,' কণ্ঠস্বর ভারি। 'বুঝতে পারছি, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার। ভাবছ, সব আমার অলীক কল্পনা। হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে শিওর না হয়ে মমি হাতছাড়া করছি না আমি।'

সামান্য একটু মাথা ঝাঁকালেন উইলসন। 'ঠিক আছে, রা-অরকন আবার কথা বললেই ডেকে পাঠাবেন আমাকে। চলে আসব। এখন যাই। ইউনিভার্সিটিতে সম্মেলন আছে।'

প্রফেসরকে 'গুড বাই' জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর উইলসন।

মমির দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইলেন প্রফেসর বেনজামিন। নীরব রইল রা-অরকন।

'ডিনার দেব, স্যার?' দরজার কাছ থেকে হুপারের কথা শোনা গেল।

'হ্যাঁ,' মুখ ফিরিয়ে তাকালেন প্রফেসর। 'শোন, এসব কথা কাউকে কিচ্ছু বলবে না।'

'না, বলব না, স্যার।'

'উইলসনের ভাবভঙ্গি থেকেই বুঝে গেছি, কথাটা শুনলে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা কি ভাববে। মোটেই বিশ্বাস করবে না ওরা। মুখ টিপে হাসাহাসি করবে। বলবে, বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গেছি। খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিলেই গেছি। সারা জীবনে যত সুনাম কামিয়েছি, সব যাবে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' মাথা ঝোঁকাল হুপার। 'হয়ত তাই ঘটবে।'

'কিন্তু, কারও না কারও কাছে কথাটা বলতেই হবে আমাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কানের নিচে চুলকালেন প্রফেসর। 'এমন কেউ, যে বিজ্ঞানী নয়। যে জানে, অনেক রহস্যময় ঘটনা ঘটে এই দুনিয়ায়, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু কাকে বলব?...কাকে...'

'স্যার, মি. ক্রিস্টোফারকে ফোন করে দেখুন না। তিনিও তো আপনার বন্ধু। আর রহস্য নিয়েই তার...'

'ঠিক, ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আজই যোগাযোগ করব ওর সঙ্গে। সারা আমেরিকায় যদি কেউ বিশ্বাস করে আমার কথা, একমাত্র ডেভিসই করবে।'

তিন

'মমি কথা বলে কি করে?' আবার একই প্রশ্ন করল মুসা।

জবাবে শুধু মাথা নাড়ল রবিন।

দু'জনেই বার বার পড়েছে চিঠিটা। বিশ্বাসই করতে পারছে না। ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে না এলে এতক্ষণে ছুঁড়ে ফেলে দিত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। কিন্তু ফালতু কথা বলেন না চিত্রপরিচালক। তিনি যখন বিশ্বাস করেছেন, নিশ্চয় ব্যাপারটা প্রফেসর বেনজামিনের কল্পনা-প্রসূত নয়। প্রফেসরকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন মি. ক্রিস্টোফার।

'মমি তো একটা মরা লাশ,' আবার বলল মুসা। 'কি করে কথা বলে!' কোঁকড়া কালো চুলে আঙুল চালাল সে। 'এককালে মানুষ ছিল অবশ্য, তবে এখন...'

'জ্যান্ত নয়,' মুসার কথাটা বলে দিল রবিন। 'ভূত-টুত ভাবছ না তো? অপছন্দ হচ্ছে ব্যাপারটা?'

'নিশ্চয়!' হাত বাড়িয়ে ডেস্কে রাখা চিঠিটা আবার তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল মুসা। 'প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিন প্রখ্যাত ইজিপট-অল...ইজিপট-অল...!'

'ইজিপটোলোজিস্ট,' বলে দিল রবিন।

ইজিপট-অল...ইজিপট-অল...আরে ধুত্তেরি! জাহান্নামে যাক! ঝাঁজিয়ে উঠল মুসা। তারপর নিজেকেই যেন বলল, 'হলিউডের কাছে হান্টার ক্যানিয়নে থাকেন প্রফেসর। ব্যক্তিগত জাদুঘর আছে। একটা মমি আছে সেখানে, যেটা কথা বলে, এবং ভাষাটা বুঝতে পারেননি প্রফেসর। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। ঠিকই করছেন, তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। মমিটা দেখিনি, অথচ শুনেই অস্বস্তি লাগছে আমার। এ পর্যন্ত কয়েকটা রহস্যেরই তো সমাধান করলাম! বিশেষ করে ওই ছায়াশরীর আর হাউণ্ডের ব্যাপারটা এখনও মন থেকে যায়নি। রবিন, তার চেয়ে

চল সান্তা মনিকায় বেড়াল রহস্যের সমাধান করি গিয়ে।' টেবিল থেকে মিসেস ভেরা চ্যানেলের চিঠিটা তুলে নিল সে।

'কিশোর কোন্ কেসটা নিতে আগ্রহী হবে, জান,' গোমড়ামুখে বলল রবিন।

'জানি,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'ক্রিস্টোফারের চিঠিটা পড়ামাত্র তাঁকে টেলিফোন করবে সে। তারপরই ছুটবে প্রফেসর বেনজামিনের ওখানে। এক কাজ করি। এস, ভোট নিই। হারিয়ে দেব কিশোরকে। বেড়াল খোঁজার কাজটাই আগে করতে বাধ্য হবে সে।'

'ভোটাভুটিতে রাজিই হবে না সে,' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'চেষ্টা করে তো দেখেছি আগেও। টেরোর ক্যাসলের কথা মনে নেই? যাব না বলেছিলাম, তুমি আমি দু'জনেই। শুনেছিল আমাদের কথা?'

চুপ করে রইল মুসা। গম্ভীর।

'কিন্তু ও আসছে না কেন এখনও!' সুড়ঙ্গমুখের দিকে তাকাল রবিন। 'গেল তো অনেকক্ষণ।'

'দাঁড়াও, দেখি,' বলল মুসা। 'হয়ত এসেছে, কোন কাজে আটকে দিয়েছে মেরিচাচী।' ছোট মোবাইল হোমের এক কোণে চলে এল সে। মাঝারি আকারের মোটা একটা পাইপ, ছাত ফুটো করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটাকে জায়গামত আটকানর ব্যবস্থা হয়েছে লোহার শিক দিয়ে। নিচের দিকে দু'পাশে আরও দুটো লোহার পাইপ—হ্যাণ্ডেল ধরে মূল পাইপটাকে ওঠানো-নামানো কিংবা এদিক-ওদিক ঘোরানর জন্যে। আসলে ওটা একটা পেরিস্কোপ, প্রথম মহাযুদ্ধের একটা সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয়েছিল। পুরানো বাতিল অন্যান্য লোহার জিনিসের সঙ্গে ওটাও কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা। জিনিসটাকে মেরামত করে হেডকোয়ার্টারের ছাতে লাগিয়ে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। দিব্যি কাজ চলে এখন। কিশোর এক অদ্ভুত নাম দিয়েছে পেরিস্কোপটার, 'সর্ব দর্শন'।

হ্যাণ্ডেল ধরে পেরিস্কোপটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল মুসা। আয়নায় চোখ রাখল। যন্ত্রটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নজর বোলাল ইয়ার্ডে। নির্দিষ্ট একটা অবস্থানে এনে স্থির করল। 'একজন খদ্দের দেখতে পাচ্ছি। পাইপ বিক্রি করেছেন মেরি চাচী। জঞ্জাল সরাচ্ছে বোরিস···। আর, ওই যে, কিশোর,' সামান্য ঘোরাল পেরিস্কোপ। 'ফিরে এসেছে। ঠেলে ঠেলে আনছে সাইকেলটা। খারাপ হয়ে গেছে বোধহয় কিছু···হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামনের টায়ার বসে গেছে। পাঙ্কচার।'

'পেরেক-টেরেক ঢুকেছে হয়ত,' মন্তব্য করল রবিন। 'দেরি এজন্যেই। কি মনে হচ্ছে চেহারা দেখে? রেগেছে খুব?'

'নাহ্, আশ্চর্য! সঙ্গের রেডিও শুনছে আর হাসছে,' বলল মুসা। 'সত্যিই আশ্চর্য! সাইকেলের টায়ার পাঙ্কচার, ঠেলে ঠেলে আনা! কার না মেজাজ খারাপ হয়? কিশোরের তো আরও বেশি হওয়ার কথা। যেরকম খুঁতখুঁতে। তা না

হাসছে!'

'ওর মতিগতি বোঝা মুশকিল!' বলল রবিন। 'কখন হাসবে, কখন রাগবে, আর কখন কি করে বসবে, সে-ই জানে! রেডিওতে মজার কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে বোধহয়।'

'কি জানি!' পেরিস্কোপ আরেকটু বাঁয়ে ঘোরাল মুসা। 'মেরিচাচীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি যেন দিচ্ছে চাচীকে। কিছু বলছে। এদিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন চাচী। আমাদের কথাই বলছেন বোধহয়।...সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল কিশোর। অফিসে ঢুকছে।...দেরি করছে কেন? কি করছে?...ওই যে, বেরোচ্ছে।...আসছে, এদিকেই আসছে...'

'ওকে নিয়ে আজ একটু মজা করব,' হাসল রবিন। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের চিঠিটা পকেটে রেখে দিয়েছি। মিসেস চ্যানেলোরটা দেখাব আগে, কেসটা নিতে বলব। রাজি হলে তারপর দেখাব আসল চিঠি।'

'বেড়ালটা পাওয়ার আগে দেখিও না, খবরদার!' হাসল মুসা। 'আরেকটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আমি যা যা বলব, সায় দেবে। কিংবা চুপ করে থাকবে। অন্তত প্রতিবাদ করবে না।'

অপেক্ষা করছে দুই গোয়েন্দা। পেরিস্কোপের কাছ থেকে সরে এসেছে মুসা। বাইরে টিনের পাত সরানর মৃদু শব্দ হল। খানিক পরেই খুলে গেল ট্রেলারের ভেতরে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা। চট করে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। সুড়ঙ্গমুখে কিশোরের হাত দেখা গেল, তারপর মাথা। উঠে এল সে ট্রেলারে।

'উফফ্! যা গরম!' ফুহ্‌হ্ করে মুখের ভেতর থেকে বাতাস বের করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা। 'এই গরমে সাইকেলের চাকা পাঙ্কচার? ঠেলে আনা খুব কষ্টকর।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'কি করে জানলে, সাইকেলের টায়ার পাঙ্কচার?'

'ডিডাকশন,' জবাব দিল মুসা। 'তুমিই তো ডিডাকশনের ওপর জোর দিতে বল। আমি আর রবিন এতক্ষণ ধরে তাই প্র্যাকটিস করছিলাম। না, রবিন?'

মাথা নাড়ল নথি। 'হ্যাঁ। অনেক পথ হেঁটে আসতে হয়েছে তোমাকে, কিশোর?'

চোখের পাতা কাছাকাছি চলে এসেছে কিশোরের। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকাল মুসার দিকে, তারপর রবিনের মুখের দিকে। 'হ্যাঁ, তা হয়েছে এখন বল, কি ডিডাকশন করলে? কি দেখে বুঝেছ, আমার সাইকেলের চাকা পাঙ্কচার হয়েছে?'

'কি দেখে মানে?' মুসার কণ্ঠে দ্বিধা। ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছে।

'বল না, বলে দাও,' তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল রবিন। শুরুতেই না সর্বনাশ করে দেয় মুসা!

'ইয়ে···মানে,' ঢোক গিলল মুসা। 'হ্যাঁ, দেখি তোমার হাত?' কিশোরকে বলল।

তালু চিত করে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর। ময়লা ধুলোবালি লেগে আছে। নিশ্চয় টায়ার ঘাটাঘাটি ছিল। পেরেকটা খুলে ফেলে দিয়েছে। 'বল, কি করে বুঝলে?'

'তোমার হাতে, হাঁটুতে ময়লা,' সামলে নিয়েছে মুসা। 'কিছু একটা পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছিলে। ডিডাকশনঃ হাঁটু গেড়ে বসে পাঙ্কচার হওয়া টায়ার পরীক্ষা করেছ। তোমার জুতোতে প্রচুর ধুলো। ডিডাকশনঃ অনেক পথ হেঁটে এসেছ। তাই না, মাই ডিয়ার কিশোর পাশা?'

কিশোরের চেহারা দেখে মনে হল, খুব অবাক হয়েছে। 'চমৎকার। ভাল ডিডাকশন করতে শিখেছ। এই বুদ্ধি সাধারণ একটা বেড়াল খোঁজার পেছনে ব্যয় করার কোন মানে হয় না।'

'কি-ই!' চমকে উঠেছে।

'একটা আবিসিনিয়ান বেড়াল হারিয়েছে, ওটাকে খোঁজার কোন মানেই হয় না। তিন গোয়েন্দার জন্যে খুবই সহজ কাজ।' ভারিক্কি চালে বলল কিশোর, এটা মোটেই সহ্য হয় না মুসার। আড়চোখে একবার সহকারীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'তোমার মত বুদ্ধিমান গোয়েন্দার উপযুক্ত কাজ, মমির রহস্য ভেদ করা। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি, যেটা ফিসফিস করে কথা বলে।'

'কার কাছে জানলে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'তোমরা যখন ডিডাকশনে ব্যস্ত,' সহজ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি তখন মাইণ্ড রিডিং করেছি। রবিন, তোমার পকেটে রয়েছে একটা চিঠি, ওতে প্রফেসর বেনজামিনের ঠিকানা আছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ট্যাক্সি নেব। হাজার হোক, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অনুরোধ আমরা ফেলতে পারব না কিছুতেই।'

হাঁ হয়ে গেছে অন্য দুই গোয়েন্দা। বোকার মত চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

চার

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে ট্যাক্সি। পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে গাড়ি। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে।

'ইসস্!' সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল রবিন। 'ঝাঁকুনিতেই মেরে ফেলবে।

রোলস রয়েসটা হলে কি মজাই না হত! আমার একটা বাজি যদি লাগাত কোম্পানি!'

'ভেব না,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'শিগগিরই আবার ওটাতে চড়ব আমরা।'

'কি করে!' মুসা অবাক। 'তিরিশ দিন তো সেই কবেই পেরিয়ে গেছে!'

'দুয়ে দুয়ে চার হলেও, তিরিশ দিনে অনেক সময় তিরিশ হয় না,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি বলে রাখছি, ওই গাড়িটা আবার ব্যবহার করব আমরা। মাসখানেকের জন্যে ভাড়া নিয়েছেন এক ব্যাংকার। মেয়াদ শেষ হলেই কোম্পানির অফিসে ফিরে আসবে গাড়িটা। তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললেই...'

'দিয়ে দেবে!' ফস করে বলে উঠল মুসা। 'এতই সহজ!'

'একই কথা বলেছিলে মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যাওয়ার আগে। যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা বোধহয় এসে গেছি।'

আঁকাবাঁকা গিরিপথে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। খানিক দূরেই বাড়িটা। পুরানো ধাঁচের পোর্টিকো, বিশাল সব থাম। একটা থামে বসানো পেতলের প্লেটে খোদাই করা রয়েছে প্রফেসর হাবার্ট বেনজামিনের নাম। গাছপালা ঝোপঝাড় ঘিরে রেখেছে লাল টালির ছাত দেয়া স্প্যানিশ ধাঁচের বাড়িটাকে। একপাশে গোল হয়ে নেমে গেছে পাহাড়, সরু উপত্যকা সৃষ্টি করে ওপাশে আবার উঠে গেছে আরেকটা পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ওই পাহাড়টার ঢালে বিভিন্ন সমতলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উঠেছে কয়েকটা বাড়ি। নতুন। বাংলো টাইপ।

'চল নামি,' বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। দরজা খুলে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে।

রবিন আর মুসাও নামল। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল কিশোর।

'কিশোর, আমার ভয় করছে!' বলে উঠল মুসা। 'প্রফেসর বেনজামিন পাগল-টাগল নয় তো? বুড়ো ওই বিজ্ঞানীগুলো সাধারণত পাগলাটে হয়! বদমেজাজীও!'

'নাহ্,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আসার আগে তো টেলিফোন করলাম। গলা শুনে খুব ভদ্র বলেই মনে হল। চল, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক।'

'পাগলা না হলেই ভাল!' বিড়বিড় করল মুসা। এগোল গোয়েন্দাপ্রধানের পিছু পিছু। 'আর হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মমির কথা শুনলে আমিও পাগল হয়ে যাব...'

প্রফেসর বেনজামিন উত্তেজিত। চত্বরে ইজি চেয়ারে বসে আছেন পিঠ সোজা করে। সামনে টেবিলে কফির কাপ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে খানসামা।

'হুপার,' বললেন প্রফেসর। 'সত্যি শুনেছ তো?'

'মনে তো হল, স্যার,' জবাব দিল খানসামা। 'দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরটায়।

অন্ধকার। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ···কথা বলার আওয়াজই হবে, শুনলাম!'

'তারপর?'

'আমার মনে হয়, ইঁদুর-টিঁদুর, স্যার,' প্রফেসরের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল হুপার। শূন্য কাপটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ন্যাপকিন এগিয়ে দিল।

ঠোঁট মুছলেন প্রফেসর। 'কিছু একটা হয়েছে আমার, হুপার! হঠাৎ গতরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দুরুদুরু করছিল বুকের ভেতর। কেন, কে জানে! হয়ত···হয়ত রহস্যটা আমার স্নায়ু দুর্বল করে দিয়েছে।'

'আমারও খুব অস্বস্তি লাগছে, স্যার,' বলল হুপার। 'আপনার কি মনে হয়···,' থেমে গেল কথা শেষ না করেই।

'মনে হয়? কি মনে হয়? বল?'

'ইয়ে···মানে···বলছিলাম কি, রা-অরকনকে আবার মিশরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? কায়রোর সেই জাদুঘরে? বেঁচে যেতেন···'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'মাঝপথেই হাল ছেড়ে দেয়া আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া সাহায্য আসছে।'

'গোয়েন্দার কথা বলছেন তো, স্যার? ওদেরকে বলা উচিত হবে না। পুলিশের কানে কথাটা যাওয়া কি ঠিক?'

'পুলিশের কানে যাবে না। আমার বন্ধু, ডেভিস কথা দিয়েছে। দাম আছে তার কথার···।' কলিং বেলের সুরেলা শব্দে থেমে গেলেন প্রফেসর, 'ওই যে, এসে গেছে ওরা। হুপার, জলদি যাও। নিয়ে এস ওদেরকে এখানে।'

'যাচ্ছি, স্যার,' তাড়াহুড়ো করে চলে গেল খানসামা। একটু পরেই তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

ভুরু কুঁচকে বসে আছেন প্রফেসর। সেটা লক্ষ্য করল কিশোর। বুঝলে তিনটে কিশোরকে আশা করেননি তিনি। ভারিক্কি চালে পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে কার্ডটা দিল সে।

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলেন প্রফেসর। চোখ নামালেন কার্ডের দিকে। ছাপা রয়েছেঃ

???
তিন গোয়েন্দা
প্রধানঃ কিশোর পাশা
সহকারীঃ মুসা আমান
নথিরক্ষক ও গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড

আর সবাই যা করে, সেই একই প্রশ্ন করলেন প্রফেসর বেনজামিনওঃ প্রশ্নবোধকগুলো কেন?

জানাল কিশোরঃ ওগুলো রহস্যের প্রতীকচিহ্ন।

'হুঁম্‌ম্‌!' কার্ডটা হাতে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ওল্টাচ্ছেন পালটাচ্ছেন প্রফেসর। 'ডেভিস পাঠিয়েছে তোমাদেরকে। ওর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, কাজেই তোমাদের ওপর ভরসা রাখছি আপাতত। পুলিশকে ডেকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু, অসুবিধা আছে। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। জোরজার করি যদি বেশি, একজন ডিটেকটিভ পাঠাবে। লোকের নজরে পড়বেই ব্যাপারটা; খোঁজখবর শুরু করবে ওরা। আসল খবরটা ঠিক বের করে নেবে। পাগল খেতাব দিয়ে বসবে আমাকে।'

উঠলেন প্রফেসর। 'এস, রা-অরকনকে দেখাব,' বলেই হাঁটতে শুরু করলেন বাঁ প্রান্তের দিকে।

প্রফেসরকে অনুসরণ করল কিশোর। রবিন আর মুসাও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ঠেকাল হুপার। হাতটা কাঁপছে। চেহারা ফ্যাকাসে, উত্তেজিত ভাবভঙ্গি।

অনেকখানি এগিয়ে গেছেন প্রফেসর আর কিশোর। সেদিক থেকে চোখ ফেরাল হুপার। ফিসফিস করে বলল, 'ছেলেরা, মমিটা নিয়ে কাজ শুরু করার আগে কিছু কথা জানা দরকার তোমাদের!'

'কি কথা?' ভ্রূকুটি করল মুসা।

'একটা অভিশাপ রয়েছে,' কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল হুপার। 'রা-অরকনের কবরে কিছু মাটির ফলক পাওয়া গেছে। তাতে অভিশাপ বাণী লেখাঃ যে এই কবরের গোপনীয়তা নষ্ট করবে তার ওপর নামবে রা-অরকনের অভিশাপ। অনেক বছর আগে পাওয়া গেছে মমিটা। উদ্ধার অভিযানে যারা ছিল তাদের অনেকেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। কারও কারও মৃত্যু ছিল ভয়ঙ্কর আকস্মিক। প্রফেসর বেনজামিনও জানেন ব্যাপারটা। কিন্তু বিশ্বাস করেন না, বলেন মমিটা না পেলেও ঘটত ওই মৃত্যু। বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই এর কুসংস্কার। এতদিন এড়িয়েই ছিলেন, কিন্তু মমিটা ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গণ্ডগোল। ফিসফিস করে নাকি কথা বলে ওটা! তারমানে মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গেছে প্রফেসরের। কোন্‌দিন আত্মহত্যা করে বসবেন, কে জানে! তোমরা ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে চাইছ, দেখ, বাধা দেব না। তবে খুব সাবধান!'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। হুপারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বাড়ির প্রান্তে পৌঁছে গেছে কিশোর, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'কি হল তোমাদের? এস।'

দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন আর মুসা। গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে সঙ্গে এগোল।

বিশাল জানালা দিয়ে জাদুঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। কফিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। ঢাকনা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন পাশে। বললেন, 'এই যে, রা-অরকনের মমি। ও কি বলার চেষ্টা করেছে, আশা করি জানতে পারবে তোমরা।

বলতে পারবে আমাকে।'

গভীর প্রশান্তিতে যেন কফিনের ভেতর ঘুমিয়ে রয়েছে মেহগনি রঙের মমিটা। চোখের পাতা বোজা, কিন্তু দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে মেলবে।

মমিটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল কিশোর। চোখেমুখে কৌতূহল।

রবিন আর মুসাও দেখছে, তবে কৌতূহলী বা আগ্রহী মনে হচ্ছে না তাদের। বরং শঙ্কা ফুটেছে চেহারায়। চাওয়া চাওয়ি করল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'ইয়াল্লা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'একেবারে জ্যান্ত! ড্রাকুলা জাতীয় কোন ভূত! কিশোর, এবার সত্যি সত্যি ভূতের পাল্লায় পড়ব!'

পাঁচ

গভীর মনোযোগে মমিটাকে পর্যবেক্ষণ করছে কিশোর। পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে বার বার কপালের ঘাম মুছলেন প্রফেসর।

'হুপার,' খানসামাকে দেখেই বলে উঠলেন প্রফেসর, 'সবগুলো জানালা খোল! বলেছি না, আমি বন্ধ ঘর একেবারে সইতে পারি না।'

'এই যে স্যার, দিচ্ছি,' তাড়াহুড়া করে একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল লম্বা লোকটা। খুলে দিল জানালা। এক ঝলক বাতাস এসে ঢুকল ঘরে। দেয়ালে ঝোলানো মুখোশগুলোকে নাড়িয়ে দিল। অদ্ভুত একটা খসখস আর টুংটাং আওয়াজ উঠল চারপাশ থেকে।

শব্দ শুনে মুখ তুলল কিশোর। 'প্রফেসর, ওই শব্দ শোনেননি তো? বাতাসে মুখোশ কিংবা আর কিছু নড়ানর শব্দ?'

'না না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'মানুষের কণ্ঠস্বর চিনতে পারি না ভাবছ? মমিটার কথা বলেছিল!'

'তাহলে,' বলল কিশোর, 'ধরে নিচ্ছি, আপনি সত্যিই মমিকে কথা বলতে শুনেছেন, এবং সম্ভবত প্রাচীন আরবীতে, তাই না?'

'এখানে কি আর করার আছে, স্যার আমার?' মাঝখান থেকে বলে উঠল হুপার। 'অনেক কাজ পড়ে আছে। যাব?'

সবক'টা চোখ ঘুরে গেছে খানসামার দিকে। হঠাৎই তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠতে দেখল সবাই। শঙ্কিত। প্রফেসরকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল হুপার। তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। পর মুহূর্তেই দুম্‌ম্ করে পড়ল কাঠের ভারি মূর্তিটা শেয়ালমাথা দেবতা আনুবিস। মুহূর্ত আগে প্রফেসর যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেখানে। পাশে কাত হয়ে গেল মূর্তি মুখ প্রফেসরের দিকে। তাঁকে শাসাচ্ছে যেন নীরবে।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

হুপারও উঠল। সে আরও বেশি কাঁপছে। 'আমি···আমি ওটাকে নড়ে উঠতে দেখেছিলাম, স্যার!' গলা কাঁপছে। 'ভর্তা হয়ে যেতেন এতক্ষণে।' ঢোক গিলল খানসামা। 'রা-অরকনের অভিশাপ, আর কিছু না! মমিটার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।'

'আরে দূর!' হাত দিয়ে ঝেড়ে হাতের ধুলো পরিষ্কার করছেন প্রফেসর। 'যত্তোসব কুসংস্কার! আর ওই খবরের কাগজওয়ালারা হয়েছে একেকটা গপ্পোবাজ। কিছু একটা পেলেই হল। রঙ চড়িয়ে সাতখান করে বাড়িয়ে লিখে খালি কাগজ বিক্রির ফন্দি। এমন ঘটনা আরও ঘটেছে তুতা নখামোনের মমি আবিষ্কার করার পর। অনেকেই মরল, অথচ কি সুন্দর বেঁচে গেলেন হাওয়ার্ড কার্টার। নাটের গুরু তিনি, অভিশাপে মরলে তাঁরই সবার আগে মরার কথা ছিল। তাঁর তো স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। ওসব আবোল তাবোল কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মূর্তিটা পড়েছে অন্য কোন কারণে, অভিশাপের জন্য নয়। হয়ত ঠিকমত দাঁড় করানো হয়নি। বাতাসে পড়ে গেছে।'

'স্যার, ভুলে যাচ্ছেন,' খসখসে শোনাল হুপারের কণ্ঠ। 'তিন হাজার বছর ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটা, পড়েনি। আজ হঠাৎ করে পড়তে গেল কেন? আপনি ভর্তা হয়ে মরতেন, লর্ড কার্নারভনের···'

'লর্ড কার্নারভন অসুখে মরেছিলেন,' তপ্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'মূর্তি পড়ে ভর্তা হয়নি। যাও, ভাগ এখন।'

'যাচ্ছি, স্যার,' ঘুরে দাঁড়াল হুপার।

ঝুঁকে মূর্তিটা দেখছিল কিশোর, মাথা তুলল। থামাল খানসামাকে। 'হুপার, আপনি বললেন মূর্তিটাকে নড়ে উঠতে দেখেছেন। কিভাবে কোন্‌দিকে নড়েছিল?'

'নাক বরাবর সামনের দিকে পড়তে লাগল, মাস্টার পাশা, টলে উঠেছিল প্রথমে,' জবাব দিল হুপার। 'আজ দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই কেমন গোলমাল ছিল, খেয়াল করেছি! সামান্য নাড়া লাগলেই পড়ে যাবে, এমন ভঙ্গি। যেন আগে ভাগেই প্ল্যান করে রেখেছিল, আজ প্রফেসর সাহেবের ওপর পড়বে!'

'হুপার!' তীক্ষ্ণ শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ।

'সত্যিই বলছি, স্যার। টলে উঠল আনুবিস, সামনে ঝুঁকে পড়ে গেল। সময়মত নড়তে পেরেছিলাম, তাই রক্ষে!'

'হ্যাঁ, খুব ভাল করেছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'সব বাজে কথা! অভিশাপ···'

একটা ধাতব মুখোশ খসে পড়ে তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দ তুলল। প্রায় লাফিয়ে উঠল ঘরের সবাই। চমকে ফিরে তাকাল ওরা।

'দেখলেন!···দেখলেন তো, স্যার!' আতঙ্কে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন হুপারের চোখ।

'বাতাস!' গলায় আর তেমন জোর নেই প্রফেসরের। 'বাতাসই ফেলেছে আনুবিসকে, মুখোশটাও ফেলল।'

হাঁটু গেড়ে কাঠের মূর্তিটার পাশে বসে পড়েছে কিশোর। হাত বোলাচ্ছে তলার চারকোনা জায়গাটায়—যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল মূর্তি? 'যথেষ্ট ভারি মূর্তি, স্যার,' মুখ না তুলেই বলল কিশোর। 'তলাটাও খুব মসৃণ। সহজে নড়ার কথা নয়। এই মূর্তি বাতাসে ফেলতে হলে ঝড়ো বাতাস দরকার।'

'ইয়ং ম্যান,' বিরক্তই শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ, 'আমি একজন বিজ্ঞানী। ভূতপ্রেত কিংবা অভিশাপে বিশ্বাস করি না। আমাকে সহায়তা করতেই যদি চাও, কথাটা মনে রেখে এগিয়ো।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমিও ওসব বিশ্বাস করি না, স্যার। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, পাঁচজোড়া চোখের সামনে। এবং কারণটা বোঝা যাচ্ছে না—কেন পড়ল ওগুলো।'

'দৈবক্রমে পড়ে গেছে,' বললেন প্রফেসর। 'এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানর কিছু নেই। ইয়ং ম্যান, তুমি বিশ্বাস করছ মমিটা আমার সঙ্গে কথা বলেছে! কি করে বলব, কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'পারব, স্যার।'

'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা? আবোল-তাবোল কিছু নয়?'

'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,' দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। 'মুসা, রবিন, গাড়িতে যে ব্যাগটা রয়েছে, ওটা আনতে হবে। কিছু যন্ত্রপাতি আছে ওতে। ওগুলো দরকার।'

'নিয়ে আসছি,' বলল মুসা। বেরিয়ে যেতে পারছে বলে খুশিই সে। 'রবিন, এস।'

'পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব আপনাদেরকে, আসুন,' হুপারও বেরিয়ে যাওয়ার ছুঁতো পেল।

বেরিয়ে এল তিনজনে, জাদুঘরে কিশোর আর প্রফেসরকে রেখে।

লম্বা একটা হলঘরের ভেতর দিয়ে চলেছে হুপার। অনুসরণ করছে দুই গোয়েন্দা। অন্য পাশের দরজা খুলল খানসামা। তিনজনে বেরিয়ে এল বাইরে।

গাড়ির বনেট মুছছে ড্রাইভার।

'ছেলেরা,' ফিসফিস করে বলল হুপার, 'প্রফেসর বেনজামিন বড় বেশি একরোখা। অভিশাপ রয়েছে, ওটাকে গ্রাহ্যই করতে চাইছেন না। কিন্তু তোমরা তো দেখলে, কি ঘটল! পরের বার হয়ত খুন হবেন তিনি! বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাদের কেউও হয়ে যেতে পারি! প্লীজ, ওঁকে বোঝাও, রা-অরকনকে মিশরে ফেরত পাঠিয়ে দিতে।' হলরুমে ঢুকে গেল আবার খানসামা।

রবিন আর মুসা, দু'জনেই খুব চিন্তিত।

'অভিশাপ-টাপ বিশ্বাস করে না কিশোর,' বলল মুসা। 'আমি করি, তাও বলব না। তবে একটা কথা শিওর হয়ে বলতে পারি; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া উচিত আমাদের।'

কোন জবাব দিতে পারল না রবিন। ওসব অভিশাপ-টাপে তারও বিশ্বাস নেই। কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো তো ঘটছে, এর কি ব্যাখ্যা?

পেছনে শব্দ শুনে ফিরে তাকাল ড্রাইভার। 'হয়েছে আপনাদের? না আরও দেরি আছে?'

'মাত্র শুরু করেছি, এখনও অনেক দেরি,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'যে কারবারে জড়িয়েছি!...ব্যাগটা নিতে এলাম।'

ঘুরে গাড়ির পেছন দিকে চলে এল ড্রাইভার। ট্রাঙ্ক খুলে বের করে আনল চামড়ার চ্যাপ্টা ব্যাগটা। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে, 'এই যে, নিন।'

'আছে কি এর ভেতরে?' ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল মুসা। 'যা ভারি! রবিন, কিশোর একটা চমক দেবে মনে হচ্ছে!'

'দেখ কি আবার করে বসে!' চিন্তিত দেখাচ্ছে রবিনকে। 'টায়ার পাঙ্কচারের ডিডাকশন করে তো খুব একহাত নিয়েছ, পাল্টা আঘাত হেনে না একেবারে কাত করে দেয়।'

ব্যাগটা নিয়ে আবার জাদুঘরে গিয়ে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আনুবিসকে তুলে আবার জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কিশোর আর প্রফেসর। মূর্তিটাকে আরও ইঞ্চিখানেক পেছনে ঠেলে দিল কিশোর। মাথা নাড়ল। 'না, আপনাআপনি পড়তেই পারে না। জানালা দিয়ে বাতাস যা আসছে এতে তো পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। পড়াতে হলে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস লাগবে।'

ঘন ভুরু জোড়া কাছাকাছি চলে এল প্রফেসরের। 'আধিভৌতিক কোন শক্তি কাজ করছে এর পেছনে, বলতে চাইছ।'

'জানি না! মূর্তিটা কি করে পড়ল, আপাতত বলতে পারছি না,' শান্ত কণ্ঠ কিশোরের। রবিন আর মুসার ওপর চোখ পড়তেই বলল, 'কিন্তু মমি কি করে কথা বলে, দেখাচ্ছি।'

মুসার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে খুলল কিশোর। ভেতর থেকে বের করল বড় আকারের তিনটে ট্রানজিসটর রেডিও। একটা রেডিও তুলে দিল মুসার হাতে। ব্যাগ থেকে একটা চামড়ার বেল্ট বের করে পরিয়ে দিল মুসার কোমরে। তামার অসংখ্য সরু সরু তার কায়দা করে লম্বালম্বি আটকানো রয়েছে বেল্টে। রেডিও থেকে বের করে রাখা দুটো তারের মাথা প্লাগ দিয়ে আটকে দিল বেল্টের তারের সঙ্গে। 'জানালা দিয়ে চত্বরে নাম, তারপর বাগানে চলে যাও,' সহকারীকে নির্দেশ দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কানের কাছে রেডিওটা তুলে ধরে রাখবে, যেন কিছু শোনার

চেষ্টা করছ। পাশে, এই যে এই বোতামটা টিপে রাখবে। ঠোঁট যতটা সম্ভব না নেড়ে কথা বলবে। শোনার দরকার হলে বোতামটা টিপে অন করে দেবে, ব্যস তাহলেই হবে।'

'কি এটা?' জানতে চাইল মুসা।

'ওয়াকি-টকি। বেল্টটা অ্যান্টেনা। সিটিজেন ব্যাণ্ডে খবর পাঠানো এবং ধরার রেঞ্জ আধ মাইল। আমাদের নিজেদের মাঝে যোগাযোগ রাখার একটা ব্যবস্থা। গত হপ্তায় আর্মির ফেলে দেয়া বাতিল কিছু জিনিস কিনে এনেছিল চাচা। তার ভেতর ছিল এরকম পাঁচটা জিনিস। তিনটে সারিয়ে নিয়েছি আমি।'

'আমি বাগানে যাচ্ছি,' বলল মুসা। 'কি কথা বলব?'

'যা খুশি। জানালা গলে চত্বরে নাম, তারপর বাগান।'

'ঠিক হ্যায়,' পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ঝট করে চোখ তুলে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে। রক্ত জমেছে মুখে। 'তাহলে এই তোমার মাইণ্ড রিডিং?'

'ওসব নিয়ে পরে আলাপ করব,' হাসছে কিশোর। 'এখন প্রফেসরকে ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। কথা শুরু কর,' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে বড় একটা জানালার কাছে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল নিচে। 'দেয়ালের ধার ধরে চলে যাও। ওই যে, গেটপোস্টের ওপরে বড় পাথরের বলটা বসানো রয়েছে ওদিকে।'

'যাচ্ছি!' জানালা পেরিয়ে চত্বরে নামল মুসা। কানের কাছে তুলে রেখেছে রেডিও।

'প্রফেসর,' বলল কিশোর, 'মমিটা ছুঁলে কোন অসুবিধা হবে?'

'না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'তবে বেশি নড়াচড়া কোরো না।'

মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতে একটা ওয়াকি-টকি, অন্যটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাতেরটা মুখের কাছে এনে বলল, 'হ্যাঁ, এবার কথা শুরু কর, মুসা। প্রফেসর, শুনবেন। রবিন, তুমিও শোন।'

সবাই কান খাড়া রাখল। নীরবতা। তারপর একটা মৃদু বিড়বিড় শোনা গেল।

'মমির ওপর ঝুঁকে দাঁড়ান,' প্রফেসরকে বলল কিশোর। কানের কাছে ধরা রয়েছে তার ওয়াকি-টকি।

ভ্রূকুটি করলেন প্রফেসর। ঝুঁকলেন মমির ওপর। রবিনও ঝুঁকল। ফিসফিসে কথা শোনা যাচ্ছে কফিনের ভেতর থেকে। দু'জনের কারোই বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটা মুসার কণ্ঠস্বর।

'গেট পেরিয়ে এসেছি,' বলল মুসা। 'ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছি বড় ঝোপটার কাছে।'

'যেতে থাক,' বলল কিশোর। ঘরের অন্য দু'জনের দিকে ফিরল। 'দেখলেন তো, প্রফেসর, মমিকে কথা বলানো কত সহজ?'

মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। আলগা লিনেনের নিচ থেকে বের করে আনল তৃতীয় ওয়াকি-টকিটা। ওটা থেকেই আসছে মুসার কণ্ঠস্বর। যেন মমিই কথা বলছে।

'বৈজ্ঞানিক সমাধান, স্যার,' প্রফেসরকে বলল কিশোর। 'মমির লিনেনে ছোট একটা রেডিও রিসিভার লুকিয়ে রাখা যায় সহজেই। বাইরে থেকে কেউ...' থেমে গেল সে।

'আরে!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মুসার কণ্ঠ। 'ঝোপের ভেতর কে জানি লুকিয়ে আছে!...একটা ছেলে! ও জানে না, আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। ধরবে ওকে।'

'দাঁড়াও!' বলে উঠল কিশোর। 'আমরা আসছি। একা যেয়ো না।'

'তোমরা বেরোলেই হয়ত দেখে ফেলবে,' শোনা গেল মুসার কণ্ঠ। 'আমিই যাচ্ছি। ওর পথ আটকে জানাব তোমাদের। সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে।'

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। 'ওকে ধরেই চেঁচিয়ে উঠবে। ছুটে আসব আমরা।' প্রফেসরের দিকে ফিরল সে। 'ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে একজন। ওকে ধরতে পারলে হয়ত রহস্যটার সমাধান হয়ে যাবে।'

নীরবতা।

'এতক্ষণ কি করছে ও!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রবিন। 'কিছুই বলছে না মুসা! দেখাও যাচ্ছে না এখান থেকে!'

আবার নীরবতা। অপেক্ষা করছে ওরা।

পা টিপে টিপে এগোচ্ছে মুসা। কানের কাছেই ধরা রয়েছে রেডিও। ঝোপের মধ্যে পেছন ফিরে বসে বাড়ির সামনের দিকে নজর রাখছে লোকটা। ঝোঁপের একেবারে কাছে চলে এল মুসা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল ঝোপের ভেতরে। ঝোপঝাড় ভেঙে ছেলেটাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে। উপুড় হয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়েছে ছেলেটা। তার ওপর মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি এস! ওকে ধরেছি!'

কথা বলে উঠল ছেলেটা। বিদেশী ভাষা। এক বর্ণ বুঝল না মুসা। ধস্তাধস্তি করছে ছেলেটা। তাকে জোর করে চেপে ধরে রেখেছে। হঠাৎ ছেলেটার হাতের আঘাতে মুসার হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল রেডিও। ওটা তোলার চেষ্টা না করে দু'হাতে ছেলেটাকে জাপটে ধরল মুসা। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল দু'জনে।

প্রায় মুসারই সমবয়েসী হবে ছেলেটা। লম্বা-চওড়ায় কিছুটা কম, তবে গায়ের জোর কম না। কায়দা-কৌশলও জানে মোটামুটি। বান মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে মুসার আলিঙ্গন থেকে। একবার ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু খাড়া হওয়ার আগেই আবার তাকে ধরে ফেলল মুসা। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরের দেয়ালে ঠেকে গেল দু'জনে। আবার কথা বলে উঠল ছেলেটা।

কিছুই বুঝল না মুসা। বোঝার চেষ্টাও করল না। তার একমাত্র চিন্তা, ছেলেটাকে আটকে রাখতে হবে রবিন আর কিশোর না পৌছানো পর্যন্ত।

ওয়াকি-টকিতে মুসার চিৎকার শুনেই দরজার দিকে দৌড় দিল রবিন। তার পেছনে কিশোর ও প্রফেসর বেনজামিন।

সদর দরজায় বেরিয়েই দেখতে পেল, তাদের আগে ছুটছে আরেকজন লোক। নীল ওভারঅল পরা। ছুটতে ছুটতেই বেলচাটা ফেলে দিয়েছে হাত থেকে।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

প্রফেসর বললেন, 'মালী।'

ঢাল বেয়ে নামতে নামতে দেখল ওরা, ছেলে দুটোর কাছে পৌছে গেছে মালী। মুসাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য ছেলেটার গলা চেপে ধরল। টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, গলা ছাড়ল না।

উঠে দাঁড়াল মুসা। হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। মালীর দিকে চেয়ে বলল, 'শক্ত করে ধরুন। ওটা একটা বনবেড়াল!'

দুর্বোধ্য ভাষায় আবার কিছু বলে উঠল ছেলেটা। গলায় মালীর হাত, গোঁ গোঁ করে এক ধরনের চাপা শব্দ বেরোল কথার সঙ্গে।

বিদেশী ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল মালী, ছেলেটার কথার জবাব দিচ্ছে বোধহয়। মাঝপথেই আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটল ছেলেটা। ঢাল বেয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল আরেকটা ঝোপে। আর ধরা যাবে না ওকে। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েই রয়েছে মুসা।

ঠিক এই সময় পৌছে গেল রবিন, কিশোর আর প্রফেসর।

'কি হল?' মালীর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'তোমার হাত থেকে ছুটল কি করে ছেলেটা?'

'প্রফেসরের দিকে ফিরল মালী, 'হাতে কামড়ে দিয়েছে, স্যার!' ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল সে। কব্জির নিচে চামড়ায় দাঁতের দাগ, রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

'এত বড় দেহটা রেখেছ কেন!...একটা বাচ্চা ছেলেকে...'

'ও কামড়ে দেবে, বুঝতে পারিনি, স্যার।'

'হুঁ! যাও, জলদি ওষুধ লাগাও। দাঁতে বিষাক্ত কিছু থাকতে পারে। ইনফেকশন হলে বুঝবে ঠেলা। জলদি যাও।'

ঘুরে দাঁড়াল মালী। মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

'লোকটা রিগো কোম্পানিতে কাজ করে,' কিশোরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বললেন প্রফেসর। 'বাগানের কাজের চুক্তি নেয় কোম্পানিটা। খুব ভাল ভাল মালী আছে ওদের। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অনেকেই নিয়মিত ডাকে।'

এখনও হাঁফাচ্ছে মুসা। 'হায়-হায়রে! খামোকাই কষ্ট করলাম! ব্যাটা ছেড়ে

দেবে জানলে আমিই ধরে রাখতাম!'

'কিন্তু ছেলেটা কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কি করেছিল এখানে?'

'ঝোপে বসে প্রফেসরের বাড়ির দিকে চোখ রাখছিল,' বলল মুসা। 'নড়েচড়ে উঠেছিল, তাই দেখে ফেলেছিলাম।'

'অনেক কিছু জানাতে পারত সে আমাদেরকে!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'ছেলেরা,' বললেন প্রফেসর। 'ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে...'

তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল তাঁর দিকে।

'...তবে, মুসার চিৎকারের পর পরই কয়েকটা শব্দ কানে এসেছে। বোধহয় ছেলেটাই বলেছে।'

'কিছুই বুঝিনি,' বলল মুসা। 'বিদেশী ভাষা।'

'আধুনিক, আরবী,' বললেন প্রফেসর। 'কি বলেছে জান? বলেছেঃ হে মহান রা-অরকন দয়া করে সাহায্য করুন আমাকে!'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিশোর, থেমে গেল মুসার চিৎকারে, 'হুঁশিয়ার!' হাত তুলে নির্দেশ করছে একটা দিক।

নিমেষে সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল সেদিকে।

বড় গেটটার দু'পাশে দুটো মোটা থাম, মাথায় বসানো দুটো গ্র্যানাইটের বিশাল বল। কি করে জানি খসে পড়ে গেছে একটা। বিপজ্জনক গতিতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে ওদের দিকে। গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে।

ছয়

ছুট লাগানর জন্যে তৈরি হয়েছে রবিন আর মুসা। থেমে গেল প্রফেসরের তীক্ষ্ণ চিৎকারে। 'খবরদার! এক চুল নড়বে না কেউ।'

প্রফেসর বেনজামিনের প্রতি কিশোরের শ্রদ্ধা বাড়ল। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর, কড়া নজর। তার আগেই প্রফেসর অবস্থাটা মনে মনে জরিপ করে নিয়েছেন। বলটা ওদের গায়ে পড়বে না, চলে যাবে পাশ দিয়ে।

লাফিয়ে গড়িয়ে ওদের দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল বলটা। নিচের কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল প্রচণ্ড শব্দে।

'সেরেছিল।' কপালের ঘাম মুছল রবিন। 'ওদিকেই রওনা হয়েছিলাম আমি, ভর্তা হয়ে যেতাম!'

'আমি হতাম না,' বলল মুসা। 'উল্টো দিকে লক্ষ্য ছিল আমার। ওজন কত হবে? এক টন?'

'বেশি হবে,' বললেন প্রফেসর। 'গ্র্যানাইটের বল, এক ঘন-ফুটে ওজন হবে···দাঁড়াও, অঙ্ক কষে···'

'প্রফেসর!'

কথা থামিয়ে ফিরলেন প্রফেসর। অন্য তিনজনও তাকাল। হুপার ছুটে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াল হুপার। হাঁপাচ্ছে। 'রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছি! কোন ক্ষতি হয়নি তো আপনাদের?'

'না, কোন ক্ষতি হয়নি,' অস্থির কণ্ঠস্বর। হুপারের দিকে চেয়ে ঘন ভুরুজোড়া কোঁচকালেন প্রফেসর। 'কি বলবে, জানি। শুনতে চাই না ওসব আর!'

'মাফ করবেন স্যার,' তবু বলল হুপার, 'এটা রা-অরকনের অভিশাপ ছাড়া আর কিচ্ছু না! একের পর এক দুর্ঘটনা···রা-অরকন আপনাকে খুন করবে, স্যার! হয়ত আমাদের সবাইকেই করবে!'

'রা-অরকনের অভিশাপ!' বিড়বিড় করল কিশোর। প্রফেসরের দিকে ফিরল, 'প্রফেসর, মমিটা যে কবরে পেয়েছেন, ওখানে কি কোন কিছুতে অভিশাপের কথা লেখা ছিল?'

'না, মানে···ইয়ে···হ্যাঁ···'

প্রফেসরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল হুপার, 'ছিল! লেখা ছিলঃ যে এই কবরের পবিত্রতা আর শান্তি বিনষ্ট করবে, তার ওপর নেমে আসবে রা-অরকনের অভিশাপ! কবর খোঁড়ার কাজে যারা সহায়তা করেছিল, তাদের অনেকেই মরেছে। সাতজন···'

'হুপার!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর। 'খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছ!'

'মাফ করবেন, স্যার, দুঃখিত,' চুপ হয়ে গেল খানসামা।

লজ্জিত হলেন প্রফেসর। কিশোরের দিকে চেয়ে বললেন, 'একেবারে মিথ্যে বলেনি হুপার। রা-অরকনকে ঘিরে সত্যিই কিছু রহস্য গড়ে উঠেছে। একটা পাথরের পাহাড়ের চূড়ার কাছে ছিল ওর কবর। কবরটা লুকানো ছিল ভালমত। রাজকীয় কবর, অথচ মূল্যবান কিচ্ছু পাওয়া যায়নি সমাধিকক্ষে। শুধু সাধারণ একটা কফিনে রা-অরকন আর তার আদরের পোষা বেড়ালটার মমি। তবে, ও রা-অরকন কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু কফিনের গায়ে ছাড়া কবরটার আর কোথাও তার নাম লেখা নেই, ফারাওদের কোন চিহ্ন নেই। যদি সে রা-অরকন হয়ে থাকে, তাহলে বিশেষ কোন কারণে ওরকম সাধারণ ভাবে কবর দেয়া হয়েছিল তাকে। সমাধিকক্ষটা দেখে যা মনে হয়েছে, প্রাচীন দস্যু-তস্করেরা ঢুকতে পারেনি ওখানে। আর যদি ঢুকে থাকেও, তাহলে নিশ্চয়ই খুব হতাশ হতে হয়েছিল তাদেরকে। কিচ্ছু পায়নি।'

'অভিশাপের কথা কোথায় লেখা ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কয়েকটা মাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে, তাতে। মমিটা কবর থেকে বের করে আনার পরের দিনই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে আমার প্রধান সহকারী। তার পরের দিন কায়রোর বাজারে খুন হল আমার সেক্রেটারি। একই জায়গায় প্রায় একই সময় খুন হল আরও একজন। সে-ও আমার সহকারী ছিল, বন্ধুও। জিম উইলসনের বাবা যে শ্রমিকেরা খুঁড়েছিল, তাদের ওভারশিয়ার। মারা গেল সাপের কামড়ে। সব ক'টাই দুর্ঘটনা! এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। মোটর দুর্ঘটনা, খুনখারাপি, কিংবা সাপের কামড় নুতন কোন ঘটনা নয়।'

চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক বলেই মনে হচ্ছে ওদের।

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, অভিশাপের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই,' বললেন প্রফেসর। 'যেদিন মমিটা আমার বাড়িতে এসে পৌঁছুল সেদিনই একজন লোক এসেছিল দেখা করতে। অ্যারাবিয়ান। নাম, জলি···কি যেন! মমিটা দিয়ে দিতে বলল। বেশ চাপাচাপি করল আমাকে। লিবিয়ার এক ধনী ব্যবসায়ী পাঠিয়েছে তাকে। জলিল ওই লোকটার ম্যানেজার। রা-অরকন নাকি ওই ব্যবসায়ী জামানের পূর্ব-পুরুষ। সেটা জেনেছে আবার এক জাদুকরের কাছে। যত্তোসব ভোগলামি! প্রথমে ভদ্রভাবে বললাম, গেল না জলিল। শেষে ব্যবহার খারাপ করতে বাধ্য হয়েছি। যাওয়ার আগে জলিল হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে, রা-অরকনের প্রেতাত্মা নাকি ছাড়বে না আমাকে। মমিটাকে মিশরে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় আবার কবর না দিলে অভিশাপ নামবে আরও অনেকের ওপর।'

আবার চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক বলে মেনে নিতে আর কোন দ্বিধা নেই ওদের।

তবে দু'জনের মনে হল, গভীর রহস্যের সন্ধান পাওয়ায় খুশি খুশি লাগছে যেন কিশোরকে।

'এখন,' বললেন প্রফেসর। 'ওসব ফালতু চিন্তা বাদ দিয়ে এস দেখি, কেন খসে পড়ল বলটা। কারণটা জানার চেষ্টা করি।'

গেটের দিকে এগোলেন প্রফেসর। পেছনে তিন গোয়েন্দা, সবার পেছনে হুপার।

থামের মাথায় সুড়কি দিয়ে একটা খাঁজ বানানো হয়েছিল, তার ওপর বসান ছিল বলটা। আটকে দেয়া হয়েছিল সিমেন্ট দিয়ে। দীর্ঘদিন রোদ বাতাস আর বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গিয়েছে সিমেন্ট। খাঁজের একটা দিক ভাঙা, ফলে বলটা পড়ে গেছে।

'কোন রহস্য নেই,' বললেন প্রফেসর। 'সিমেন্ট আর সুড়কি ক্ষয় হয়ে গেছে, ওই দেখ রিং ভাঙা। চাল্লের দিকে সামান্য কাত হয়ে আছে থাম। হয়ত, অতি মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, এতই মৃদু আমরা টের পাইনি। এটা নতুন কিছু না এ অঞ্চলে। মাঝেমধ্যেই এরকম ঘটে।'

প্রফেসরের যুক্তি মনঃপূত হল না হুপারের। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সেখান থেকে চলে গেল সে।

প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে চত্বরে এসে উঠল আবার তিন গোয়েন্দা। জাদুঘরে ঢুকল। ঘিরে দাঁড়াল রা-অরকনের মমিকে।

'বুদ্ধি আছে তোমার,' কিশোরের প্রশংসা করলেন প্রফেসর। 'মরা মমি কি করে কথা বলে, একটা যুক্তি দেখাতে পেরেছ। তবে ভুল যুক্তি। কারণ, কফিনের কোথাও কোন রেডিও লুকানো নেই।'

'ভালমত দেখেছিলেন তো, স্যার?'

চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। 'নিশ্চয়। বেশ, তোমাদের সামনেই আবার দেখছি।' মমিটা কফিন থেকে বের করে নিলেন তিনি। কিশোরকে খুঁজে দেখতে বললেন।

'না, নেই রেডিও।'

এবার সত্যিই বিস্মিত হল কিশোর। 'নাহ্, নেই! ইলেকট্রনিক কোন কিছুই নেই। প্রফেসর, আমার প্রথম যুক্তি ভুল হল।'

'প্রথম যুক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল হয়,' কিশোরকে উৎসাহ দিলেন প্রফেসর। 'তবে পরের যুক্তিটা হয়ত ঠিক হবে। ভেবে বের করে ফেল আরেকটা কিছু।'

'আপাতত পারছি না, স্যার। আচ্ছা, বললেন, শুধু যখন আপনি একা থাকেন এঘরে, তখনই মমিটা কথা বলে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালেন প্রফেসর। 'আর বলে বিশেষ একটা সময়ে। শেষ বিকেল কিংবা সন্ধ্যায়।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'এ-বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে থাকে?'

'হুপার। দশ বছর ধরে আমার চাকরি করছে সে। তার আগে থিয়েটারে কাজ করত, অভিনেতা। সে আমার শোফার, বাবুর্চি, খানসামা। হপ্তায় তিন দিন একজন মহিলা আসে ঘরদোর পরিষ্কার করতে, তবে ও থাকে না এখানে।'

'মালীর ব্যাপারটা কি? নতুন?'

'তা জানি না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'আট বছর ধরে রিগো কোম্পানির লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছি। একেকবার একেকজন লোক আসে। সবার চেহারা মনে রাখা সম্ভব না। তবে বাগান পর্যন্তই ওদের সীমানা। কখনও বাড়ির ভেতরে ঢোকে না।'

'হুঁমম্!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভুরু কুঁচকে গেছে। 'যা-ই হোক, মমিটার কথা-বলা নিজের কানে শুনতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু ও তো শুধু আমার সঙ্গে কথা বলে। হুপার কিংবা জিমের সঙ্গে বলেনি।

তোমার সঙ্গে বলবে বলেও মনে হয় না।'

'হ্যাঁ,' প্রফেসরের সঙ্গে একমত হল রবিন। 'তোমার সঙ্গে কেন কথা বলতে যাবে মমিটা? তুমি তো ওর কাছে অপরিচিত।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা। 'কথাবার্তা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার। এমন ভাবে বলা হচ্ছে, যেন মমিটা সব কথা শুনতে পাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে। ও যেন আমাদের মতই জ্যান্ত!'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিলেন প্রফেসর। 'এসব আলোচনার কোন মানে নেই। বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না।'

কারও কথায়ই কান দিল না কিশোর। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'আমার বিশ্বাস, মমিটা আমার সঙ্গে কথা বলবে। একবার কথা বললেই আরও কিছু তথ্য জোগাড় করে ফেলতে পারব আমি। প্রফেসর, বিকেলে আবার আসব আমরা। পরীক্ষা চালাব।'

'ইয়াল্লা, কিশোর কোথায়?' হেডকোয়ার্টারের দেয়ালে লাগানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। 'আমাদেরকে ছ'টায় আসতে বলে সে নিজেই গায়েব। সোয়া ছ'টার বেশি বাজে।'

'মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করে এস,' সকালের ঘটনার রিপোর্ট লিখছে রবিন। 'তিনি হয়ত কিছু বলতে পারবেন।'

'এসেই জিজ্ঞেস করছি,' বলল মুসা। 'তিনি কিছু জানেন না। বলে যায়নি কিশোর। দেখি এসেছে কিনা ও।' উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখল। হাতল ধরে ঘোরাল এদিক ওদিক। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'ওই যে, এসে গেছে। শহরের দিক থেকে আসছে। ট্যাক্সিতে করে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে। হয়ত ওয়াকি-টকিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।'

দ্রুত ডেস্কের কাছে চলে এল মুসা। এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা লাউড-স্পীকার, বাক্সে ভরে। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ওটার। মুসা কিংবা রবিন জানত না, গত হপ্তায় ওটার ওপর আরেক দফা কারিগরী চালিয়েছে কিশোর। বাক্সের মধ্যে একটা রেডিও সেট বসিয়ে যোগ করে দিয়েছে মাইক্রোফোন আর স্পীকারের সঙ্গে। সুইচ অন করা থাকলে হেডকোয়ার্টারের ভেতরের সব আওয়াজ ট্রান্সমিট করে ওটা। প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে এসে কথাটা দুই বন্ধুকে জানিয়েছে কিশোর।

বাক্সটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল মুসা। 'এহ্, মাইণ্ড রিডিং! সকালে কি ফাঁকিটাই না দিয়েছে আমাদের! আমরা কি বলছি সব শুনেছে!' বিড়বিড় করতে করতে বাক্সের সামনে মুখ নিয়ে এল সে। একটা সুইচ অন করল। 'হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি। সেকেণ্ড কলিং ফার্স্ট। সেকেণ্ড কলিং ফার্স্ট।' সুইচটা অফ করে টিপে

আরেকটা সুইচ অন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল স্পীকারে। তারপরই পরিষ্কার ভেসে এল কিশোরের গলা। 'ফার্স্ট বলছি। শিগগিরই আসছি। "সর্ব দর্শন" তুলে দিয়েছ কেন? নামাও। দরকারের সময় ছাড়া একদম তুলবে না ওটা। গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'শুনেছি, এবং বুঝতে পেরেছি,' স্পীকারের সুইচ অফ করে দিল মুসা।

পেরিস্কোপ নামাতে এগিয়ে গেছে রবিন। 'বাজ পাখির চোখ! কিচ্ছু এড়ায় না।' নামানর আগে একবার চোখ রাখল পেরিস্কোপের আয়নায়। 'গেটের কাছে থেমেছে ট্যাক্সি। কিশোর বেরিয়ে এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। হাঁটতে শুরু করেছে। ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছে।' পেরিস্কোপ নামিয়ে আগের চেয়ারে এসে বসল রবিন। 'গিয়েছিল কোথায়!'

নীরব রইল মুসা। জবাবটা সে নিজেও জানে না।

এক মিনিট পেরোল…দুই…তিন…চার…পাঁচ।…দশ মিনিট পেরোল…পনেরো…

'আসছে না কেন এখনও!' বলল রবিন। 'এতক্ষণে তো এসে পড়ার…' ট্রেলারের মেঝেতে ট্র্যাপডোরে শব্দ শুনে থেমে গেল।

খুলে গেল বোর্ডটা। একটা মাথা দেখা দিল সুড়ঙ্গের মুখে। একজন বৃদ্ধ মানুষ। কাঁচাপাকা ঘন ভুরু। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মুখে দাড়ি।

'প্রফেসর বেনজামিন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আপনি এখানে এলেন কি করে? কিশোর কোথায়?'

'রা-অরকনের অভিশাপ নেমেছে তার ওপর,' খুদে অফিস ঘরটায় উঠে এলেন প্রফেসর। 'রা-অরকন সব উল্টে দিয়েছে। প্রফেসরকে কিশোর আর কিশোরকে প্রফেসর বেনজামিন বানিয়েছে।' টেনে মাথার সাদা উইগ খুলে ফেলল কিশোর। চশমা খুলে দরাজ হাসি হাসল দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে। 'তোমাদেরকে যখন বোকা বানাতে পেরেছি, মমিটাকে নিশ্চয়ই পারব।'

হাঁ করে আছে রবিন। চোখ বড় বড়।

'খাইছে, কিশোর!' মুসার চোখও কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন। 'দারুণ হয়েছে ছদ্মবেশ। আমরাই গাধা বনে গেছি। মমিটাকে বোকা বানানর কথা কি যেন বলছিলে?'

'পরীক্ষা নেব,' কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে উইগ আর চশমাটা ভরে ফেলল কিশোর। দাড়িটা টেনে খুলে নিয়ে ভরল। কপালে, চোখের পাতায় বিশেষ রঙিন পেন্সিলে কয়েকটা দাগ টানা হয়েছে। মাত্র কয়েকটা দাগেই অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে। 'মি. ক্রিস্টোফারের কাছে গিয়েছিলাম। একজন মেকআপ ম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছদ্মবেশের এই উপকরণ সেই মেকআপ ম্যানই দিয়েছে। কি করে ছদ্মবেশ নিতে হবে, শিখিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মমিটাকে বোকা বানাতে,' বলল কিশোর।

'সে তো বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কেন বানাবে, সেটাই জানতে চাইছি!'

'আমাকে প্রফেসর বেনজামিন বলে ভুল করলে, কথা বলবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তাই ছদ্মবেশ নিতেই হচ্ছে। আর কারও সঙ্গে তো কথা বলে না ওটা।'

'আল্লাই জানে কি বলছ! এমন ভাবে বলছ, যেন মমিটা দেখতে পায়, শুনতে পায়, চিন্তা করতে পারে! কিশোর, ওটা একটা মমি। তিন হাজার বছর আগে মারা যাওয়া একটা মানুষের শুকনো লাশ। ওটা কথা বলে! এবার সত্যিই বুঝি ভূতের পাল্লায় পড়লাম! কিশোর, এখনও সময় আছে। ভাল চাও তো, ভুলে যাও ওটার কথা। চল, বেড়ালটার ব্যাপারে তদন্ত করি আমরা। মমি রহস্যের সমাধান করতে পারব না। খামোকা বেঘোরে প্রাণটা হারাব।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। ঢোক গিলল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'তার মানে,' মুসার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে কিশোর, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না? মমিটার কথা বলা শুনতে চাও না?'

দ্বিধা করছে মুসা। উত্তেজিত হয়ে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছে, অনুশোচনা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আস্তে মাথা নাড়ল সে। 'তাই বলতে চাইছি। কিশোর, এবার হয়ত জাদুঘরের ছাদটাই ভেঙে পড়বে আমাদের মাথায়! সকালে বড় বেশি নাছোড়বান্দা মনে হয়েছে রা-অরকনকে।'

'বেশ,' বলল কিশোর, 'আমরা মানুষ তিনজন। একই সঙ্গে একটা কাজ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। তুমি প্রফেসরের ওখানে যেতে না চাইলে জোর করব না। মিসেস ভেরা চ্যানেলের ওখানেই যাও। বেড়ালটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে এস। আমি আর রবিন যাচ্ছি প্রফেসরের ওখানে। কি বল, রবিন?'

রবিনও ভয় পাচ্ছে যেতে। তবে প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে হার মানল ভয়। মাথা কাত করল সে, যাবে।

'বেশ,' মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ইয়ার্ডের পিকআপটায় করে যাও। দেখলাম, বসে আছে বোরিস। তেমন কাজকর্ম নেই। বললে তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যেতে পারে ও।'

দ্বিধা যাচ্ছে না মুসার। অবশেষে মনস্থির করে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে তাই যাব।' সুড়ঙ্গমুখের দিকে এগিয়ে গেল।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। অফিসে তালা লাগাচ্ছে বোরিস। মুসাকে দেখে হাসল।

এক কথায় রাজি হয়ে গেল বোরিস। মুসাকে নিয়ে যাবে সান্তা মনিকায়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মুসা, কিশোরকে দেখিয়ে দেবে এবার, গোয়েন্দাগিরিতে সে-ও কম যায় না। বেড়ালটা খুঁজে বের করবেই সে। কিন্তু খচখচও করছে মনের ভেতর, দুই বন্ধুর জন্যে। রা-অরকনের অভিশাপ যদি সত্যিই নেমে আসে কিশোর আর রবিনের ওপর?

সাত

জাদুঘরে একা ঢুকল কিশোর। মাথার ওপরের আলোটা জ্বেলে দিল। বাইরে এখনও দিন। সূর্য অস্ত যায়নি, তবে খাড়া পাহাড়গুলোর আড়ালে চলে গেছে। ফলে অন্ধকার নেমে এসেছে গিরিখাতে। গাঢ় ছায়া গিলে নিয়েছে যেন বিশাল পুরানো বাড়িটাকে।

বুড়ো মানুষের মত ধীরে সুস্থে নড়াচড়া করছে কিশোর, অবিকল প্রফেসর বেনজামিনের নকল। বড় জানালাগুলো খুলে দিল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল কফিনটার সামনে। ঢাকনা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখল একপাশে। একনজর দেখল মমিটাকে। ঝুঁকল ওটার ওপর। জোরে জোরে বলল, 'রা-অরকন, কথা বলুন। আমি শুনছি।'

ভাল অভিনেতা কিশোর। গলার স্বরও পুরোপুরি নকল করেছে। প্রফেসরের কোট আর টাই পরেছে। শার্টের তলায় আলগা কাপড় তোয়ালে দিয়ে বেঁধে ভুঁড়ি তৈরি করেছে। খুব কাছে থেকে কেউ না দেখলে বুঝতেই পারবে না ব্যাপারটা। চোখ বন্ধ রেখে রা-অরকনের মমি নিশ্চয় ধরতে পারবে না এই ফাঁকি, আশা করছে কিশোর।

রবিন আর প্রফেসর বেনজামিন অপেক্ষা করছেন পাশের ঘরে। হুপার রান্নাঘরে ব্যস্ত। কি ঘটছে না ঘটছে, কিছুই জানে না। নীরব রয়েছে মমি।

'মহান রা-অরকন,' আবার বলল কিশোর, 'কথা বলুন। আমি বোঝার চেষ্টা করব।'

কি যেন শোনা গেল? মাথা কাত করে মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল কিশোর। অদ্ভুত খসখসে কণ্ঠস্বর। হিসহিস আর ফিসফিসানিতে ভরা। আরও কিছু অদ্ভুত শব্দ মিশেছে। শব্দগুলো বোঝাই মুশকিল।

অবাক হয়ে পুরো ঘরে চোখ বোলাল কিশোর। একা রয়েছে সে। দরজা বন্ধ।

ফিসফিস করে বলেই চলেছে রা-অরকন। কান পেতে আছে কিশোর। কেমন এক ধরনের আদেশের সুর রয়েছে বলার ভঙ্গিতে। কিন্তু একটা শব্দও বুঝতে পারছে না সে।

কোটের নিচে কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকানো রয়েছে একটা পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার। খুলে নিয়ে ওটা মমির ঠোঁটের কাছাকাছি রাখল কিশোর। রেকর্ডিং

সুইচ টিপে দিয়েছে।

'রা-অরকন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না,' জোরে বলল কিশোর। 'আরেকটু জোরে বলুন।'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কথা, আবার শুরু হল। অনর্গল উচ্চারিত হচ্ছে কিছু দুর্বোধ্য শব্দ, নানারকম আওয়াজের মাঝে বোঝা-ই কঠিন। টেপ-রেকর্ডারের মাইক্রোফোন কথা ধরতে পারবে তো?—সন্দেহ হচ্ছে কিশোরের।

মিনিটখানেক ধরে একটানা কথা বলে যাচ্ছে রা-অরকন। ভাল করে শোনার জন্যে কান মমির ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল কিশোর। ক্ষণিকের জন্যে থামল কথা। সোজা হতে গেল সে। পুরানো কফিনের বেরিয়ে থাকা সূচালো একটা কাঠের ফলায় আটকে গেল দাড়ি। হ্যাঁচকা টানে খুলে গেল গাল থেকে। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাবা দিয়ে ধরতে গেল দাড়ি। ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। নাকের ওপর থেকে খসে পড়ে গেল চশমা, উইগ খুলে চলে এল চোখের ওপর। নিজের অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

অন্ধের মত উঠে দাঁড়াল কিশোর। চুল দাড়ি আবার জায়গামত লাগানর চেষ্টা চালাচ্ছে দ্রুত হাতে।

এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল রবিন আর প্রফেসর।

'কিশোর, কি হয়েছে?' রবিন উদ্বিগ্ন।

'তোমার চিৎকার শুনলাম!' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'কিছু হয়েছে?'

'আমার অসাবধানতা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বোধহয় সব ভজঘট করে দিয়েছি! মমি কথা বলছিল...'

'বোকা বানিয়েছ তাহলে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'জানি না কি করেছি! কথা তো বলেছিল! দেখি, আবার বলে কিনা!' আবার মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। 'রা-অরকন, বলুন। রা-অরকন?' অপেক্ষা করছে তিনজনে। মমি নীরব। নিজেদের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও নিস্তব্ধ ঘরে।

'লাভ নেই,' অবশেষে বলল কিশোর। 'আর এখন কথা বলবে না মমি। দেখি, টেপে রেকর্ড হয়েছে কিনা।'

যন্ত্রটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল গোয়েন্দাপ্রধান। পেছনে এগোল রবিন আর প্রফেসর। পাশের ঘরে চলে এল।

টেপ রেকর্ডারটা টেবিলে রাখল কিশোর। গা থেকে কোট খুলে ফেলল। খুলল পেটে বাঁধা কাপড়। তারপর টেপ রিউইণ্ড করে নিয়ে প্লে লেখা বোতাম টিপে দিল।

কয়েক মুহূর্ত শুধু স্পীকারের মৃদু হিসহিস শব্দ। তারপরেই শোনা গেল কথা। খুবই মৃদু। বোঝাই যায় না প্রায়। ভলিউম বাড়িয়ে দিলে স্পীকারের শব্দও বেড়ে

যায়। আরও বোঝা যায় না কথা।

শেষ হল মমির কথা। কিশোরের চিৎকারটা শোনা যেতেই সুইচ অফ করে দিল সে। প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'কিছু বুঝতে পেরেছেন, স্যার?'

নীরবে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'একআধটা শব্দ পরিচিত মনে হচ্ছে, তবে মানে বুঝতে পারছি না। মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা, সন্দেহ নেই, খুবই প্রাচীন। সারা ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন লোকই আছে, যে হয়ত এর মানে উদ্ধার করতে পারবে। সে প্রফেসর জিম উইলসন, আমার সহকারীর ছেলে।' হাত তুলে জানালা দিয়ে প্রফেসর উইলসনের বাড়িটা দেখালেন। 'দেখা যাচ্ছে, কাছে। আসলেও তাই। তবে সরাসরি যাওয়ার পথ নেই, পাহাড় ঘুরে যেতে হয়। ট্যাক্সিতে করে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না। ওকে আগেই বলেছি মমিটার কথা। আমাকে সাহায্য করবে বলে কথাও দিয়েছে। চল, টেপটা নিয়ে এখুনি তার কাছে চলে যাই।'

কিশোর রাজি।

হুপারকে ডাকলেন প্রফেসর। সে এলে বললেন, 'হুপার, আমরা জিমের বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি থাক। কড়া নজর রাখবে চারদিকে। তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে প্রফেসর উইলসনের বাড়ির দিকে রওনা হল তিনজনে। বিশাল বাড়িটায় একা হুপার। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সে। কয়েকটা প্লেট মাজছিল, শেষ হয়নি মাজা। আবার কাজে মন দিল।

বাইরে অন্ধকার নামছে। প্লেট মাজতে মাজতেই অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল হুপার। থমকে গেল। কান পাতল।

কিন্তু আর শোনা গেল না শব্দটা। সন্দেহ গেল না হুপারের। হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রফেসরের সংগ্রহ থেকে প্রাচীন এক বিশাল তলোয়ার তুলে নিয়ে পা টিপে এগোল জাদুঘরের দিকে।

যেখানে যেটা যেভাবে রাখা ছিল, তেমনি রয়েছে। কোন রকম নড়চড় হয়নি। তেমনি পড়ে আছে কফিনটা, ডালা বন্ধ। জানালা বন্ধ করে গিয়েছিল, বন্ধই আছে।

এগিয়ে গিয়ে একটা জানালা খুলল। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে নামল চত্বরে। ঠিক তখনই আবার কানে এল শব্দটা। অদ্ভুত খসখসে ভাষায় কি একটা আদেশ দিল যেন কেউ! কে কাকে আদেশ দিল! তাকেই নয় তো! প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে হুপার। দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। পাগলের মত চারদিকে তাকাচ্ছে।

এক পাশে একটা ঝোপের ভেতর নড়াচড়া লক্ষ্য করল। তলোয়ারটা তুলে ধরল আত্মরক্ষার তাগিদে। আবছা অন্ধকারে দেখল, বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি।

দেহটা মানুষের, তবে গলার ওপরের অংশ পুরোপুরি শেয়াল। দুই চোখ জ্বলছে।

'আনুবিস!' ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল হুপার। 'শেয়ালদেবতা!'

এক পা সামনে বাড়ল আনুবিস। ধীরে ধীরে তুলল ডান হাত। টান টান সোজা করল সামনের দিকে। তর্জনী নির্দেশ করছে হুপারকে।

ঠিক বুঝতে পারল না হুপার, কি ঘটল। অস্বাভাবিক দুর্বল বোধ করছে। চোখের পলকে যেন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তার শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোতে। হাত থেকে খসে পড়ল তলোয়ার। সেই সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল সে-ও।

আট

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ছোট একটা ব্রিজ-গ্যারেজের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ রেখেছে। নিচে ঢালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর উইলসনের বাংলো।

'সরু রাস্তা,' বলল ড্রাইভার। 'সামনের দিক থেকে কোন গাড়ি এলে মোড় ঘোরার আগে দেখতে পাবে না। লাগিয়ে বসতে পারে আমার ট্যাক্সিতে। আপনারা যান। পাহাড়ের নিচে একটা পার্কিং লট আছে। ওখানে অপেক্ষা করব আমি।'

গাড়ি থেকে নামলেন প্রফেসর বেনজামিন, রবিন আর কিশোর। ব্রিজ পেরিয়ে দেখল, গ্যারেজের এক পাশ থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। বেল বাজালেন প্রফেসর।

দরজা খুলে দিল উইলসন। 'আরে, প্রফেসর! আসুন, আসুন। মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষা নিয়ে ডিকশনারি লিখছি, ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। তো, এই অসময়ে কি মনে করে?'

জানালেন প্রফেসর বেনজামিন।

খুব উত্তেজিত মনে হল উইলসনকে। 'অবিশ্বাস্য! এখনই শুনব ক্যাসেটটা! বুড়ো মিয়া কি বলছে বোঝা দরকার।'

পথ দেখিয়ে মেহমানদেরকে স্টাডিতে নিয়ে এলেন উইলসন। বইয়ে প্রায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘরটা। আর আছে কয়েকটা রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ-রেকর্ডার। ক্যাসেটটা নিয়ে একটা মেশিনে ঢুকিয়ে চালু করে দিলেন তিনি।

রা-অরকনের ফিসফিসে গলার আওয়াজ অনেক গুণ পরিবর্ধিত করে সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল যেন স্পীকার। শুনতে শুনতে হতাশা ফুটল উইলসনের চেহারায়। উত্তেজনা চলে গেছে। 'দুঃখিত, প্রফেসর, একটা শব্দও বোঝা যাচ্ছে না। রেকর্ডিং খুব খারাপ, আসল শব্দের চেয়ে মেশিনের শব্দই বেশি ক্যাচ করেছে। আরেকটা মেশিন আছে আমার। ফালতু অ্যাওয়াজ কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা আছে ওটাতে। দেখি ওটাতে লাগিয়ে। কাজ হতেও পারে।'

বেরিয়ে গেলেন উইলসন। ফিরে এলেন ছোট একটা টেপ-রেকর্ডার সেট

নিয়ে। ক্যাসেটটা আগের মেশিন থেকে বের করে নিয়ে নতুনটাতে ভরলেন। টিপে দিলেন প্লে লেখা বোতাম।

কাজ সারতে খুব একটা দেরি হল না মুসার। প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। সেকথা বলল বোরিসকে।

প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে যখন পৌঁছল ট্রাক, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। একটা মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে এত বড় বাড়িটাতে।

'মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই,' বলল বোরিস। 'যাবে?'

'কেউ না থাকলেও প্রফেসরের খানসামা থাকবেই,' বলল মুসা। নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। 'ওর কাছেই জানতে পারব কে কোথায় গেছে, যদি গিয়ে থাকে।'

হাতঘড়ি দেখল বোরিস। 'তাড়াতাড়ি এস। রোভারকে নিয়ে সিনেমায় যাব। ও অপেক্ষা করবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতে পারবে?'

'আপনি চলে যান তাহলে,' বলল মুসা। 'কত দেরি হবে ঠিক বলতে পারছি না। পাহাড়ের নিচে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড দেখলাম। বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে না।'

'ঠিক আছে,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল বোরিস। চলে গেল ট্রাক নিয়ে।

বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। বেল বাজাল। অপেক্ষা করছে দরজা খোলার। মিসেস ভেরা চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা ভাবছে।

দ্রুত কথা বললেন মহিলা। অনেক কথাই বলে ফেলেছেন খুব কম সময়ে। হপ্তাখানেক আগে হারিয়ে গেছে তাঁর শখের বেড়ালটা। খুব সুন্দর দেখতে। এ-অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। বেশির ভাগ আবিসিনিয়ান বেড়ালই বুনো স্বভাবের, পোষ মানে, তবে মনিবের সঙ্গেও ব্যবহার খারাপ করে। কিন্তু ওই বিশেষ বেড়ালটা ছিল ঠিক উল্টো। ভদ্র, কোনরকম বাজে স্বভাব ছিল না। মিসেস চ্যানেলের ধারণা, হয় বেড়ালটাকে চুরি করা হয়েছে, কিংবা বাড়ি থেকে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল, পথ চিনে আর ফিরতে পারেনি।

বেড়ালটা পিঙ্গল রঙের, শুধু সামনের দুই পায়ের নিচের অংশ সাদা। চোখ দুটোতে আশ্চর্য একটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আবিসিনিয়ায় বেড়ালের চোখ সাধারণত হলুদ কিংবা কমলা রঙের হয়। অথচ স্ফিঙ্কসের একটা চোখ কমলা, আরেকটা নীল। এই বিশেষ ব্যাপারটার জন্যে কয়েকবারই বেড়ালের মেলায় ওটাকে নিয়ে গেছেন মিসেস চ্যানেল। দেখিয়ে লোককে অবাক করে দেয়ার জন্যে। স্থানীয় অনেক পত্র-পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে বেরিয়েছেও খবরটা স্ফিঙ্কসের রঙিন ফটোগ্রাফসহ। জীববিজ্ঞানীদের মতে বেড়ালের চোখের রঙের সেই বৈসাদৃশ্য খুব বিরল একটা ব্যাপার।

কিন্তু এখনও দরজা খুলছে না কেন হুপার? অবাক হল মুসা। আবার বাজাল বেল। সাড়া নেই। চেঁচিয়ে ডাকল সে হুপারের নাম ধরে। তবু জবাব নেই।

চারদিকে তাকাল মুসা। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। গলা আরও চড়িয়ে ডাকল হুপারকে। সাড়া না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলল জাদুঘরের দিকে। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে ওঘরেই। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। কফিনটা জায়গামতই রয়েছে। জানালার কাছে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবতা আনুবিসে মূর্তি। কোন রকম গোলমাল চোখে পড়ল না তার। কিন্তু তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কি সেটা? মেরুদণ্ডে অদ্ভুত এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে এখন।

কফিনের ঢাকনা তুলে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। যদি একা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে মমিটা? থাক বাবা, খুলে কাজ নেই। ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল মুসা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেই জানালাটার কাছে, যেটা দিয়ে দেখা যায় প্রফেসর উইলসনের বাড়ি। উঁকি দিল বাইরে। অন্ধকার বাগান। ঘরের আলো পড়েছে খানিকটা জায়গায়, তাতে আশপাশটা আরও বেশি অন্ধকার দেখাচ্ছে। কালো আকাশে অগুণতি তারা। এক বিন্দু বাতাস নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। কালো ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে মেরুদণ্ডের শিরশিরে অনুভূতিটা ফিরে এল আবার। হঠাৎই ভয় পেতে শুরু করেছে সে। গেল কোথায় সব? কোন অঘটন ঘটল না তো? ঘুরে দাঁড়ানর আগের মুহূর্তে চোখে পড়ল জিনিসটা। জানালা দিয়ে আলো পড়েছে বাগানে। আলো আর অন্ধকারের সীমারেখার কাছে চকচক করছে কিছু একটা।

ভয় নেই, বলে মনকে বোঝানর চেষ্টা করল মুসা। সাহস সঞ্চয় করে জানালা টপকে নামল বাগানে। কাছে গিয়ে তুলে নিল চকচকে জিনিসটা। একটা তলোয়ার। অনেক পুরানো, ব্রোঞ্জের তৈরি। নিশ্চয় প্রফেসর বেনজামিনের সংগ্রহের জিনিস। ঠিক এই সময় মৃদু একটা শব্দ হল পেছনে। ধক করে উঠল মুসার বুকের ভেতর। পাঁই করে ঘুরল।

ঝোপের ভেতর নড়ছে কিছু একটা। পর মুহূর্তেই বেরিয়ে এল ছোট একটা চারপেয়ে জীব। ধীরে ধীরে কাছে চলে এল। বেড়াল। মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। পরক্ষণেই তার পায়ে গা ঘষতে শুরু করল। মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ করছে। আদর চাইছে বোধহয়।

হেসে ফেলল মুসা। দূর হয়ে গেছে উত্তেজনা, শঙ্কা, ভয়। তলোয়ারটা মাটিতে রেখে বেড়ালটাকে তুলে নিল দু'হাতে। সুন্দর একটা বেড়াল। হুলো। বেশ বড়। পিঙ্গল রঙ। মৃদু ঘড়ঘড় করেই চলেছে। দু'পা এগিয়ে আলোতে এসে দাঁড়াল মুসা। এই সময় মুখ তুলে তাকাল বেড়ালটা তার দিকে। হাত থেকেই প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল ওটাকে মুসা। নিজের অজান্তেই চাপা একটা শব্দ করে উঠল, 'ইয়াল্লা!' এটা স্ফিঙ্কস। মিসেস চ্যানেলের বেড়াল! —ভাবছে মুসা। এটা এখানে এল কি করে? যেভাবেই আসুক, কপালগুণেই খুঁজে পেয়েছে সে এটাকে। কিশোরের দিকে

চেয়ে খুব একখান হাসি দিতে পারবে এবারে। এত তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে গেছে কেস।

জানালার দিকে পা বাড়াল মুসা, ঠিক এই সময় ভারি একটা কিছু এসে পড়ল তার ওপর, পেছন থেকে। চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে বেড়ালটাকে ছেড়ে দিল সে। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। পিঠের ওপর চেপে এল একটা ভারি কিছু।

এক মুহূর্ত। তারপরই হুঁশ ফিরে পেল মুসা। এক গড়ান দিয়েই সরে গেল, পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিল বোঝাটা। পাশ ফিরে তাকাল। সেই ছেলেটা। সকালে ঝোপের ভেতর বসে ছিল যে, যাকে ধরে ফেলেছিল। ছেলেটা উঠে দাঁড়ানর আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মুসার শরীরে। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে চিতার মত লাফিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কোমর। এবার আর ছাড়বে না কিছুতেই।

অনেক চেষ্টা করল ছেলেটা, কিন্তু ছাড়া পেল না মুসার হাত থেকে।

'মুসা আমানের হাতে পড়েছ, খোকাবাবু,' বলল গোয়েন্দাসহকারী, 'সহজে ছাড়া পাচ্ছ না আর। কে তুমি? এদিকে এত ঘোরাফেরা কিসের? আমাকে আক্রমণ করছ কেন?'

আবার ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ছেলেটা। তারপর হাল ছেড়ে দিল। চেঁচিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'তোমরা আমার দাদা রা-অরকনকে চুরি করেছ! আমার বেড়ালটাকে ধরে রাখতে চাইছ! কিন্তু আমি জামান বংশের ছেলে জামান, সেটা কিছুতেই হতে দেব না!'

'দাদা রা-অরকন! চুরি করেছি!' মুসা অবাক। 'আর ওটা তোমার বেড়াল? ভুল করছ, খোকাবাবু। বেড়ালটা তোমার নয়। ওটার মালিক মিসেস ভেরা চ্যানেল। আর আমি ওটাকে ধরে রাখতে চাইনি। ওটাই আমার কাছে এসেছে। খাতির করতে চেয়েছে।' ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটাকে জানালার কাছে নিয়ে এল মুসা। কোমর ছেড়ে দিয়ে কব্জি চেপে ধরল।

মুসার দিকে চেয়ে আছে ছেলেটা। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে না আর। তামাটে চামড়ার রঙ, কুচকুচে কালো বড় বড় দুটো চোখ। ভ্রূকুটি করল। 'তুমি দাদা রা-অরকনের ব্যাপারে কিছু জান না! ওকে চুরি করনি?'

'কি বলছ তাই বুঝতে পারছি না,' বলল মুসা। 'মমিটার কথা বলছ? তাহলে ওটাকে দাদা-দাদা করছ কেন? ওটা তিন হাজার বছরের পুরানো। তোমার দাদা হয় কি করে? কফিনের ভেতরে রয়েছে এখন। চুরি করিনি। আর করতে যাবই বা কেন?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'কফিনের ভেতর নেই এখন ওটা।'

'নেই!'

'না, নেই। খানিক আগে দুটো লোক এসে নিয়ে গেছে। এতে তোমার কোন হাত নেই বলতে চাইছ?'

'রা-অরকনকে নিয়ে গেছে!' ছেলেটার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি মুসা। 'বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'আমি সত্যি বলছি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ছেলেটা। 'জামান বংশের জামান কখনও মিছে কথা বলে না।'

ছেলেটাকে ধরে রেখেই জানালা দিয়ে কফিনটার দিকে তাকাল মুসা। ঠিক আগের জায়গাতে আগের মতই রয়েছে। বিন্দুমাত্র সরেনি কোনদিকে। কিন্তু ছেলেটা বলছে, সে সত্যি কথা বলছে। তাহলে?

'শোন, খোকাবাবু,' বলল মুসা। 'শুনেছি, মমিটা প্রফেসর বেনজামিনের সঙ্গে কথা বলে। ওই রহস্যের সমাধান করতেই এসেছি আমরা। কেন, কি কথা বলে, কি করে বলে, বলতে পারবে কিছু?'

বিস্ময় ফুটল ছেলেটার চোখে। 'দাদা রা-অরকন কথা বলে! আশ্চর্য! না, আমি কিছু বলতে পারব না!'

'আমরাও কিছু বুঝতে পারিনি এখনও,' বলল মুসা। 'মমিটার ব্যাপারে অনেক কিছু জান মনে হচ্ছে। আমি কিছু কিছু জানি, হয়ত সেটা তুমি জান না। এ-বাড়ির ওপর চোখ রেখেছ কেন? সকালে ঝোপের ভেতর কেন লুকিয়েছিলে? কোন অসুবিধে না থাকলে বলে ফেল। হয়ত মমি রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা। মানে, কি করে কথা বলে, কি বলে, জানতে পারব। কি, বলবে?'

দ্বিধা করছে ছেলেটা। তারপর মাথা নাড়ল। 'বেশ, বলব সব। জামান বংশের জামান বিশ্বাস করল তোমাকে। হাত ছাড়, ব্যথা পাচ্ছি।'

হাত ছেড়ে দিল মুসা।

কব্জির কাছটায় ডলতে লাগল ছেলেটা। ঝোপের দিকে চেয়ে তার নিজের ভাষায় কিছু বলল চেঁচিয়ে।

'কি বলছ?' জানতে চাইল মুসা।

'আমার বেড়ালটাকে ডাকছি। ওর ভেতরে বাস করে রা-অরকনের আত্মা। মমিটা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে ওটা আমাদের।'

অপেক্ষা করে রইল দু'জনে। কিন্তু এল না বেড়ালটা।

'বলেছিল না?' অবশেষে বলল মুসা। 'ওটা তোমার বেড়াল নয়। মিসেস চ্যানেলের। নাম, স্ফিঙ্কস। আবিসিনিয়ার বেড়াল, পিঙ্গল শরীর। সামনের দুই পা সাদা। দুই চোখ দুই রঙের। মহিলার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

'না,' গভীর আস্থা ছেলেটার কণ্ঠে। 'পা সাদা নয়, কালো। রা-অরকনের প্রিয় বেড়াল। যেটাকে মেরে মমি করে কফিনে তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে।'

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল মুসা। বড় বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে জামান বংশের জামান। বেড়ালটার পায়ের রং সাদাই দেখেছে কিনা, মনে করতে পারছে না। ভাবনায় পড়ে গেল। 'ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে ভাবব। এস দেখি, তোমার কথা ঠিক কিনা। সত্যিই চুরি গেছে কিনা মমিটা।'

জানালা গলে দু'জনে ঢুকল জাদুঘরে। ধরাধরি করে তুলে ফেলল কফিনের ঢাকনা। ঠিকই বলেছে জামান বংশের জামান। শূন্য কফিন।

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করল মুসা। 'কে নিল!'

'তোমাদেরই কেউ নিয়েছে! চুরি করেছে আমার দাদাকে!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'না, জামান,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'এই চুরির ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি। "তোমাদের" বলতে যাকে বোঝাতে চাইছ? এ বাড়িতে আমরা তিন বন্ধু এসেছি। অন্য দু'জন আমার বয়েসী। মমিটা কথা বলে কেন, সে রহস্য ভেদ করতে এসেছি। সে যাই হোক, মমিটা সম্পর্কে তুমি যা জান বল, আমি যা জানি বলব। হয়ত একটা সমাধান বেরিয়েও যেতে পারে। কে চুরি করল মমিটা, তা-ও জেনে যেতে পারি হয়ত।'

কি যেন ভাবল জামান। মাথা কাত করল, 'বেশ, কি জানতে চাও?'

'আমার প্রথম প্রশ্ন, রা-অরকনকে দাদা বলছ কেন?'

'জামান বংশের অনেক প্রাচীন পূর্বপুরুষ রা-অরকন,' গর্বিত কণ্ঠ জামানের। 'তিন হাজার বছর আগে লিবিয়ানরা গিয়ে মিশর শাসন করেছিল। রা-অরকন লিবিয়ান। তিনি ছিলেন এক মহান রাজা। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না বলে, অত্যাচারীকে কঠোর হাতে দমন করতেন বলে, খুন করা হয় তাঁকে। তাঁর লাশ নষ্ট করে ফেলতে পারে শত্রুরা—জান হয়ত, মমি নষ্ট করে ফেললে সেই লোকের আত্মা আর পরপারে গিয়ে ঠাঁই পায় না, প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, তাই গোপনে গোপন জায়গায় কবর দেয়া হল তাঁকে। বিনা আড়ম্বরে। তাঁর বংশের এক ছেলে আবার লিবিয়ায় ফিরে গিয়েছিল। সেই ছেলেরই বংশধর আমরা।'

'জানলে কি করে এত সব? কোন প্রাচীন ডায়েরী-টায়েরী··· মানে ফলকে লেখা···'

মাথা নাড়ল জামান। 'না, ওরকম কিছু না। এক জ্যোতিষের কাছে জেনেছেন এটা বাবা। মহা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ওই জ্যোতিষ। অতীত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। সে-ই জানিয়েছে, রা-অরকনকে অনেক দূরের এক দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিশর থেকে, বর্বরদের দেশে। ওখানে মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না রা-অরকন, তাঁর ঘুমের খুব ব্যাঘাত ঘটছে। আমার বাবা অসুস্থ, তাই মমিটা নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন জলিলকে। সে আমাদের ম্যানেজার। সঙ্গে দিয়েছেন আমাকে। বংশের কেউ নিতে না এলে যদি কিছু মনে করে রা-অরকন, সেজন্যে।'

অন্য সময় হলে 'বর্বর' শব্দটার প্রতিবাদ করত মুসা। কিন্তু এখন অন্য ভাবনা চলেছে মাথায়। সকালে প্রফেসর বেনজামিন বলেছেন, একজন অ্যারাবিয়ান ব্যবসায়ী মমিটা নিতে এসেছিল। তার নাম জলিল। লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। 'ও, এই জন্যেই এ বাড়ির আশেপাশে এত ঘোরাফেরা তোমার?' বলল মুসা। 'তুমি আর জলিল মিলে রা-অরকনকে চুরি করার ফন্দি এঁটেছিলে নাকি?'

'বর্বর প্রফেসর আমার দাদাকে দিল না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল জামান, 'আর কি করব? কিন্তু চুরি বলছ কেন এটাকে? আমাদের জিনিস জোর করে দখল করেছে সে। আর কোন উপায় নেই আমাদের। তাই ওকে না জানিয়েই নিয়ে যেতে চেয়েছি। দাদার আত্মার শান্তির জন্যে জান দিয়ে দিতেও আপত্তি নেই আমার। বংশের কারও অপমান সহ্য করে না জামান বংশের লোকেরা।'

'তোমাদের ম্যানেজার জলিল এখন কোথায়?'

'আছে। তাকে দেখেছ তুমি। সকালে।'

'দেখেছি!'

'হ্যাঁ, ওই মালী। যে আমাকে ধরেছিল। ইচ্ছে করেই ওর হাত কামড়ে দেয়ার সুযোগ দিয়েছিল সে আমাকে। আরবীতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, মনে আছে? কামড়ে দিতে বলেছিল। খুব চালাক লোক। তোমাদের সবাইকে কেমন বোকা বানিয়ে ছাড়ল।'

হাঁ করে চেয়ে রইল মুসা। চমকটা হজমের চেষ্টা করছে। সেই মালীটা তাহলে জলিল! চুরি করতে এসেছে রা-অরকনকে জামানের বাবার আদেশে! তার ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই পাঁই করে ঘুরল জামান জানালার দিকে। কান পেতে শুনছে কি যেন!

'কেউ এসেছে!' চাপা গলায় বলল জামান। 'ইঞ্জিনের শব্দ!'

জানালার কাছে ছুটে গেল সে। উঁকি দিল বাইরে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। সে-ও তাকাল।

পুরানো একটা নীল রঙের ট্রাক ঢুকছে গেট দিয়ে। চত্বরে এসে থামল। দু'জন লোক নামল। দু'জনেই মোটাসোটা, বেঁটে। সোজা এগিয়ে আসছে জাদুঘরের দিকে।

'ওই দু'জনই!' ফিসফিস করে বলল জামান। 'ওরাই চুরি করেছে রা-অরকনকে! কয়েক মিনিট আগে এসেছিল আরেকবার। কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কি তুলল ট্রাকে, এখন বুঝতে পারছি, মমিটাকেই নিয়েছে। ওরা চলে গেল। বাড়িটা খালি মনে হল। ঢুকে পড়লাম জাদুঘরে। ঢাকনা তুলে দেখি কফিনে নেই রা-অরকন।'

'এদিকেই আসছে ব্যাটারা!' বিড়বিড় করল মুসা। 'চেহারা-সুরত বিশেষ সুবিধার ঠেকছে না। আবার কি চায়?'

'লুকাতে হবে! জলদি! নিশ্চয় আরও কিছু চুরি করতে এসেছে!'

'কোথায় লুকাব?' সারা ঘরে চোখ বোলাল মুসা। 'কোন জায়গা তো দেখছি না! চল, বাইরে গিয়ে ঝোপের ভেতরে···'

'তাহলে কি চুরি করতে এসেছে দেখব না। ওদের কথাবার্তাও শুনতে পাব না। এখানেই কোথাও লুকাতে হবে,' কফিনটার দিকে চেয়ে আছে জামান। 'জলদি! ওটার ভেতর লুকাব। রা-অরকন নেই, আমাদের জায়গা হয়ে যাবে। জলদি এস।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ,' সায় দিল মুসা।

ছুটে গিয়ে কফিনে ঢুকে পড়ল জামান। চাপা গলায় ডাকল, 'আহ্, তাড়াতাড়ি এস!'

কফিনে ঢুকল মুসা। দু'জনে ধরে ঢাকনাটা নামিয়ে দিল জায়গামত। পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে ডালার ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে মুসা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, বাতাস চলাচল করতে পারবে। ভেতরে থেকে শ্বাস নিতে অসুবিধা হবে না।

পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে দু'জনে কফিনের ভেতর। ঠিক এই সময় দরজা খোলার শব্দ হল। মেঝেতে ভারি পায়ের শব্দ।

'দড়িটা খোল, ওয়েব,' শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। 'খুলেছি,' শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। 'মেথু, লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি আমার। আগে বলল না কেন ব্যাটা, কফিনটা সহ চায়? একবারেই কাজ সারতে পারতাম। আবার এখানে পাঠাল যখন দেব ফিস ডবল করে।'

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল মেথু। 'ডাবল চাইব। নইলে···ঠিক আছে, এস বেঁধে ফেলি।'

মুহূর্ত পরেই টের পেল মুসা আর জামান, নড়ছে কফিন। একটা প্রান্ত উঠে যাচ্ছে ওপরে। দড়ি ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে নিশ্চয়। বুঝতে পারছে ওরা, কফিনের সঙ্গে ডালাটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধা হচ্ছে। ভাগ্যিস পেন্সিলটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল! নইলে দম বন্ধ হয়েই মরতে হত।

'কফিনটাও চুরি করবে ব্যাটারা।' মুসার কানে ফিসফিস করল জামান। গাঢ় অন্ধকার ভেতরে। 'এখন কি করব আমরা?'

'চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে,' ফিসফিস করে জবাব দিল মুসা। 'এছাড়া আর কিছু করার নেই। কে বা কারা ওদেরকে পাঠিয়েছে, জানার সুযোগ পেয়েছি। কোথায় নিয়ে যায় ওরা কফিনটা জানতে পারব। নিয়ে যাক আগে। তারপর সুযোগ বুঝে বেরোনর চেষ্টা করব। হয়ত জায়গায় পৌঁছে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলবে। কি, ভয় পাচ্ছ?'

'জামান বংশের জামান ভয় পায় না!'

'আমিও না,' বলল মুসা। 'তবে অস্বস্তি বোধ করছি।'

দু'দিক থেকে তোলা হল কফিনটা, টের পেল ওরা।

'আরিব্বাপরে! কি সাংঘাতিক ভারি!' শোনা গেল ওয়েবের কণ্ঠ।

'সীসা দিয়ে বানিয়েছে নাকি!...ধর, শক্ত করে ধর! ফেলে দিয়ে ভেঙ না। তাহলে একটা কানাকড়িও আদায় করতে পারব না।'

কফিনটা বয়ে নেয়া হচ্ছে, বুঝতে পারল মুসা আর জামান। ট্রাকের পেছনে তোলা হল, শব্দ শুনেই অনুমান করল।

'ব্যাটা এসব জিনিস দিয়ে কি করবে?' বলল ওয়েব।

'কি করবে কে জানে! কতরকম পাগল আছে দুনিয়ায়! মরা লাশও কাজে লাগে ওদের! হুঁহ্! জাহান্নামে যাক ব্যাটারা। আমাদের টাকা পেলেই হল। এস, ওঠ। স্টার্ট দাও।'

দড়াম করে বন্ধ হল কেবিনের দরজা। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল ট্রাক।

অবাক হয়ে ভাবছে মুসা আর জামান, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কফিনটা!

নয়

ত্রিশতম বার ক্যাসেটটা শোনা শেষ করলেন প্রফেসর উইলসন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন প্রফেসর বেনজামিন, রবিন আর কিশোর।

'কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি,' অবশেষে বললেন উইলসন। 'কয়েকটা শব্দ বোঝা যাচ্ছে।' ক্যাসেট প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিলেন। সিগারেটের বাক্স বের করে বাড়িয়ে ধরলেন প্রফেসর বেনজামিনের দিকে। 'রেকর্ড করলেন কি করে?'

একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেম প্রফেসর। তাঁর ওপর কি করে আনুবিস পড়তে যাচ্ছিল, একেবারে সেখান থেকে। মাঝপথে বাধা পড়ল। বাড়ির কোথাও একটা দরজার ঘন্টা বাজল।

'গ্যারেজের কাছে এসেছে কেউ,' বললেন উইলসন। 'আসছি। আপনারা বসুন।'

উইলসন বেরিয়ে যেতেই ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'বলেছিলাম না, কেউ যদি ওই ভাষা বোঝে তো জিমই বুঝবে। বাপের কাছে শিক্ষা পেয়েছে তো। তার বাপও প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিল।'

'মমিটা তুলে আনার এক হপ্তা পর যিনি কায়রোর বাজারে খুন হয়েছিলেন?' বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' হাত তুললেন প্রফেসর। 'না না, আবার ওই অভিশাপের কথা তুল না।

ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। দুস্যুতস্করের অভাব নেই ওখানে। হয়ত টাকা পয়সা পাওয়ার লোভেই খুন করেছে বেচারাকে।'

ফিরে এলেন উইলসন। হাতে ট্রে, চারটে গ্লাসে কমলার রস, আসতে দেরি হয়েছে বোধহয় এজন্যেই। 'সমাজসেবা, হুঁহ্! চাঁদার জন্যে এসেছিল কয়েকজন। কি আনন্দ পায় ওসব করে!...যাকগে, নিন,' ট্রে-টা বাড়িয়ে ধরল প্রফেসরের দিকে।

একটা করে গ্লাস তুলে নিল সবাই।

গ্লাস হাতেই গিয়ে শেলফ থেকে মোটা একটা বই বের করে আনলেন উইলসন। 'বিরল একটা ডিকশনারি। বাবা জোগাড় করেছিল কোত্থেকে জানি! এখন কাজে লাগবে।' বইটা টবিলে রেখে আবার ক্যাসেট প্লেয়ার চালু করে দিলেন তিনি। তিন ঢোকে কমলার রস শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। মনোযোগ দিয়ে ক্যাসেট শুনছেন, আর কি সব লিখে নিচ্ছেন কাগজে। মাঝে মঝে ডিকশনারি খুলে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

শেষ হল ক্যাসেট। কলম রেখে উঠে দাঁড়ালেন উইলসন। জানালার কাছে গিয়ে বাইরের তাজা বাতাস টানলেন। ফিরে দাঁড়ালেন তারপর। 'প্রফেসর, অনেক প্রাচীন আরবী শব্দ রেকর্ড করেছেন। আধুনিক আরবী উচ্চারণের সঙ্গে অনেক তফাৎ। মানে উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু...কিন্তু...'

'বলে যাও,' ভরসা দিলেন প্রফেসর। 'আমি শুনব।'

'প্রফেসর...ইয়ে, মানে,' দ্বিধা যাচ্ছে না উইলসনের। 'অর্থ যা বুঝলাম, নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না! একটা মেসেজ। বলেছেঃ দেশ থেকে অনেক দূরে রয়েছে রা-অরকন। ওর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। যারা তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাদের ওপর অভিশাপ নামুক। যতক্ষণ রা-অরকনের শান্তি না আসছে, তাদের অশান্তি হতেই থাকুক। এরপরও সতর্ক না হলে ভয়ঙ্কর মৃত্যু টেনে নিক তাদের।'

মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ খেলে গেল রবিনের। এমনকি কিশোরের চেহারা থেকেও রক্ত সরে গেছে।

অস্বস্তি বোধ করছেন প্রফেসর বেনজামিন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। 'জিম, ওই অভিশাপের ভয় আমি করি না, বিশ্বাস করি না,' সামনের দিকে চিবুক বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'করবও না।'

'ঠিকই,' স্বীকার করলেন উইলসন, 'ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক।'

'পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক,' ঘোষণা করলেন গ্লেন বেনজামিন।

'তবু ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই,' বলল উইলসন। 'মমিটা কি ক'দিনের জন্যে আমার এখানে নিয়ে আসবেন? দেখি, আমার সঙ্গে কথা বলে কিনা ওটা। যদি নতুন কিছু বলে...'

'যা খুশি বলুক গে, কিচ্ছু এসে যায় না আমার, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি এখনও

বিশ্বাস করি না মমিটা কথা বলেছে। নিশ্চয় কোন রহস্য রয়েছে ভেতরে,' রবিন আর কিশোরকে দেখিয়ে বললেন প্রফেসর, 'এদেরকে ডেকে এনেছি আমাকে সাহায্য করার জন্যে। রহস্যটার সমাধান আমরা করবই।'

শ্রাগ করলেন উইলসন। মমি তাঁর এখানে নিয়ে আসার জন্যে আর চাপাচাপি করলেন না।

ভাষাবিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্যারেজের পাশে। ব্রিজ পেরিয়ে এসে নামল রাস্তায়। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে পাহাড়ী পথ। শ'খানেক গজ নিচেই পার্কিং লট, ওখানেই ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার।

গাড়িতে উঠে বসল তিনজনে। প্রফেসরের বাড়ির দিকে চলল ট্যাক্সি।

'বলেছিলাম না,' পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে বললেন প্রফেসর, কেউ যদি পারে, জিমই পারবে। কিশোর, রা-অরকনের ফিসফিসানীর ব্যাপারে আর কোন নতুন থিয়োরী এসেছে মাথায়?'

'না, স্যার,' চিন্তিত কিশোর। 'ব্যাপারটা সত্যিই বড় বেশি রহস্যময়।'

'মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত!' বিড় বিড় করল রবিন।

পৌঁছে গেল গাড়ি। নেমে পড়ল তিনজনে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে বেল বাজালেন প্রফেসর।

সাড়া নেই।

আবার বাজালেন। তবু সাড়া নেই। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'হুপার! হুপার! কোথায় গেলে!'

নীরবতা। সাড়া দিল না হুপার।

'আশ্চর্য!' আপন মনেই বললেন প্রফেসর। 'গেল কোথায়!'

'চলুন, জাদুঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ি,' পরামমর্শ দিল কিশোর। 'খুঁজে দেখলেই হবে, কোথায় কি করছে।'

জাদুঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কফিনটা কোথায়, প্রফেসর!'

কফিনের জায়গাটা শূন্য। মেঝেতে হালকা ধুলো জমেছে, তাতে কিছু আঁচড় আর ভারি জিনিস টানাহেঁচড়ার দাগ। দলা পাকানো নীল একটা রুমাল পড়ে আছে এক জায়গায়।

'রা-অরকনকে চুরি করেছে কেউ!' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'কিন্তু কে করল? জিজ্ঞেস করল? জিনিসটার কোন দামই নেই। মানে, কমার্শিয়াল কোন দাম নেই। বিক্রি করা যাবে না।' ভ্রূকুটি করলেন হঠাৎ। 'বুঝেছি! সেই অ্যারাবিয়ান! যাকে বের করে দিয়েছিলাম। পুলিশকে ফোন করতে হচ্ছে। কিন্তু,' দ্বিধা করছেন প্রফেসর। 'কিন্তু ওদেরকে ডেকে আনলে সব খুলে বলতে হবে। মমি কথা বলেছে, এটাও জানাতে হবে। আগামী কালই বেরিয়ে যাবে খবরের কাগজে খবরটা। এবং

আমার ক্যারিয়ার শেষ। নাহ্, পুলিশ ডাকা যাচ্ছে না।' ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। চিন্তিত। অসহায় হয়ে পড়েছে যেন। 'কি করি এখন? কি করি?'

কোন পরামর্শ দিতে পারল না রবিন।

নীল রুমালটা তুলে নিয়েছে কিশোর। 'কফিনটা বয়ে নিতে অন্তত দু'জন লোক দরকার। যদি, ওই জলিলই করে থাকে কাজটা, তার সঙ্গে আরও একজন রয়েছে। এই যে রুমালটা, কালিঝুলি দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকের চিহ্ন। তাড়াহুড়োয় ফেলে গেছে হয়ত।'

হাতের তালু দিয়ে কপাল ঘষছেন প্রফেসর। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন উদ্ভট! মমি কথা বলল, তারপর গেল গায়েব হয়ে...' থমকে গেলেন তিনি। 'আরে হ্যাঁ, হুপারের কথাই তো ভুলে গেছি! ও গেল কোথায়? বদমাশরা তাকে মেরে ফেলল না তো! চল, চল, খুঁজে দেখি!'

'চোরগুলোর সঙ্গে হাত মেলায়নি তো?' অনেক রহস্য কাহিনী পড়েছে রবিন, যেগুলোতে বাড়ির চাকর-বাকর খানসামারাই চোর-ডাকাতের সহায়ক।

'না, না, কি বল!' জোরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'দশ বছর ধরে কাজ করছে সে আমার কাছে। চল, খুঁজে বের করতে হবে ওকে।'

বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। চোখে পড়ল তলোয়ারটা। নিচু হয়ে তুলে নিলেন প্রফেসর। 'আমার সংগ্রহের জিনিস! নিশ্চয় এটা নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল হুপার! বেচারাকে মেরেই ফেলল কি না কে জানে! আর পুলিশ না ডেকে পারা যাবে না!'

ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন প্রফেসর, এই সময় মৃদু একটা গোঙানি কানে এল। চত্বরের শেষ প্রান্তে একটা ঝোপের ভেতর থেকে এসেছে। কিশোরও শুনেছে শব্দটা। সে-ই আগে ছুটে গেল ঝোপটার কাছে।

ঝোপের ভেতর পাওয়া গেল হুপারকে। চিত হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর। দু'হাত আড়াআড়ি রাখা হয়েছে বুকে।

ধরাধরি করে চত্বরে নিয়ে আসা হল হুপারকে, শুইয়ে দেয়া হল ঘাসের ওপর—জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে যেখানে।

'বেহুঁশ!' খানসামার ওপর ঝুঁকে বসেছে প্রফেসর। 'জ্ঞান ফিরছে নাকি! হুপার, শুনতে পাচ্ছ? হুপার?'

একবার কেঁপে উঠল হুপারের চোখের পাতা, তারপরই আবার স্থির হয়ে গেল।

'আরে, দেখুন!' ছায়ার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'একটা বেড়াল। পুষি, এস, এস!' হাত চেটে দিল। ওটাকে তুলে নিল রবিন।

'দেখ দেখ!' বেড়ালটাকে দেখছে রবিন। 'ওর চোখ দেখ! একটা নীল আরেকটা কমলা! জিন্দেগীতে এমন বিড়াল দেখিনি।'

'কি বলছ।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। বিশ্বাস করতে পারছেন না

যেন। 'দেখি দেখি, দাও তো আমার হাতে!' বিড়বিড় করলেন, 'চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য!'

বেড়ালের চোখ দুটো দেখছেন প্রফেসর। 'আবিসিনিয়ান বেড়াল, চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করছেন। 'কি যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছি না! পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত! রা-অরকনের সঙ্গে কবর দেয়া হয়েছিল তার প্রিয় বেড়ালটাকে। ওটাও ছিল আবিসিনিয়ান, দুই চোখের দুই রঙ। শরীরের রঙ পিঙ্গল, সামনের দুই পায়ের নিচের অংশ কালো। এটারও তাই!'

তাজ্জব হয়ে বেড়ালটার কুচকুচে কালো দুই পায়ের দিকে চেয়ে আছে দুই কিশোর।

'হুপারের হুঁশ ফেরানো দরকার,' বললেন প্রফেসর। 'হয়ত ও কিছু বলতে পারবে।' খানসামা একটা হাত তুলে নিয়ে তালুতে তালু ঘষতে লাগলেন জোরে জোরে। 'হুপার? হুপার? শুনতে পাচ্ছ? কথা বল!'

খানিকক্ষণ ঘষাঘষি করার পর চোখ মেলল হুপার। চোখ প্রফেসরের মুখের দিকে। কিন্তু মনিবকে দেখছে বলে মনে হয় না। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টি!

'হুপার, কি হয়েছিল?' জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী। 'রা-অরকনকে কে চুরি করল? সেই অ্যারাবিয়ানটা?'

হুপার নীরব! কথা বলার কোন চেষ্টাই নেই।

একই প্রশ্ন আবার করলেন প্রফেসর।

'আনুবিস!' অনেক কষ্টে যেন উচ্চারণ করল হুপার। আতঙ্কিত। 'আনুবিস!'

'আনুবিস? আনুবিস, মানে শেয়াল-দেবতা চুরি করেছে মমিটা?'

'আনুবিস!' আবার একটা শব্দই উচ্চারণ করল হুপার। তার পর চোখ বুজল।

খানসামার কপালে হাত রাখলেন প্রফেসর। 'জ্বর। খুব বেশি। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। পুলিশকে ডাকছি না আপাতত। রহস্য আরও জটিল হয়ে উঠেছে। রা-অরকনের মমি, তার প্রিয় বেড়াল, তারপর আনুবিস! নাহ্, বড় বেশি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!' আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'কিশোর, তোমাদের ট্যাক্সিটাই নিয়ে যাব। আমার গাড়ি আর বের করছি না। বেড়ালটা তোমাদের কাছেই থাক। হুপার ভাল হোক। ও কিছু বলতে পারলে, নতুনভাবে তদন্ত শুরু করবে। চল।'

হুপারকে ছোট একটা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালের মালিক প্রফেসরের বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে খানসামাকে ভর্তি করে নেয়া হল। কোনরকম অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন না প্রফেসর।

প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ল রবিন আর কিশোর। রকি বীচে ফিরে চলল। রবিনের কোলে বেড়ালটা, মৃদু ঘড়ঘড় করছে মাঝে মাঝেই। তবে নড়াচড়া করছে না, আরাম পেয়েছে।'

'কিশোর,' এক সময় বলল রবিন। 'কি মনে হয় তোমার? রা-অরকন গায়েব হবার সঙ্গে এই বেড়ালটার কোন সম্পর্ক আছে?'

'নিশ্চয়। কিন্তু কি সম্পর্ক, জানি না।'

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে কিশোর। তাকে এরকম হতে কখনও দেখেনি রবিন।

'ওদিকে মুসা কি করল, কে জানে!' বলল সে।

'হেডকোয়ার্টারে গিয়ে না পেলে টেলিফোন করব ওর বাড়িতে,' বলল কিশোর। 'ওখানে না থাকলে করব মিসেস চ্যানেলের বাড়িতে। তবে এতক্ষণ সান্তা মনিকায় থাকবে বলে মনে হয় না।'

হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। বিকেলে যেখানে রেখে গিয়েছিল মুসা তার সাইকেলটা, ওখানেই আছে এখনও। মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করে জানল কিশোর, মুসা ফেরেনি। সাইকেলটা রয়েছে, তার মানে বাড়িও ফিরে যায়নি। সান্তা মনিকায় টেলিফোন করল। মিসেস চ্যানেল জানালেন সন্ধ্যার আগেই তাঁর ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে মুসা। গেল কোথায়? রাশেদ চাচাকে জিজ্ঞেস করে জানল, সিনেমায় গেছে বোরিস আর রোভার। না, তাদের সঙ্গে মুসাকে দেখেননি তিনি। তাহলে?

'কোথায় যেতে পারে?' উৎকণ্ঠা ফুটেছে রবিনের চেহারায়।

'কি জানি!' কিশোরও উদ্বিগ্ন। 'সান্তা মনিকা থেকে প্রফেসরের বাড়িতে যায়নি তো? বোরিস ফিরলেই জানা যেত।'

'শো ভাঙতে দেরি আছে এখনও,' বলল রবিন। 'চল, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।'

দশ

একটানা ছুটে চলেছে ট্রাক। এবড়ো খেবড়ো অসমতল পথে নেমে এসেছে এখন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কফিনের ভেতর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে আছে মুসা আর জামান, নড়তে চড়তে পারছে না খুব একটা। হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

গুমোট হয়ে আসছে কফিনের ভেতরের বাতাস, বাইরে থেকে খুব একটা ঢুকতে পারছে না। বেশিক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে অক্সিজেনের অভাবেই মরতে হবে, ভাবল মুসা।

ভয় পেতে শুরু করেছে দু'জনেই, কিন্তু কেউই প্রকাশ করছে না সেটা।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' একসময় বলল জামান। ফিসফিস করছে, যদিও কোন দরকার নেই। ট্রাকের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজ কানে যাবে না ওয়েব কিংবা মেথুর।

'কোথায় কে জানে!' বলল মুসা। 'কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, কোন গোপন জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। যে এই কাজের ভার দিয়েছে, তার কাছে ডাবল টাকা চাইবে। টাকা আদায় করার পর তবে দেবে কফিনটা। ভালই। সময় পাব

আমরা। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়ব কফিন থেকে।' বলল বটে, কিন্তু সহজে বেরিয়ে পড়তে পারবে, বিশ্বাস হচ্ছে না তার নিজেরই। যদি দড়ির বাঁধন না খোলে চোরেরা? এখন যেভাবে আছে, তেমনিভাবে ফেলে রেখে চলে যায়?

'প্রফেসরের বাড়িতে দু'বার আসতে হয়েছে,' বলল ওরা। ফিসফিস করেই বলল জামান। 'কেউ একজনকে পাগল বলল। কিছু বুঝেছ?'

'রা-অরকনের মমি চুরি করতে পাঠানো হয়েছে ওদের,' বলল মুসা। 'সোজা কথা, ভাড়া করা হয়েছে। মমিটা নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু সেই লোক চেয়েছে কফিনসুদ্ধ। তাই আবার পাঠিয়েছে ওদেরকে। ওরা গেছে রেগে। কফিনটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও রাখবে। ডবল টাকা না পেলে দেবে না ওটা।'

'হুঁ, তাই হবে,' একমত হল জামান। 'কিন্তু রা-অরকনের মমি চুরি করবে কে? কেন? ও আমার দাদা, আর কারও নয়।'

'এটা আরেক রহস্য,' বলল মুসা। 'নিশ্চয় এতক্ষণে একটা নাম দিয়ে ফেলেছে রবিন, নোট লিখে ফেলছে। মমি-রহস্য নামটাই সব চেয়ে উপযুক্ত।'

'রবিন? রবিন কে?'

'তিন গোয়েন্দার একজন।'

'তিন গোয়েন্দা! সেটা আবার কি?' জামানের কণ্ঠে বিস্ময়।

অল্প কথায় জানাল সব মুসা।

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনল জামাল। মুসার কথা শেষ হতেই বলল, 'তোমরা, আমেরিকান ছেলেরা বড় আরামে আছ। আমার দেশে, লিবিয়ায় অনেক কিছুই অন্য রকম। কার্পেটের ব্যবসা আছে আমাদের। বাবা তো আছেনই, আমাকেও দেখাশোনা করতে হয়। তোমাদের মত এত স্বাধীন না, যা খুশি করতে পারি না।...তোমাদের হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে আরও বল। টেপরেকর্ডার, পেরিস্কোপ, আর? রেডিও, টেলিভিশন, এসব নেই?'

'রেডিও!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ইস্‌স, আরও আগে মনে হয়নি কেন! বাইরের সাহায্য চাইতে পারতাম আরও আগেই!'

পকেটেই আছে ছোট ওয়াকি-টকিটা। কফিনের ভেতরে জায়গা বেশি নেই। ওই স্বল্প পরিসরেই কোনমতে শরীর বাঁকিয়ে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল যন্ত্রটা। কোমর থেকে খুলে নিল অ্যান্টেনা। ডালার ফাঁকে যেখানে পেন্সিল ঢুকিয়েছে ওখান দিয়ে বের করে দিল অ্যান্টেনার এক প্রান্ত। তারপর টিপে দিল সুইচ।

'হাল্লো, ফার্স্ট ইনভেস্টিগেটর!' মুখের কাছে ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে মুসা। সেকেণ্ড বলছি। শুনতে পাছ? জরুরি! ওভার।'

জবাবের জন্যে কান পেতে রইল মুসা। এক মুহূর্ত নীরবতা। হঠাৎ ধ্বক করে উঠল তার বুকের ভেতর। কথা শোনা গেলঃ হ্যালো টম, শুনতে পাচ্ছ? অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে আমাদের চ্যানেলে।

জবাব দিল দ্বিতীয় একটা গলাঃ হ্যাঁ, জ্যাক। একটা ছেলে। খোকা, যেই হও তুমি, চুপ কর। জরুরি কথা বলছি আমরা। জ্যাক, যা বলছিলাম, পথের মাঝে আটকে গেছি। ট্রাকের টায়ার পাঙ্কচার···

'হেল্প!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'শুনুন, আমার নাম মুসা আমান। রকি বীচের কিশোর পাশার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি। খুব জরুরি!'

টমের গলা শোনা গেলঃ কার সঙ্গে যোগাযোগ? খোকা, কি বলতে চাইছ তুমি?

'রকি বীচের কিশোর পাশাকে ফোন করুন, প্লীজ,' অনুরোধ জানাল মুসা। 'ওকে বলুন মুসা সাহায্য চাইছে। অত্যন্ত জরুরি।'

জ্যাক বললঃ কি ধরনের জরুরি, খোকা?

'একটা মমির বাক্সে আটকে গেছি,' বলল মুসা। রা-অরকনের মমি। চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রাকে করে। কিশোর সব বুঝতে পারবে। প্লীজ, ফোন করুন তাকে।'

হেসে উঠল জ্যাক। বললঃ টম, শুনলে? এই ছেলেছোকরাগুলোর কথা আর কি বলব? নেশার বড়ি খেয়ে খেয়ে সমাজটাই শেষ হতে বসেছে!

'প্লীজ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নেশা করিনি আমি! কিশোরকে ফোন করুন।'

জ্যাক বললঃ খোকা, যা করেছ করেছ, আর দুষ্টুমি কোরো না। সিটিজেন ব্যাণ্ডে গোলমাল পাকালে বিপদে পড়বে। পুলিশ শুনলেই ক্যাঁক করে গিয়ে ধরবে।···টম, অবস্থান জানিয়েছি সাহায্য পাঠাও।

নীরব হয়ে গেল রেডিও।

'হল না,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল হতাশ মুসা। 'অন্য কিছু বলা উচিত ছিল ওদের। টাকা হারিয়ে বিপদে পড়েছি, বা এমনি কিছু। সত্য কথা বলেছি, বিশ্বাস করেনি। ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। মমির বাক্সে ঢুকে আছি, এটা বিশ্বাস করারই কথা।'

'কি আর করবে? তোমার চেষ্টা তুমি করেছ। আর কিছু করার নেই।'

'হ্যাঁ। এমন অবস্থায় হাজার বছরে কেউ একবার পড়ে কিনা সন্দেহ!' কাতর শোনাল মুসার গলা।

খানিকক্ষণ নীরবতা। ছুটে চলেছে ট্রাক। ভাবছে মুসা। তার অবস্থায় পড়লে কিশোর কি করত, বোঝার চেষ্টা করছে। সময়টা কাজে লাগাতে চাইত কিশোর। কিভাবে? প্রশ্ন করে। জামান যা যা জানে, জানার চেষ্টা করত।

'জামান,' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'তুমি লিবিয়ার ছেলে। এত ভাল ইংরেজি শিখলে কি করে?'

'ভাল ইংরেজি বলতে পারি বলছ? খুশি হলাম,' সন্তুষ্ট শোনাল জামানের গলা। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না মুসা, তবে খুশি যে হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 'আমেরিকান শিক্ষকের কাছে শিখেছি। বড় হলে ব্যবসার

কাজে দেশের বাইরে যাওয়ার দরকার পড়বেই। তাই আমাকে ইংরেজি শিখতে হয়েছে। শুধু ইংরেজি না, ফরাসী আর স্প্যানিশও জানি।' একটু থেমে আবার বলল, 'লিবিয়ায় আমাদের বংশের নাম আছে। বহু পুরুষ ধরে কার্পেটের ব্যবসা করছি আমরা।'

'তা-তো বুঝলাম,' বলল মুসা। 'কিন্তু এসবের মাঝে রা-অরকন আসছে কি করে?' তুমি বলছ, ও তোমাদের পূর্ব পুরুষ। কিন্তু প্রফেসর বেনজামিনের মত, রা-অরকন সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। ও কে ছিল, কি করত, কেউ কিছু জানে না।'

'বইয়ে লেখা নেই, তাই জানে না। তবে কিছু কিছু জ্ঞানী লোক আছেন, যাঁরা দুনিয়ার অনেক কিছু সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। বই পড়তে হয় না তাঁদেরকে।'

'যেমন?'

'মাস দুই আগে,' বলল জামান। 'এক জ্যোতিষ এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বাবাকে বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে, কেউ তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলছে। তাই সে এসেছে। বাবা তাকে আদর-আপ্যায়ান করে বসালেন, খাওয়ালেন। তারপর ধ্যানে বসল জ্যোতিষ। বিড়বিড় করে অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগল। একসময় তার মুখ দিয়ে কথা বলে উঠলেন রা-অরকন। তিনি বললেন, শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের দেশে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। নিজের দেশে না এলে তাঁর শান্তি নেই। জামান বংশের পূর্বপুরুষ তিনি। কাজেই তাঁকে ফিরিয়ে আনা জামানদেরই কর্তব্য। বর্বরদের দেশে গেলেই রা-অরকনের কথার প্রমাণ পাবেন বাবা। প্রিয় বেড়ালের রূপ ধরে দেখা দেবেন তিনি বাবাকে। কথা শেষ হতেই ধ্যান ভেঙে গেল জ্যোতিষের। আশ্চর্য! রা-অরকন কি কি বলেছে কিছুই বলতে পারল না সে। বাবা সব খুলে বলতেই গম্ভীর হয়ে গেল।'

'কোনকরম ফাঁকিবাজি নেই তো?'

'না না। লোকটাকে দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে। চুল, লম্বা লম্বা দাড়ি, সব ধবধবে সাদা। একটা চোখ অন্ধ। বয়েসের ভারে কুঁজো, লাঠিতে ভর করে হাঁটে। সঙ্গে বোঝা ছিল। ওটা থেকে স্ফটিকের একটা বল বের করে কি সব পড়ল বিড়বিড়িয়ে। এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল বলটার দিকে। তারপর অতীত আর ভবিষ্যতের অনেক অদ্ভুত কথা বলে দিল গড়গড় করে।'

'খাইছে! তোমার বাবা কি করলেন তখন?'

'আমাদের ম্যানেজার জলিলকে কায়রো পাঠালেন। সে গিয়ে জেনে এল, সত্যিই কায়রো মিউজিয়মে রাখা ছিল রা-অরকনের মমি। তখন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকায়। ক্যালিফোর্নিয়ার এক প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিনের কাছে যাবে। জ্যোতিষ ঠিকই বলেছে। বাবা তখন অসুস্থ। তাই নিজে আসতে পারলেন না। আমাকে আর ম্যানেজারকে পাঠালেন রা-অরকনের খোঁজে। এলাম। খুঁজে খুঁজে বের করলাম প্রফেসরের বাড়ি। তাঁর কাছে গেল ম্যানেজার। মমিটা দিয়ে

দিতে বলল। কিন্তু রাজি হল না বর্বর প্রফেসর। উল্টো গালমন্দ করে জলিলকে বের করে দিল বাড়ি থেকে।'

'শুনেছি,' বলল মুসা। 'প্রফেসর বলেছেন।'

'তখন চুরি করার ফন্দি আঁটল জলিল। এক কোম্পানিকে ধরে মালীর কাজ নিল। প্রফেসরের বাগানের কাজ করতে এসে নজর রাখতে লাগল বাড়িটার ওপর। আমিও রইলাম তার সঙ্গে। চুরি করার বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। কিন্তু অচেনা অজানা দেশ, বিদেশ। কাউকে চিনি না। চুরি করার সাহস হল না।'

'কিন্তু চুরির ফন্দি করলে কেন? প্রফেসরের কাছে মমিটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিতে পারতে। ভাল টাকা পেলে হয়ত বিক্রি করে দিতেন।'

'রা-অরকন আমার দাদা!' হিমশীতল কণ্ঠ জামানের। 'জোর করে কেউ তাঁকে আটকে রাখবে, আর তার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে, কেন? বর্বরদের দেশ কি আর সাধে বলেছি? সে যাই হোক, আমরা পারলাম না শেষ অবধি। অন্য একজন চুরি করে নিল। কিন্তু কে করল কাজটা? কেন?'

ভাবনা চলছে মুসার মাথায়। 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, লোক দিয়ে জলিলই চুরি করিয়েছে মমিটা? তোমাকে না জানিয়ে হয়ত করেছে একাজ।'

'না, তা হতে পারে না। আমাকে জানাতই। আমার সঙ্গে আলোচনা না করে এক পা বাড়ায় না সে। বাবা মারা গেলে আমিই মালিক হব, জানা আছে তাঁর।'

'তাই?' জামানের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছে না মুসা। 'তো, রা-অরকন যে কথা বলল, এর কি ব্যাখ্যা দেবে?'

'জানি না! হয়ত রা-অরকন খেপে গিয়েছেন। আমার আর জলিলের ওপরও হয়ত রাগ করেছেন তিনি। নাহ্, এটা সত্যিই এক আজব রহস্য!' গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জামান, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ নীরবতা।

থেমে গেল ট্রাক। কফিনের ভেতর থেকে দু'জনের কানে এল একটা শব্দ, গ্যারেজ কিংবা ওয়্যারহাউসের দরজা খোলা হচ্ছে। আবার নড়ে উঠল ট্রাক। কয়েক গজ এগিয়ে থামল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। দরজা নামানর শব্দ শোনা গেল।

ট্রাকের পেছনের ডালা নামানর শব্দ হল। খানিক পরেই তোলা হল কফিনটাকে। বয়ে নিয়ে গিয়ে ধুপ্‌ধাপ্ করে নামানো হল মেঝেতে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ভেতরে থেকে ছেলে দুটোর মনে হল, মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ওদের।

'চল যাই,' শোনা গেল মেথুর গলা। 'এটা থাক এখানেই।'

'থাক,' বলল ওয়েব। 'সকালে ফোন করব মক্কেলকে। বলব, কত চাই আমরা। আজ রাতটা একটু ভাবনা-চিন্তা করেই কাটাক।'

'কিন্তু কাল সকালেও তো পারা যাবে না,' বলল মেথু। 'লং বীচে একটা কাজ করতে হবে, ভুলে গেছ?'

'তাই তো। ঠিক আছে, সকালে না পারলে বিকেলে ফোন করব। নয়ত রাতে। দিনটাও দুশ্চিন্তা করেই কাটাক।'

'কত চাইব, বল তো? দ্বিগুণ নাকি তিন গুণ? জিনিসটা পাওয়ার জন্যে যেরকম উদ্বিগ্ন দেখলাম ওকে, আমার মনে হয় না করতে পারবে না। শেষ অবধি রাজি হয়ে যাবেই।'

'সে দেখা যাবে। চল, যাই এখন।'

আবার দরজা খোলার শব্দ। স্টার্ট হল ইঞ্জিন। পিছিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা।

উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে মুসার বুকের ভেতর। ঠেলা দিয়ে দেখল কফিনের ডালায়। নড়াতে পারল না ঢাকনা। বড় বেশি শক্ত দড়ির বাঁধন।

এগারো

হেডকোয়ার্টার। খটাখট টাইপ করছে রবিন। নোট লিখছে।

আজব বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে তার চেয়ারে বসে আছে কিশোর। চিন্তিত। আলত চাপড় দিচ্ছে বেড়ালের গায়ে। মৃদু ঘড়ঘড় করে আনন্দ প্রকাশ করছে ওটা।

'সেরেছে!' টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলেছে রবিন। 'দশটা বাজতে পাঁচ! মুসার কি হল?'

'হয়ত কোন সূত্র পেয়ে গেছে,' বলল কিশোর। 'তদন্তের কাজে ব্যস্ত।'

'কিন্তু যেখানেই যাক, দশটার মধ্যে বাড়ি ফেরার কথা তার। আমারও তাই। বেশি দেরি করলে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে যাবে বাড়িতে।'

'ফোন করে বলে দাও, ফিরতে আরও খানিক দেরি হবে। ইতিমধ্যে এসে যাবে মুসা।'

ফোন ধরলেন রবিনের মা। আরও আধঘন্টা থাকার অনুমতি দিলেন ছেলেকে।

বেড়ালটাকে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। গিয়ে চোখ রাখল পেরিস্কোপে। ইয়ার্ডের গেটে আলো। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট থেকেও আলো এসে পড়ছে চত্বরে। নীরব, নির্জন। মেরিচাচীর ঘরে আলো জ্বলল। টেলিভিশন দেখছেন চাচা-চাচী। বোরিস আর রোভারের কোয়ার্টার অন্ধকার। সিনেমা থেকে এখনও ফেরেনি ওরা।

আবার রাস্তার দিকে পেরিস্কোপ ঘোরাল কিশোর। একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। গেটের কাছে এসে গতি কমাল। একটা নীল স্পোর্টস কার। ড্রাইভারের আসনে বসে আছে লম্বা শুকনো এক কিশোর। মুখ ফিরিয়ে ইয়ার্ডের দিকে তাকাল

ছেলেটা। তারপর আবার এগোল। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেয়ারে ফিরে এল কিশোর। 'মুসার কোন চিহ্ন নেই,' গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু শুটকো টেরি শহরে ফিরে এসেছে। জ্বালাবে।'

'তাই নাকি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তাহলে গেল আমাদের শান্তি!'

'গেটের কাছে থেমেছিল। জানা কথা, আমাদেরকে খুঁজছে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি করলে এবার ধরে পেটাব। ব্যাটা জন্মের শয়তান!' আবার টাইপে মন দিল রবিন।

সময় যাচ্ছে। মুসার জন্যে ভাবনা বাড়ছে দু'জনের।

'আর আধ ঘন্টা অপেক্ষা করব,' অবশেষে বলল কিশোর। 'তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

টাইপ থামিয়ে দিয়েছে রবিন। 'কিশোর, কোন বিপদে পড়েনি তো মুসা? একটা টেলিফোনও তো করতে পারত!...কিশোর, ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগের চেষ্টা করছ না তো!'

'তাই তো!' প্রায় লাফিয়ে উঠল কিশোর। টেবিলে রাখা লাউডস্পীকারের সঙ্গে ওয়াকি-টকির যোগাযোগ করে দিয়ে সুইচ টিপল। 'হেডকোয়ার্টার ডাকছে সহকারীকে! সেকেণ্ড, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? সেকেণ্ড!'

স্পীকারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

আবার চেষ্টা করল কিশোর। বৃথা। 'নাহ্,' মাথা নাড়ল সে। 'চেষ্টা করছে না মুসা। কিংবা রেঞ্জের বাইরে রয়েছে। রবিন, রাত অনেক হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি থাকছি এখানেই।'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রবিন। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল ইয়ার্ড থেকে।

বাড়িতে ঢুকল রবিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। বাবার ডাক শুনতেই পেল না।

'রবিন?' আবার ডাকলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এত কি ভাবছিস রে? স্কুল তো ছুটি পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই।'

মুখ তুলে তাকাল রবিন। বাবার দিকে এগোল। 'বাবা, একটা সমস্যায় পড়েছি! একটা রহস্য।'

'বলবি নাকি আমাকে?'

'বাবা, একটা বেড়াল, দুটো চোখ দুই রঙের।' একটা সোফায় বসে পড়ল রবিন। 'নীল আর কমলা।'

'হুঁম্‌ম্‌!' আস্তে মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড। পাইপে তামাক ঠেসে আগুন ধরালেন।

'কিন্তু, বাবা, আসল সমস্যা বেড়ালটা নয়। একটা মমি। তিন হাজার বছরের

পুরানো। ওটা কথা বলে!'

'তাই নাকি?' পাইপে টান দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। হাসলেন। 'এটা একটা সমস্যা হল? মমিকে কথা বলানো সহজ। পুতুল নাচ দেখিসনি? পুতুলকে কি করে কথা বলায় ওরা?'

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল রবিন প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে।

'বুঝলি না?' আবার পাইপে টান দিল মিস্টার মিলফোর্ড। 'ভেনট্রিলোকুইজম। যুক্তির ভেতরে আয়। মমি হল মরা শুকনো লাশ, ওটার কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে, মমিটার হয়ে কোন একজন মানুষ কথা বলে। সুতরাং, রহস্যের সমাধান করতে হলে আশেপাশে এমন একজন প্রতিবেশীর খোঁজ কর গিয়ে, যে ভেন্ট্রিলোকুইজম জানে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রবিন। ফোনের দিকে ছুটল। কিশোরকে জানাতে হবে। পেছনে চাইলে দেখতে পেত, হাসিতে ভরে গেছে বাবার মুখ। ছেলেবেলায় তিনিও রবিনের মতই চঞ্চল ছিলেন। ছেলের মতিগতি তাই খুব ভাল করেই বোঝেন।

দ্রুতহাতে ডায়াল করল রবিন। প্রথম রিঙের সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল কিশোর। রবিনের সাড়া পেয়ে হতাশ মনে হল তাকে। 'আমি ভেবেছিলাম, মুসা! তো, কি খবর, রবিন? মুসার খবর জানতে চাইছ তো?'

'বুঝতেই পারছি, ওর কোন খবর নেই,' বলল রবিন। 'কিশোর, মমির ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। বলল, ব্যাপারটা ভেন্ট্রিলো-কুইজমের কারসাজি। প্রফেসরের কোন প্রতিবেশীর কাজ।'

'সেটা আগেই ভেবেছি আমি,' খুব একটা উৎসাহ দেখাল না কিশোর। 'প্রফেসরের বাড়ির কাছাকাছি কোন প্রতিবেশী নেই।'

'তবু, ভেবে দেখ,' ভেবেছিল সাংঘাতিক একটা তথ্য দিয়ে চমকে দেবে কিশোরকে, হাতাশই হল রবিন। 'হয়ত জাদুঘরের ঠিক বাইরে, কিংবা দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে লোকটা। ওখান থেকে কফিন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় কথা।...যাক গে, মুসার কি অবস্থা? প্রফেসরের বাড়িতে একবার ফোন করে দেখ না। আমরা চলে আসার পর গিয়েও থাকতে পারে।'

'তাই করব এখন,' বলল কিশোর। 'আর হ্যাঁ, ভেন্ট্রিলোকুইজম নিয়ে আরও ভাবব। একেবারে বাতিল করে দেয়া যায় না সম্ভাবনাটা এখনই।...গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাপড় ছেড়ে বিছানায় গেল। কিন্তু ঘুম আসছে না। হাজারটা ভাবনা এসে ভিড় করছে মনে। সবচেয়ে বেশি ভাবছে মুসার কথা। কোন বিপদে পড়ল না তো? রা-অরকনের অভিশাপ তারই ওপর নামল না তো প্রথম...

অভিশাপ নামেনি, তবে মস্ত বিপদেই আছে মুসা আমান। দু'জনে প্রাণপণ

চেষ্টা চালাচ্ছে ডালা খোলার! কিন্তু এতই শক্ত বাঁধন, একটুও ঢিল হচ্ছে না।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকটা তখনও, ইঞ্জিনের শব্দেই বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয় আবার ফিরে আসছে দুই চোর। কেন?

'ভাল কথাই মনে করেছ,' মেথুর গলা। 'দিনের বেলা কেউ ঢুকলে এটা চোখে পড়বেই। একটা কফিন পড়ে আছে দেখলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে। ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখাই ভাল।'

'সেটাই তো বোঝানর চেষ্টা করছি,' বলল ওয়েব। 'ঢাকা দেখলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ভাববে ট্রাকের কোন মাল।'

'কাম সারছে!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এতক্ষণ তো বাতাস পেয়েছি, এবার সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে! দম বন্ধ হয়েই মরব! তারচেয়ে চেঁচিয়ে উঠি! কয়েকটা চড়থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দিতেও পারে!'

'আমিও সে কথাই ভাবছি!' বলল জামান

চেঁচানর জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল মুসা। একটা বিশেষ কথা কানে ঢুকেছে।

বারো

'ওয়েব,' বলছে মেথু। 'দড়িটা খুলে নাও আগে। কাল দরকার পড়বে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বলল ওয়েব। 'খুলে নিচ্ছি।'

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল মুসা আর জামান। দড়ি খোলার শব্দ শুনল। কফিনের ওপর ক্যানভাস টেনে দেয়ার খসখস আওয়াজ আসছে।

আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। খানিক পরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। চলে গেল ট্রাক।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। তারপর ঠেলা দিল ডালায়। তার সঙ্গে হাত লাগাল জামান। ডালা খুলে গেল। তবু অন্ধকার। ক্যানভাসে ঢাকা রয়েছে। দাঁড়িয়ে উঠে ঠেলে ক্যানভাস সরিয়ে ফেলল মুসা, জামান বেরিয়ে গেল আগে। তারপর বেরোল সে।

অন্ধকার। মাথার ওপরে স্কাইলাইট। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হালকা আলো আসছে। ঘরের জিনিসপত্র আবছা চোখে পড়ল ওদের। একটা স্টোররুম। উঁচু ছাদ, কংক্রীটের দেয়াল, কোন জানালা নেই। বড় একটা লোহার দরজা। ধাক্কা দিল। বাইরে থেকে শক্ত করে আটকানো। ঝন ঝন আওয়াজ হল শুধু। খুলল না।

ঘরে কি কি আছে জানার চেষ্টা করল মুসা আর জামান। বেরিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছে। আধো অন্ধকার। ভালমত দেখা যাচ্ছে না। কিছু দেখে কিছু হাতের

আন্দাজে খোঁজাখুঁজি চালাল ওরা। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা পুরানো মটরগাড়ি। বোঝা গেল, ওটা একটা প্রাচীন পিয়ার্স-অ্যারো সিডান। ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'পুরানো মোটরগাড়ি!' জামানের কণ্ঠে বিস্ময়। 'এটা এখানে কেন?'

'কেউ সংগ্রহ করে রেখেছে হয়ত। উনিশশো বিশ সালের জিনিস হবে। সংগ্রাহকদের কাছে খুব দামি।'

এরপর কিছু পুরানো আসবাবপত্র দেখল। ভারি! সূক্ষ্ম কারুকাজ—আঙুল চালিয়ে দেখে বুঝল। জিনিসগুলো রাখা আছে একটা কাঠের মঞ্চের ওপর।

'শুকনো রাখার জন্যে,' জামানকে বলল মুসা। 'জমা করে রাখা হয়েছে।... কিন্তু এগুলো কি?...গাদা করে রাখা?'

ছুঁয়ে দেখল জামান। রোল পাকিয়ে জিনিসগুলো একটার ওপর আরেকটা রেখে পিরামিড বানিয়ে ফেলা হয়েছে যেন। 'কার্পেট! মধ্যপ্রাচ্যের জিনিস! খুবই ভাল, অনেক দামি!'

'কি করে বুঝলে?' মুসা অবাক। 'ভালমত দেখাই যাচ্ছে না।'

'আট বছর বয়েস থেকেই কার্পেট ঘাঁটাঘাঁটি করছি। এগুলো তো আবছামত দেখা যাচ্ছে। না দেখে শুধু ছুঁয়েই বলে দিতে পারি কোনটা কেমন কার্পেট, কি ধরনের সুতো দিয়ে বানানো, বুনট কেমন। আমাদের কোম্পানির জিনিস নয় এগুলো। তবে দামি। একেকটা দু'তিন হাজার ডলারের কম হবে না।'

'ওরেব্বাবা! নিশ্চয় চুরি করে আনা হয়েছে,' বলল মুসা। 'বাজি ধরে বলতে পারি, এই ঘরের সব জিনিসই চোরাই মাল। ওয়েব আর মেথু, দুই ব্যাটাই পেশাদার চোর। এজন্যেই রা-অরকন আর কাফনটা চুরি করার জন্যে ওদেরকে ডাকা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' একমত হল জামান। 'কিন্তু এখন এখান থেকে বেরোই কি করে?'

'এই যে, আরেকটা দরজা!' অন্ধকারে প্রায় ঢাকা পড়েছিল ছোট দরজাটা। একটা দেয়াল, বোধহয় অন্য ঘরগুলো থেকে আলাদা করে রেখেছে স্টোর রুমটাকে।

হাতল ধরে টান দিল মুসা। খুলল না দরজা। আরেকটা দরজা খুঁজে পেল ওরা। ওটা বাথরুমের।

'মনে হয়,' মুসা বলল। 'ঘরটা তৈরিই হয়েছে চোরাই মাল রাখার জন্যে। দরজাগুলোও তৈরি হয়েছে সে কথা চিন্তা করেই। মেথু আর ওয়েব জানে কি করে ঢুকতে হয়, বেরোতে হয়। কিন্তু আমরা বেরোই কি করে?' ওপরের দিকে চেয়ে কি ভাবল। 'ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে!' বলল আপনমনেই।

'যাবে, যদি উড়তে পার।'

'না উড়েও হয়ত পারব। এস, চেষ্টা করে দেখি। গাড়িটা...স্কাইলাইটের ঠিক

নিচে রয়েছে।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জামান। 'চল উঠে দেখি। নাগাল পাই কিনা!'

'ধীরে বন্ধু ধীরে,' জামানের হাত চেপে ধরেছে মুসা। 'এত তাড়াহুড়া কোরো না। জুতোর সুখতলার ঘষায় রঙ ছাল তুলে ফেলবে। গাড়িটার অ্যানটিক মূল্যই খতম হয়ে যাবে।'

জুতো খুলে নিল দু'জনেই। একটার সঙ্গে আরেকটার ফিতে বেঁধে যার যার জুতো গলায় ঝুলিয়ে নিল। বেয়ে উঠে পড়ল গাড়ির ছাদে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত টান টান করে তুলে দিয়েও নাগাল পেল না মুসা। আরও ফুটখানেক ওপরে থেকে যায় স্কাইলাইট।

'লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করব,' বলল মুসা। 'যে করে হোক বেরোতেই হবে এখান থেকে।'

লাফ দিল মুসা। আঙুলে ঠেকল স্কাইলাইটের ধাতব কিনারা। আঁকড়ে ধরল। ঠেলে খুলে ফেলতে একটা মুহূর্ত ব্যয় করল। দু'হাতে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা। বেরিয়ে এল ধুলোবালিতে ঢাকা ছাদে। বসে পড়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল নিচে। 'লাফ দাও, জামান! আমার কব্জি চেপে ধর।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জামান। নিচে কংক্রীটের মেঝের দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার মুখ তুলল। লাফ দিল হঠাৎ। তার আঙুল ছুঁল মুসার হাত। কিন্তু আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছে না, পিছলে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে জামানের কব্জি ধরে ফেলল মুসা। টেনে তুলে আনল ওপরে।

'প্রচণ্ড শক্তি তোমার গায়ে, মুসা! দুঃসাহসীও বটে! গোয়েন্দা হওয়ারই উপযুক্ত তুমি।'

'হয়েছে হয়েছে, প্রশংসা থামাও,' হাত তুলল মুসা। 'ফুলে ফেঁপে শেষে পেট ফেটেই মরব।' গলায় ঝোলানো জুতো নামিয়ে এনে ফিতে খুলতে শুরু করল। 'জলদি খোল! এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।'

বিল্ডিঙের পেছন দিকে ছাতে ওঠার লোহার সিঁড়ি। অন্ধকার একটা সরু গলিতে নেমে এল ওরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। কেউ আসছে কিনা কিংবা লক্ষ্য করছে কিনা, দেখল। কেউ নেই। নির্জন।

পকেট থেকে নীল চক বের করল মুসা। লোহার বড় দরজাটা খুঁজে বের করল। ওটার নিচে বাঁ দিকে চক দিয়ে বড় বড় কয়েকটা প্রশ্নবোধক আঁকল। 'আমাদের বিশেষ চিহ্ন,' সঙ্গীকে বলল সে। 'আগামীকাল ফিরে আসব। চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারব, কফিনটা কোথায় রয়েছে। চল, মোড়ের ওদিকে গিয়ে এই রাস্তার নাম দেখি।...আরে, কে জানি আসছে! চোর-টোর না তো!'

গলি ধরে দ্রুত উল্টো দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। মোড় নিয়ে দুটো দোকানের মাঝের অন্ধকার গলি ধরে বেরিয়ে এল অন্য পাশে। কানা গলিই বলা

চলে এটাকে। ল্যাম্পপোস্ট নেই। একটা দোকানের দরজার কপালে জ্বলছে ম্লান আলো, তাতে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারল মুসা, 'এই অঞ্চলে আগে কখনও আসেনি। একেবারেই অচেনা।

'কোথায় এসেছি, যেভাবেই হোক জানা দরকার,' বলল মুসা। জামানের হাত ধরে টানল, 'এস, ওই মোড়টায় চলে যাই। ফলকে নিশ্চয় রাস্তার নাম লেখা আছে।'

ফলকটা পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু নাম পড়ার উপায় নেই। অনেক দূরে ল্যাম্পপোস্ট, আলো ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না এখানে। তাছাড়া ফলকটার ওপর কাদা লেপে দিয়েছে বোধহয় কোন দুষ্ট ছেলে।

'বদমাশ ছেলেগুলোকে ধরে পেটানো উচিত!' বিড়বিড় করল মুসা আপন-মনেই। আরও কিছু একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

যে গলি থেকে বেরিয়েছে ওরা ওটার শেষ মাথায় কাচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ উঠল। চেঁচিয়ে উঠল কেউ। ছুটে এল দুটো লোক। ল্যাম্পপোস্টের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়িতে গিয়ে ঢুকল। স্টার্ট দিয়ে মুসা আর জামানের পাশ দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছনে চিৎকার শুনল ওরা। 'চোর! চোর!' বিশালদেহী এক লোক ছুটে আসছে। ছেলেদেরকে দেখেই ঘুসি পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হারামজাদা, বদমাশেরা! চোর! আমার জানালা ভেঙেছিস! চুরি করেছিস! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!'

লোকটার চেঁচামেচিতে কয়েকটা বাড়ির দরজা খুলে গেছে। বেরিয়ে এসেছে আরও কয়েকজন লোক। সবাই ছুটে আসছে।

খপ করে জামানের হাত চেপে ধরল মুসা। 'দৌড় দাও! ধরতে পারলে হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে!'

ছুটল ওরা। এ-গলি, ও-গলি, এ-রাস্তা সে-রাস্তা এ-বাড়ির পাশ, ও-দোকানের কোণ পেরিয়ে এসে পড়ল একটা বড় রাস্তায়। পেছনে তখনও তাড়া করে আসছে লোক। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুটো কুকুর। হাঁপাচ্ছে মুসা আর জামান। আর বেশিক্ষণ পারবে না। বুকের ভেতর ভীষণ লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ড। তবু থামল না ওরা। ছুটে ঢুকে পড়ল আরেক গলিতে।

অবশেষে তাড়া করে আসা লোকদেরকে হারিয়ে দিল ওরা। ততক্ষণে দম ফুরিয়ে গেছে একেবারে। ধপ করে পথের ওপরই বসে পড়ল দু'জনে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

'খামোকা···দৌড়েছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'আমরা চোর নই, জানালাও ভাঙিনি···ওদেরকে সে কথা বুঝিয়ে বললেই হত!'

'হত না,' বলল জামান। 'চোর বলে কেউ তেড়ে এলে প্রথম কাজ ছুট

লাগানো। ঠিকই করেছ। ওরা হয়ত বুঝত শেষ অবধি, কিন্তু ততক্ষণে কিল খেয়ে থেঁতলে যেত আমাদের শরীর। ঠিকই হয়েছে, ছুট লাগিয়েছি।'

'কিন্তু···কাজটা খারাপ হয়ে গেল,' তিক্ত কণ্ঠ মুসার। 'কোন জায়গা থেকে ছুট লাগিয়েছি, জানি না। কোথায় কোনদিকে ছুটেছি, তা-ও বলতে পারব না। স্টোর-হাউসটা কোথায় সামান্যতম ধারণাও নেই!'

'আমারও না,' হতাশ মনে হল জামানকে। 'পড়লাম আরেক সমস্যায়, তাই না?'

'তাই,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আবার কি করে খুঁজে পাব বাড়িটা? বাড়িই বা ফিরব কি করে? রকি বীচ থেকে কম করে হলেও পনেরো মাইল দূরে রয়েছি আমরা। হলিউড থেকে মাইল দশেক। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলী বলেই মনে হচ্ছে।'

'ট্যাক্সি নিতে পারি,' বলল জামান।

'তা পারি,' বলল মুসা। 'কিন্তু আমার পকেটে যা আছে তাতে কুলাবে না।'

'আমার কাছে আছে,' আশ্বাস দিল জামান। 'অনেক টাকা আছে। আমেরিকান ডলার।' বেশ পুরু একটা নোটের তাড়া বের করে দেখাল সে।

'ভাল,' উঠে দাঁড়াল মুসা। আঙুল তুলে একটা দিক দেখাল। 'আলো। শহর নিশ্চয়। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ওদিকে।'

দ্রুত এগিয়ে চলল দু'জনে। মোড়ের কাছে একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ভাড়া দিতে পারবে?—ছেলেদের দেখে সন্দেহ প্রকাশ করল ড্রাইভার। জামান নোটের তাড়া দেখাতেই নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে চড়ার আগে আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে নিল। অনুমান করল, পনেরো-বিশ ব্লক দূরে রয়েছে স্টোর-হাউসটা। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল একটা পাবলিক ফোন-বুদের দিকে।

প্রথমবারই রিঙ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।

'মুসা,' বলল গোয়েন্দাসহকারী। 'ভালই আছি। বাড়ি রওনা হচ্ছি এখনই। অনেক কিছু বলার আছে তোমাকে। বাড়ি থেকে ফোনে জানাব।'

'ওয়াকি-টকি ব্যবহার কর,' বলল কিশোর। 'আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার সাড়া পেয়ে খুব খুশি লাগছে, সেকেণ্ড।'

কিশোরের গলা শুনেই বুঝতে পারছে, সত্যিই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল গোয়েন্দাপ্রধান। খুশি হয়েছে এখন ঠিকই। তবে খুশি বেশিক্ষণ থাকবে না, ভাবল মুসা। কফিনটা কোথায় আছে, দেখেছে মুসা, অথচ ঠিকানা বলতে পারবে না জানতে পারলে, কিশোরের চেহারা কেমন হবে, মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

গাড়িতে গিয়ে উঠল মুসা। জামান আগেই উঠে বসে আছে।

পথে আর কোন রকম কিছু ঘটল না। নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছল মুসা। জামান নামল না ট্যাক্সি থেকে। সে চলে যাবে প্রফেসর বেনজামিনের বাড়ির কাছাকাছি, যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে জলিল, সেখানে। সেখানেই উঠেছে ওরা এদেশে এসে।

গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল মুসা, খপ করে তার হাত চেপে ধরল জামান। 'মুসা, তোমরা সাহায্য করবে আমাকে? রা-অরকন আর তাঁর কফিনটা খুঁজে বের করতেই হবে। যদি বল, তোমাদের সার্ভিস ভাড়া করতে রাজি আছি আমি।'

'ভুল করছ তুমি, জামান,' বলল মুসা। 'টাকার বিনিময়ে কারও কাজ করি না আমরা। করি স্রেফ শখে। তাছাড়া কাজটা হাতে নিয়েছি আমরা আগেই, প্রফেসর বেনজামিনের অনুরোধে।'

'জামানের জন্যেও কাজটা কর,' অনুরোধ করল জামান। 'রা-অরকন আর কফিনটা খুঁজে বের করে প্রফেসরকে ফিরিয়ে দাও। আবার আমি আর জলিল যাব তার কাছে। আবার চাইব তার কাছে মমিটা। অনুরোধে কাজ না হলে অন্য উপায় দেখব।'

'সেটা করা যেতে পারে,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আগামীকাল সকাল দশটায় পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে হাজির থেক। কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

সায় জানাল জামান। হাত মেলাল দু'জনে। মুসা নামতেই ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

বাড়িতে ঢুকল মুসা। বসার ঘরে টেলিভিশন দেখছেন বাবা-মা।

'এত দেরি কেন, মুসা?' ছেলেকে দেখেই বলে উঠল মিস্টার আমান।

'ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে। তোমার মা-তো অস্থির হয়ে উঠেছে।'

'বাবা,' কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন মুসা, 'একটা কেসে কাজ করছি আমরা। হারানো একটা বেড়াল খুঁজতে গিয়েছিলাম। তারপর...'

'হয়েছে, আর ওসব শুনতে চাই না,' কড়া গলায় বললেন মা। 'চেহারা আর কাপড়-চোপড়ের যা হাল করেছ! খানা-খন্দে পড়ে গিয়েছিলে নাকি? যাও, জলদি গোসল সেরে ঘুমাতে যাও।'

'যাচ্ছি, মা,' আরও কিছু গালমন্দ শোনার আগেই ছুট লাগাল মুসা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়, নিজের ঘরে। জানালা খুলে দিয়ে চেয়ার টেনে বসল। অ্যান্টেনাটা জানালার বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে সুইচ টিপল ওয়াকি-টকির। 'সেকেণ্ড বলছি...সেকেণ্ড বলছি।...শুনতে পাচ্ছ, ফার্স্ট?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল, 'ফার্স্ট বলছি। তুমি কেমন আছ, মুসা? কি হয়েছিল?'

দ্রুত সংক্ষেপে সব জানাল মুসা। কফিনটা কোথায় আছে, ঠিকানা বলতে পারবে না, তা জানাল সব শেষে।

ওপাশে একটা মুহূর্ত নীরবতা।

'খামোকা দোষ দিয়ো না নিজেকে,' বলল কিশোর। 'তোমার আর কিছু করার ছিল না। কফিনটা খুঁজে বের করবই আমরা। সকালে আলোচনায় বসব। আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। রহস্যের সমাধান তো হয়নিই! বরং আরও জটিল হয়েছে। তবে, জামান যে বলছে বেড়ালটা রা-অরকনের তা ঠিক নয়। বেড়ালটা সত্যিই মিসেস ভেরা চ্যানেলের।' আর কোন কথা না বলে চ্যানেল অফ করে দিল সে।

ধীরে সুস্থে গোসল সেরে বিছানায় উঠল মুসা। নতুন আরেক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে কিশোর। প্রচণ্ড কৌতূহল কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না, অথচ কিছু করারও নেই। এত রাতে আর কিশোরের ওখানে যেতে পারবে না।

মিসেস চ্যানেলের বেড়ালের পা ছিল সাদা, পাওয়া গেছে যেটা, সেটার কালো। তাহলে ওটা ওই মহিলার বেড়াল হয় কি করে?

তেরো

হেডকোয়ার্টারে জড় হয়েছে ওরা। কৌতূহলে ফেটে পড়ার জোগাড় মুসা আর রবিনের। কিন্তু কিশোরের নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছে, এত তাড়াতাড়ি মুখ খুলবে না গোয়েন্দাপ্রধান।

'আন্দাজে কিছু বলা পছন্দ নয় আমার,' বলল কিশোর। 'কাজেই এখন কিছু বলতে চাই না। জামান আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে নিই আগে। যে ক'টা ব্যাপারে শিওর হয়েছি, সবার সামনেই বলব তখন।'

দশটা বাজল। উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখল মুসা। একটা ট্যাক্সি এসে ইয়ার্ডের গেটে থেমেছে। ওটা থেকে বেরিয়ে এল জামান। তাড়াহুড়ো করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা। অতিথিকে নিয়ে আবার একই পথে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। জামান মক্কেল, তাতে গোপন জায়গায় আনা যায়, এক নম্বার কথা। দু'নাম্বার, সারাজীবন আমেরিকায় থাকছে না সে, লিবিয়ায় ফিরে যাবে শিগগিরই। কাজেই ফাঁস করে দেবে আস্তানার খবর, এমন ভয় নেই।

'জামান,' পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, 'রবিন মিলফোর্ড, রেকর্ড রাখা আর গবেষণার দায়িত্বে আছে। আর এ হল গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা।'

'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম,' একে একে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে হাত মেলাল জামান।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক,' বলল কিশোর। 'মুসা, গত বিকেলে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনর পর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বল। কিছুই বাদ দেবে না। রবিন, নোট নাও।'

একে একে সব বলে গেল মুসা। শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিল রবিন। কিশোর

গতরাতেই শুনেছে সব কথা, যদিও সংক্ষেপে। কিন্তু সে এই প্রথম শুনল।

'সেরেছে!' মুসার কথা শেষ হতেই বলে উঠল রবিন। 'সত্যিই বলতে পারবে না স্টোর হাউসটা কোথায়?'

'কি ছোটা ছুটেছি, বলে বোঝাতে পারব না,' গতরাতের কথা মনে করে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'থেমে রাস্তার নাম দেখার সময় কোথায়! পালিয়েছি কোনমতে! ধরতে পারলে আর আস্ত রাখত না। তবে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে বিশ ব্লক দূরে হবে জায়গাটা।'

'বিইশ ব্লক!' আঁতকে উঠল রবিন। 'একেক সারিতে বিশটা করে ধরলেও চারশো ব্লক খুঁজতে হবে! তারমানে চারশো গলি। আর একেক ব্লকে যতটা বাড়ি, ততগুলো উপগলি! নাহ্, অসম্ভব মনে হচ্ছে...'

'ভুলে যাচ্ছ কেন?' বাধা দিয়ে বলল মুসা, 'স্টোর হাউসের দরজায় চিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছি।'

'ঠিক,' সায় দিল কিশোর। 'তাতে কাজ অনেক সহজ হবে।'

'কিন্তু হাতে আমাদের সময় নেই বেশি,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'বড়জোর আজ বিকেল পর্যন্ত। এর মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে বাড়িটা। কি করে সম্ভব?'

'একটা প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়,' বলল কিশোর। 'সেই মাফিক কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে তাতেও মোটামুটি সময় লাগবে। তার আগে এস, আলোচনা করে দেখি কি করে মমি রহস্যের সমাধান করা যায়।'

'সত্যি রা-অরকনের মমি খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা?' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জামান। 'কোন উপায় জানা আছে? ফিরে পাব আমাদের পূর্বপুরুষকে?'

'নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকাল কিশোর। 'এখনও জানি না। তবে একটু ভুল শুধরে দেয়া দরকার, জামান। রা-অরকন তোমাদের পূর্বপুরুষ নন, অন্তত এখন আমার তাই মনে হচ্ছে।'

রেগে উঠল জামান। 'কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল! ও ভাঁওতা দেয়নি! তাছাড়া, ও নিজে কিছু বলেনি। ধ্যানে বসেছিল। ওর মুখ দিয়ে কথা বলছেন রা-অরকন। যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ওই জ্যোতিষ। তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা।'

'একটা কথা ঠিক,' বলল কিশোর। 'তিন হাজার বছর আগে মিশর শাসন করেছিল লিবিয়ানরা।'

'এবং রা-অরকন ছিলেন লিবিয়ান, রাজার ছেলে,' জোরাল কণ্ঠে ঘোষণা করল জামান। 'জ্যোতিষ তাই বলেছে।'

'তা বলেছে! কিন্তু কতখানি সত্যি, কে জানে! প্রফেসর বেনজামিনের মত অভিজ্ঞ লোকও জানেন না, রা-অরকন সত্যিই কে ছিলেন? ঠিক কত বছর আগে কবর দেয়া হয়েছিল তাঁকে। হতে পারে তিনি লিবিয়ান। কিন্তু তার অর্থ এই নয়.

তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেনই।'

'কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল!' জেদ ধরে বসেছে যেন জামান। 'মস্ত বড় জ্যোতিষ ওই লোক, তার কথা মিথ্যে হতে পারে না।'

'কে বলল? বেড়ালটার ব্যাপারেই মিথ্যে বলেছে সে। অন্তত ঠিক কথা বলতে পারেনি।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না!' ভ্রূকুটি করল জামান।

'বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বলল কিশোর। 'জ্যোতিষ বলেছে, রা-অরকনের আত্মা তার প্রিয় বিড়ালের রূপ ধরে দেখা দেবে তোমাদেরকে। বেড়ালটা আবিসিনিয়ান, চোখের রঙে বৈশাদৃশ্য, সামনের দু'পা কালো। এই তো?'

'হ্যাঁ,' গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলল জামান। 'দেখা দিয়েছে ও। গত হপ্তার এক রাতে রহস্যজনভাবে আমার ঘরে এসে হাজির হল রা-অরকনের আত্মা, বেড়ালের রূপ ধরে।'

'তাই, না?' উঠল কিশোর। 'একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।' ছোট্ট গবেষণাগারে গিয়ে ঢুকল সে। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে সেই বেড়ালটা।

'রা-অরকন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জামান 'আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষ, বহাল তবিয়তেই আছে।'

'প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে, একটা ঝোপ থেকে বেরিয়েছিল গতরাতে,' বলল কিশোর। 'নিয়ে এসেছি আমরা। এবার দেখ।' পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল সে। বেড়ালটার সামনে এক পায়ের কালো অংশে জোরে জোরে ডলতে লাগল। সাদা রুমালে কালো দাগ লেগে যাচ্ছে। কালো পা হয়ে যাচ্ছে সাদা। 'বেড়ালটার পায়ের রঙ আসলেই সাদা। এটা মিসেস ভেরা চ্যানেলের স্ফিঙ্কস। কালো রঙ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে পায়ে।'

এতক্ষণে বুঝল মুসা, গতরাতে কেন এত নিশ্চিত ছিল কিশোর, ওটা মিসেস চ্যানেলের বেড়াল। 'খাইছে! এ-তো দেখছি ছদ্মবেশ!'

কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াল জামান। বেড়ালটার একটা পা ধরে দেখল। চোখে অবিশ্বাস। 'ছদ্মবেশ! তাহলে রা-অরকনের আত্মা নয় ওটা! কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল...'

'মিছে কথা বলেছে,' আবার গিয়ে আগের জায়গায় বসল কিশোর। 'মিসেস চ্যানেলের বেড়াল চুরি করে তার পায়ে রঙ করে তোমার ঘরে চালান দিয়েছিল। বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল, রা-অরকনের আত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছ।'

'কিন্তু কেন?' চেঁচিয়ে উঠল জামান।

'হ্যাঁ, কেন?' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা।

'জামানের বাবা আর ম্যানেজার জলিলকে বিশ্বাস করানর জন্যে। তাহলে

প্রফেসর বেনজামিনের কাছ থেকে মমিটা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করবেন তাঁরা,' জামানের দিকে তাকাল কিশোর। 'আমি শিওর, রা-অরকন তোমাদের পূর্বপুরুষ নন।'

'রা-অরকন আমাদের পূর্বপুরুষ!' কালো চোখের তারা জ্বলে উঠল জামানের। অনেক কষ্টে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর। 'ঠিক আছে, আগে মমিটা পেয়ে নিই। তারপর বোঝা যাবে সবই। আগে আমাদের জানা দরকার, কে চুরি করেছে রা-অরকনকে, এবং কেন?' জামানের দিকে তাকাল। 'জামান, গতরাতে মুসাকে যা যা বলেছ, আবার বল। মানে, জ্যোতিষ তোমাদের বাড়িতে যাওয়ার পর যা যা ঘটেছে। রবিন নোট লিখে রাখুক।'

বলতে শুরু করল জামান।

'সেরেছে!' মালীর কথা আসতেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সারাক্ষণই জলিল থাকত প্রফেসরের বাড়ির আশেপাশে। সেই তোমাকে ধরেছিল! তাই তো বলি, এত সহজে ছাড়া পেলে কি করে!'

আমাকে তার হাত কামড়ে দিতে বলেছিল জলিল, দিয়েছি,' গর্বিত কণ্ঠে বলল জামান। 'আমাদের ম্যানেজার খুবই চালাক লোক!'

'জামান,' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সমাধিকক্ষে অভিশাপ লেখা ছিল, জান তোমরা?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল লিবিয়ান ছেলেটা। 'জ্যোতিষ সবই বলেছে। ও বলেছে, দেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না রা-অরকনের আত্মা।'

'রহস্যজনক কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল প্রফেসরের বাড়িতে,' বলল কিশোর। 'আনুবিসের মূর্তি উপুড় হয়ে পড়েছিল। দেয়াল থেকে খসে পড়েছিল একটা মুখোশ। জলিলের কীর্তি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হাসিতে ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জামানের। 'জানালার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, হাতে একটা লম্বা শিক নিয়ে। দেয়ালে আর জানালার চৌকাঠের মাঝে আগেই একটা ছিদ্র করে রেখেছিল। সুযোগ বুঝে শিক ঢুকিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে মূর্তিটা। শিক দিয়ে খোঁচা মেরে মুখোশও ফেলেছে। গেটের থামের খাঁজও সেই নষ্ট করেছে। এক সুযোগে জোরে বলটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই সরে গেছে চোখের আড়ালে। প্রফেসরকে আতঙ্কিত করে ফেলতে চেয়েছে সে, তাহলে মমিটা দিয়ে দেবে, এজন্যে।'

'যা ভেবেছি,' বলল কিশোর। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন মমির অভিশাপ বাস্তবে কার্যকরী করা মোটেই কঠিন কিছু না। ওভারঅল পরা মালী রোজই বাগানে কাজ করে, বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে, তাকে সন্দেহ করবে কে?'

'সবই বুঝলাম,' বলল মুসা। 'কিন্তু শেষতক মমিটা চুরি করল কে? জামান

কসম খাচ্ছে, ওরা চুরি করেনি। তাহলে? মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটাই বা চুরি করল কে? কে রেখে দিয়ে এসেছিল ওটাকে জামানের ঘরে? এগুলো খুব রহস্যজনক ব্যাপার। তাই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হ্যাঁ,' মুসার কথায় সায় দিল রবিন। 'আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া, মমিটা কথা বলে কি করে? ও সম্পর্কে জামান কিছু জানে না। কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

'এবারে একটা প্রশ্ন,' প্রফেসারি ভঙ্গি কিশোরের। 'জামান, চোর দুটোকে সত্যিই দেখেছিলে? যারা রা-অরকনকে চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল জামান। 'গত সন্ধ্যায় জলিল বলল তার হাত ব্যথা করছে। আমাকে গিয়ে চোখ রাখতে বলল প্রফেসরের বাড়ির ওপর। একটা ঝোপে লুকিয়ে বসে আছি। বেড়ালটাও সঙ্গে আছে। ইচ্ছে করেই নিয়েছিলাম, তাতে সাহস পাচ্ছিলাম। একটা ট্রাক তখন দাঁড়িয়ে আছে চত্বরে। খানিক পরেই দুটো লোককে জাদুঘর থেকে বেরোতে দেখলাম। চাদরে পেঁচানো কি একটা ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে তুলল ট্রাকে। তখন বুঝতে পারিনি, মমিটা নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওরা চলে যাওয়ার পর জাদুঘরে ঢুকে দেখলাম, কফিনে নেই রা-অরকন।'

'আমরা প্রফেসর উইলসনের বাড়িতে যাওয়ার পর ঘটেছিল ব্যাপারটা,' মন্তব্য করল রবিন।

'অপেক্ষা করতে থাকলাম,' বলে গেল জামান। ট্রাক নিয়ে চলে গেল চোর দুটো। খানিক পরেই হাজির হল মুসা। বেড়ালটা আমার পাশে নেই, খেয়াল করিনি প্রথমে। তারপর দেখলাম, ওটা মুসার হাতে। তাকেও চোরদের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলাম। রাগ দমন করতে পারিনি।...দুঃখিত, মুসা। না বুঝেই কাণ্ডটা করে ফেলেছিলাম।'

'তাতে বরং ভালই হয়েছে,' বলল মুসা। 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হল। রহস্যটা সমাধান করা অনেকখানি সহজ হবে।'

'হুঁম্‌ম্‌!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'পুরো ব্যাপারটা জটিল, তবে স্পষ্ট।'

'জটিল তো বটেই, একেবারে অস্পষ্ট,' ঘোষণা করল মুসা। 'ওই রহস্য শুধু মাথা খারাপ করতে বাকি রেখেছে আমার!'

'বেশ কিছু তথ্য পেয়ে গেছি,' বাস্তবে ফিরে এসেছে যেন কিশোর। 'এবার ওগুলো খাপে খাপে বসাতে পারলেই ব্যস! রহস্য আর রহস্য থাকবে না।'

নোট পড়ায় মন দিল রবিন। তথ্যগুলো খাপে খাপে বসানর চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করল, আরও বেশি জট পাকিয়ে গেল সবকিছু। সমাধান করতে পারল না। অসহায় ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।

'প্রথমে,' বলল কিশোর। 'কফিনটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। রহস্য-

সামধানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাব তাহলে। স্টোরহাউসটা খুঁজে বের করে ওটার কাছে পিঠে লুকিয়ে থাকব। সন্ধ্যার পর এক সময় আসবে ওয়েব আর মেথু। কফিনটা ডেলিভারি দিতে নিয়ে যাবে। ওদেরকে অনুসরণ করব আমরা। কার কাছে নিয়ে যায়, দেখব। আসলে অপরাধীকে ধরে ফেলা কঠিন হবে না তখন।' সমর্থনের আশায় তিনজনের দিকেই একবার করে তাকাল সে। ওরা নীরব। কিশোরের কথা শেষ হয়নি বুঝে অপেক্ষা করছে। আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'অপরাধীকে ধরতে পারলে মমি আর কফিনটা তো পেয়ে যাবই, সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

'চমৎকার!' বন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মুসার কণ্ঠে। 'এত সহজ ব্যাপারটা মাথায়ই আসেনি।...কিন্তু স্টোর হাউসটা খুঁজে পাওয়া...মানে, খুঁজে পাব, কারণ চিহ্ন রেখে এসেছি–কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে। দিন পনেরোর আগে হবে না। অথচ হাতে সময় আছে মাত্র আট-নয় ঘন্টা।'

'খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা সেভাবে,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'লাভও হবে না গিয়ে খুঁজে। অন্য প্ল্যান করেছি, বলেছি না। একটা সুন্দর নাম দিয়েছি ব্যবস্থাটারঃ ভূত থেকে ভূতে।'

হাঁ হয়ে গেল অন্য তিনজন। কিছুই বুঝতে পারছে না।

'খুব সহজ একটা ব্যাপার,' হেসে বলল কিশোর। 'অথচ খুব কার্যকরী হবে আমার বিশ্বাস। খবর জোগাড়ের জন্যে শহরের প্রায় সব ক'জন ছেলেমেয়েকে লাগিয়ে দেয়া যায় এতে। কারই কোন কষ্ট হবে না, অথচ খবর ঠিকই এসে যাবে আমাদের হাতে। ছোট একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছি শুধু।'

কিশোরের কথা আরও হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হল ওদের কাছে। চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে।

'সকালে,' বলল কিশোর। 'আমার পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করেছি। বলেছি, লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীতে একটা স্টোর হাউসের দরজায় কিছু নীল প্রশ্নবোধক আঁকা আছে। কথাটা ওদের পাঁচজন বন্ধুকে জানাতে বলেছি। ক'জন হল? পঁচিশ জন। ওই পঁচিশ জন আবার তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে জানাবে ফোন করে। তার মানে? একশো পঁচিশ। ওই একশো পঁচিশজন আবার তাদের পাঁচজন বন্ধুকে জানাবে। এভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে একশো ডলার পুরস্কারের লোভে খুঁজতে থাকবে নীল প্রশ্নবোধক। কাজ কতখানি হালকা হয়ে গেল আমাদের? সময় কতখানি বাঁচল? এখন শুধু অপেক্ষার পালা। যে-কোন মুহূর্তে এসে যাবে খবর।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছুটে গিয়ে চেয়ারসুদ্ধ জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। 'কসম খোদার, কিশোর পাশা! তুমি...তুমি সত্যিই একটা জিনিয়াস!'

ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন। আস্তে করে মুসার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে

রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। কানে ঠেকাল রিসিভার। 'হ্যাল্লো' বলেই একটা সুইচ টিপে দিল। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার।

কিশোরের এক বন্ধু। জানাল, ভূত থেকে ভূতে ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তবে বিকেলের আগে খবর পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, বলল ছেলেটা। তারপর কেটে দিল কানেকশন।

'খামোকা বসে না থেকে, প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে আরেকবার ঘুরে আসা যাক,' প্রস্তাব রাখল কিশোর।

'কিন্তু মেরিচাচী যেতে দেবেন বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আসার সময় শুনে এলাম বোরিস আর রোভারের সঙ্গে কথা বলছেন। অনেক কাজ ইয়ার্ডে। আমরা এখান থেকে বেরোলেই আটকাবেন।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল কিশোর। 'তার চেয়ে বরং ফোন করি প্রফেসরকে। জামান, তোমাদের আর খামোকা বসে থাকার দরকার নেই। রবিন, ওকে এগিয়ে দিয়ে এস, প্লীজ।'

'যাচ্ছি,' উঠে পড়ল রবিন।

জামানও উঠল। 'জলিলকে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার, কিশোর পাশা। একটা ভুল ভাঙবে। তার ধারণা, আমেরিকান ছেলেরা সব পাজী। কাজকর্ম কিচ্ছু করে না। খালি অকাজের তালে থাকে, আর বাপের পয়সা ধ্বংস করে।'

'আমি আমেরিকান নই,' বলল কিশোর পাশা। 'বাঙালি। তবে আমেরিকান ছেলেরা সবাই খারাপ নয়। জলিলের সত্যিই এটা ভুল ধারণা। এই যে আমাদের রবিন, ও কি খারাপ?'

'হ্যাঁ, এটাই বোঝানো দরকার ওকে। আচ্ছা, চলি।' রবিনের পেছনে পেছনে দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল জামান।

'জামান,' পেছন থেকে ডাকল কিশোর। গতরাতে যা যা ঘটেছে, সব নিশ্চয় বলনি জলিলকে?'

'রা-অরকনকে খুঁজতে তোমার সাহায্য চেয়েছি, এটাই শুধু বলেছি,' ফিরে চেয়ে বলল জামান। 'বিশেষ কেয়ার করেনি। বলল, বাচ্চা-কাচ্চাদের এর মাঝে টেনে আনা বোকামি।'

'আর কিছু না বলে ভাল করেছ,' বলল কিশোর। 'কিছু বলবেও না। বড়দেরকে বেশি বিশ্বাস কোরো না। নিজেদেরকে সবজান্তা ভাবে, ছোটদের ব্যাপারে সব সময় বাগড়া দেয়। এবং অনেক সময়ই ঠিক কাজ করে না। তাছাড়া, গোয়েন্দার কাজে গোপনীয়তা একান্ত দরকার। কাউকে কিচ্ছু বলবে না, ঠিক আছে?'

মাথা কাত করল জামান। 'হ্যাঁ, আবার কখন দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'আজ বিকেলে ছ'টায় চলে এস,' বলল কিশোর। 'ততক্ষণে স্টোর হাউসের হদিস হয়ত পেয়ে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে! ট্যাক্সি নিয়ে আসব। জলিল নাকি আজ খুব ব্যস্ত থাকবে, কয়েকজন কার্পেট ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলবে। সে আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

রবিনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল জামান।

'খুব ভাল ছেলে,' বলল মুসা। 'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বল তো, কিশোর? কি যেন ভাবিয়ে তুলেছে তোমাকে! রা-অরকনকে কে চুরি করেছে, জান নাকি?'

'সন্দেহ করছি একজনকে,' বলল কিশোর। 'মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটার খবর ছবিসহ অনেক ম্যাগাজিন আর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, না?'

'হয়েছিল,' বলল মুসা। 'কয়েকটা ছবি দেখিয়েছেও আমাকে মিসেস চ্যানেল।'

'ধর, ওরকম একটা বেড়াল দরকার কারও। স্ফিংক্সের কথা সহজেই জানতে পারবে সে। বেড়ালটা খুব ভদ্র, ওটাকে যে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে। তারপর পায়ে কালো রঙ করে নেয়াটা কিছুই না। এখন কথা হচ্ছে, রা-অরকনকে কার এত দরকার হল? জামানের ঘরে বেড়ালটাকে ঢুকিয়ে দেয়া কার পক্ষে সহজ? সমাধিকক্ষে লেখা অভিশাপের কথা কে বেশি জানে? এবং কে প্রফেসর বেনজামিনের কাছ থেকে মমিটা নিয়ে যেতে চায়?'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। 'মালী, মানে, জলিল। জামানদের ম্যানেজার।'

'ঠিক,' কিশোর বলল। 'মমিটাকে রাখার জন্যে কফিনটাও তারই বেশি দরকার। তাই না?'

'নিশ্চয়ই।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিন্তু জামান কসম খেয়ে বলেছে, জলিল এ-ব্যাপারে কিছু জানে না।'

'জামানের তাই ধারণা। কিন্তু বড়রা সব সময় সব কথা ছোটদেরকে বলে না, এটা তো ভাল করেই জান। আরও একটা কারণ হতে পারে, গোপন কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে জলিলের। হয়ত মমিটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। পরে জামানের বাবাকে বলবে, অনেক টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। টাকাটা সে নিজে মেরে দেবে। মমিটা ফেরত পাওয়ার জন্যে যে-কোন মূল্য দিতে রাজি জামানের বাবা। সুযোগটা ছাড়বে কেন ম্যানেজার?'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ঠিক ধরেছ! সে তাই করবে! আরবী জানে জলিল। প্রাচীন আরবী জানাও তার পক্ষে সহজ। দরজার বাইরে লুকিয়ে থেকে ভেন্ট্রিলোকুইজম ব্যবহার করেছে, মনে হয়েছে মমিটাই কথা বলেছে!'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিন্তু, আগে প্রমাণ দরকার। তার আগে জামানকে কিছু বলা যাবে না। রেগে চার্জ করে বসতে পারে জলিলকে। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে

ম্যানেজার। তখন তাকে বাগে পাওয়া খুব কঠিন হবে।'

'ঠিক,' একমত হল মুসা। 'কিশোর, এখন কি করব? সারাটা দিন পড়ে আছে। স্টোরহাউসের খবর কখন আসবে কে জানে! মেরিচাচীর সামনেও পড়তে চাই না। আজ ইয়ার্ডের কাজ করতে মোটেই ভাল্লাগবে না।'

'এবং সেজন্যেই এখন বেরনো যাবে না এখান থেকে,' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'প্রফেসরকে পাওয়া যায় কিনা দেখি। হুপারের খোঁজ নেয়া দরকার।'

পাওয়া গেল প্রফেসরকে। 'হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে হুপার,' জানালেন তিনি। 'প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিল বেচারা। অদ্ভুত এক দৃশ্য নাকি দেখেছে গতরাতে। ঝোপ থেকে নাকি বেরিয়ে এসেছিল শেয়াল-দেবতা আনুবিস। দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। আতঙ্কেই বেহুঁশ হয়ে গেল হুপার। তার ধারণা, তারপর রা-অরকনকে চুরি করে নিয়ে গেছে আনুবিস।'

চাওয়া-চাওয়ি করল কিশোর আর মুসা।

'কিন্তু আমরা জানি, ওয়েব আর মেথু চুরি করেছে মমিটা!' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'প্রফেসর,' ফোনে বলল কিশোর। 'আমার মনে হয়, রবারের মুখোশ পরে এসেছিল কেউ। ভয় দেখিয়েছে হুপারকে। আনুবিসের মুখোশ পাওয়া যায় বাজারে। অবিকল ওরকম না হলেও শেয়ালের মুখ যে-কোন খেলনার দোকানে পাওয়া যায়।'

'তা ঠিক,' স্বীকারে শোনা গেল প্রফেসরের কণ্ঠ। 'আমারও তাই ধারণা। তো, কি মনে হয়? মমিটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে? রহস্যটা কি, কিছু বুঝতে পেরেছ? জলিল ব্যাটাকে সন্দেহ-টন্দেহ হয়?'

'কিছু কিছু ব্যাপার আন্দাজ করেছি, স্যার, কিন্তু কোন প্রমাণ পাইনি এখনও। আর, আজ বিকেলে কফিনটা উদ্ধার করতে যাব, আশা করছি। তেমন কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাব। রাখি এখন।' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। ট্রেলারের ছাতের দিকে চেয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল।

অপেক্ষা করছে মুসা। এক সময় উসখুস করতে লাগল। শেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি,' মুখ নামাল কিশোর। 'প্রফেসর বেনজামিন বলেছেন অভিনেতা ছিল হুপার। থিয়েটারে অভিনয় করেছে।'

'তাতে কি?'

'বেহুঁশের অভিনয় সহজেই করতে পারে একজন অভিনেতা,' বলল কিশোর। 'রঙ্গ-নাটকে ভেন্ট্রিলোকুইস্ট-এর কাজ করেছে কিনা, তাই বা কে জানে?'

'যদি করে থাকে?'

'অনুমান কর।'

'হুপারকে অপরাধী ভাবছ? ও একা? নাকি জলিলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? নাকি অন্য কারও সঙ্গে? আসলে কি ভাবছ তুমি, কিশোর?'

'সময়েই সব জানা যাবে,' কেমন রহস্যময় শোনাল কিশোরের কথা।

এরপর সারাটা দিনে রেগে গুম হয়ে থাকল মুসা। আর একটা কথা বলল না কিশোর। তার কোন কথার জবাবও দিল না। একমনে কি ভাবল সারাক্ষণ।

চোদ্দ

বিকেল। ইয়ার্ডের পিক-আপটা খারাপ রাস্তা ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীর দিকে। স্টিয়ারিং ধরেছে রোভার। মেরিচাচীকে অনেক অনুরোধ করে অনুমতি আদায় করেছে কিশোর।

ছ'টার অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছে জামান। এখন বসে আছে রোভার আর কিশোরের পাশে। ট্রাকের পেছনে ভাঁজ করে রাখা ক্যানভাসের ওপর বসেছে রবিন আর মুসা। সারাক্ষণ তর্ক করছে ওরা, কে অপরাধী তা নিয়ে। একবার বলছে জলিল, একবার হুপার। দু'বার এক মত হয়েছে, দু'বারই মত পাল্টেছে আবার। এখন আবার শুরু করে দিয়েছে তর্ক। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না, কাকে অপরাধী বলবে। ম্যানেজার আর খানসামা, দু'জনকেই অপরাধী মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

শহরতলীর একটা প্রান্তে পৌঁছে থেমে গেল ট্রাক। পাশ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল মুসা আর রবিন। পুরানো একটা থিয়েটার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক সময় বড়সড় রঙচঙে সাইনবোর্ড ছিল, এখনও রয়েছে, তবে আগের সেই জৌলুস নেই। 'থিয়েটার' শব্দটা কোনমতে পড়া যায় সদর দরজায় একটা নোটিশঃ বন্ধ। ঢোকার চেষ্টা করবেন না কেউ।

জামান আর কিশোরকে বেরিয়ে আসতে দেখে লাফ দিয়ে নামল মুসা আর রবিন।

'বিল্ডিংটা চিনতে পারছ?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সামনেটা দেখিনি গতরাতে,' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ। 'তবে উঁচু যেন একটু বেশিই মনে হচ্ছে!'

'এই বিল্ডিংটা নয়!' মাথা নাড়ল জামান।

'কিন্তু আমাদের "ভূত" এই ঠিকানাই তো দিয়েছে,' হাতের কাগজের টুকরোটা দেখছে কিশোর। টেলিফোনে ঠিকানা জানিয়েছিল একটা ছেলে, লিখে নিয়েছে। 'এক আট তিন নয় দুই, ক্যামেলট স্ট্রীট।...চল, পেছন দিকটা দেখি। দরজায় প্রশ্নবোধক থাকলে আর কোন সন্দেহ নেই।'

বাড়িটার পেছনে চলে এল ওরা। বড় একটা দরজা, ভেতরে নিশ্চয় স্টোর রুম। দরজায় নীল রঙে আঁকা কয়েকটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

'ওই যে, সেকেণ্ড, তোমার চিহ্ন,' আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'জায়গা এটাই।'

'সন্দেহ হচ্ছে!' ভুরু কুঁচকে আছে মুসা। 'ওই চিহ্ন আমি আঁকিনি! জামান, তোমার কি মনে হয়?'

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে,' বলল জামান। 'তবে অন্ধকার ছিল তখন। ভালমত দেখিনি হয়ত এই বাড়িই।'

'তাছাড়া উত্তেজিত ছিলে তোমরা, তাড়াহুড়ো ছিল,' বলল কিশোর। 'ভালমত দেখতে পাবার কথাও নয়। এই যে দরজাটা, এটা দিয়ে সহজেই ট্রাক ঢুকতে পারবে। তলায় কয়েক ইঞ্চি ফাঁকও রয়েছে। চল, উঁকি দিয়ে দেখি ভেতরে। কফিনটা চোখে পড়লেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে।'

দরজার কাছে এগিয়ে গেল ওরা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা। মাথা নুইয়ে উঁকি দিল নিচ দিয়ে। ঠিক এই সময় শব্দ তুলে উঠে গেল দরজা। দেখা গেল তিনটে মুখ। হাসিতে উজ্জ্বল।

'এই যে, কিশোর হোমস আর তার চেলাচামুণ্ডারা এসে গেছেন,' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে টেরিয়ার ডয়েলের।

'সূত্র খুঁজছ, শার্লক হোমস?' বলল টেরিয়ারের এক সঙ্গী। দাঁত বের করে হাসছে।

'প্রশ্নবোধক চিহ্ন খুঁজছ তো?' বলল তৃতীয় ছেলেটা। 'প্রচুর দেখতে পাবে। শহরতলীর যেখানে খুঁজবে সেখানেই পাবে। প্রচুর চিহ্ন রয়েছে।'

'আমার মনে হয়, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই,' সঙ্গীদেরকে বলল টেরিয়ার। 'আমাদের যাওয়াই উচিত। মিস্টার গর্দভ হোমস আর তাঁর ছাগলা-চেলারা দায়িত্ব নিয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে শিগগিরই।'

মুঠো পাকিয়ে এগোতে গেল মুসা, খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'ছেড়ে দাও। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে নাকি? শুটকি আরও শুটকি হয়ে ফিরে এসেছে। গন্ধে কাক ভিড় জমাবে। ওয়াক, থুহ!'

জ্বলে উঠল টেরিয়ারের চোখ। পা বাড়াতে গিয়েও মুসার পেশীবহুল বাহুর দিকে চেয়ে থেমে গেল। ফিরে তাকাল দুই সঙ্গীর দিকে, ওদের সাহায্য পাবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিরাশ হল। রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা নীল স্পোর্টস কারটার দিকে তাকাচ্ছে ওরা ঘনঘন। ছুটে গিয়ে ওতে উঠে পড়ার তালে আছে। মুসা আমানের সঙ্গে লাগতে রাজি নয় কেউই।

'তৈরি থেক, শার্লক হোমসেরা,' কর্কশ গলায় বলল টেরিয়ার। 'আবার দেখা করব আমি তোমাদের সঙ্গে।' ছুটে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে ছুটল তার দুই সঙ্গী।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল টেরিয়ার আর তার সঙ্গীরা।

'প্রচুর চিহ্ন রয়েছে,' টেরিয়ারের সঙ্গীর এই কথাটার মানে প্রথম বুঝতে পারল রবিন। আঙুল তুলে পাশের বাড়ির একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'দেখ দেখ, নীল প্রশ্নবোধক! তার মানে বন্ধ দরজা এদিকে যে ক'টা পেয়েছে, সবগুলোতে চিহ্ন এঁকেছে ওরা!'

রাগে লাল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ। 'শুটকি আর তার চেলাদের কাজ! নিশ্চয় কোন একটা ছেলে শুটকির কাছেও ফোন করে বলেছিল আমরা কি খুঁজছি। ব্যস, এখানে এসে তৈরি হয়ে বসেছিল টেরি। তার কোন একটা চেলা ফোনে আমাদেরকে ঠিকানা দিয়েছে এ-বাড়িটার।'

'খুব একখান গোল দিয়ে গেল আমাদেরকে, হারামজাদারা!' গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। 'খামোকা আটকেছ আমাকে! হাতের ঝাল মিটিয়ে নিতাম! পিটিয়ে তক্তা করে ফেলা উচিত ব্যাটাকে...!'

পরিস্থিতি খুব জটিল করে দিয়ে গেছে টেরিয়ার, এতে কোন সন্দেহ নেই। নীল প্রশ্নবোধকের আর কোন মূল্য নেই এ-মুহূর্তে। কোন বাড়িটায় যে রয়েছে কফিন, চিহ্ন দেখে বোঝার আর কোন উপায় নেই।

'কি করব আমরা এখন?' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব?'

'নিশ্চয় না!' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'প্রথমে দেখব, কতগুলো দরজায় প্রশ্নবোধক এঁকেছে শুটকি আর চেলারা। তারপর কি করা যায়, পরে বিবেচনা করব। তবে, ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবস্থার ভাল দিক বেশি হলেও দুর্বলতা কিছু রয়েছে। এটা নিয়ে ভাবতে হবে, পরে।'

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। বেশ কয়েকটা ব্লকে পাওয়া গেল প্রশ্নবোধক। হতাশ হয়ে ট্রাকের কাছে ফিরে এল ওরা, এরপর কি করবে তা নিয়ে ভাবতে বসল।

'গাড়ি নিয়ে ঘুরব,' বলল কিশোর। 'হয়ত জামান কিংবা মুসার চোখে পরিচিত কিছু পড়েও যেতে পারে। এতখানি এসে হাল ছেড়ে দেব না কিছুতেই। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ। ওয়েব আর স্মেথু কফিনটা একবার এ-এলাকা থেকে বের করে নিয়ে গেল, মমি রহস্য সমাধানের উপায় আর থাকবে না।'

ভারি মন নিয়ে ট্রাকে চড়ল ওরা। ক্যামেলট স্ট্রীট ধরে খুব ধীরে এগোল রোভার।

'মার খেয়ে গেলাম আমরা,' বিষণ্ণ মুসা। 'সেটা স্বীকার করে নিলেই তো পারি?'

'পাগল হয়েছ?' গম্ভীর কিশোর। 'তাহলে শুটকি আমাদেরকে আর টিকতে দেবে না রকি বীচে। যেখানে যাব, পেছন থেকে হাততালি দিয়ে হাসবে...ওইযে,

একটা গীর্জা। গতরাতে ওটা চোখে পড়েছিল?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল মুসা। 'তাছাড়া যেটা দিয়ে চলেছি, রাস্তাও এটা নয়। আরও অনেক সরু ছিল, একেবারে এঁদো গলি!'

'অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে তাহলে। রোভার, ডানে ঘুরুন, প্লীজ।'

'হোকে (ও-কে),' বলল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। শাঁই করে ডানে মোড় ঘোরাল ট্রাক। সরু একটা গলি পথে এসে পড়ল।

বড়জোর তিনটা ব্লক পেরিয়েছে ট্রাক, হঠাৎ কিশোরের আস্তিন খামচে ধরল মুসা। 'ওই যে, আইসক্রীমের দোকানটা, মনে হচ্ছে গত রাতে ওটার পাশ দিয়ে ছুটেছিলাম।' আঙুল তুলে দেখাল সে কোন-আইসক্রীম চেহারার ছোট বিল্ডিংটা।

'রোভার, থামুন,' বলল কিশোর।

থেমে গেল ট্রাক। দ্রুত নেমে পড়ল চার কিশোর। আইসক্রীম স্ট্যাণ্ডটার সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল।

'গতরাতে এটা দেখেছিলে? মনে পড়ে?' জামানকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হুঁ,' ওপরে নিচে মাথা দোলাল জামান। 'আমি ভেবেছিলাম, মন্দির। অন্য বাড়িগুলোর সঙ্গে চেহারা একেবারে আলাদা।'

রবিন হাসল, 'ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক অদ্ভুত জিনিসই দেখতে পাবে। কমলা আকৃতির কোন বিল্ডিং দেখলে, বুঝে নেবে ওখানে কমলার রস পাওয়া যায়। এই যে মন্দিরের চেহারা ওরকম দেখলে, বুঝতে হবে আইসক্রীম। আরও অনেক খাবার আছে, যেগুলোর আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে তৈরি হয় বিল্ডিংগুলো। বিজ্ঞাপনও হয়, লোকের বুঝতেও সুবিধে হয়, ওটা কিসের দোকান।'

আরও কিছু কথা জানার কৌতূহল হচ্ছিল জামানের, কিন্তু সময় নেই এখন।

আইসক্রীমের দোকানটা শুধু চিনল জামান আর মুসা, আশপাশের আর কিছু চিনতে পারল না। অন্ধকারে, উত্তেজনায় খেয়াল করেনি।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। 'রবিন, তুমি আর জামান এখানে থাক। ওয়াকি-টকি তৈরি রাখ। দরকার হলেই যাতে মেসেজ আদান-প্রদান করতে পার। মুসা, এই গলি, আর আশপাশের সব ক'টা কানা গলি খোঁজ। চিহ্ন দেখতে পেলেই রেডিওতে জানাবে। আমি যাচ্ছি উল্টোদিকে। খুঁজব। পেয়েও যেতে পারি ঠিক বাড়িটা। পুরো শহরতলীতে চিহ্ন আঁকতে পারেনি শুটকি, সেটা সম্ভবও নয়।'

'ঠিক আছে, দেখি চেষ্টা করে,' মাথা কাত করল মুসা।

'রোভার এখানেই ট্রাক রাখবে। এটাকেই ঘাঁটি ধরে নিতে হবে আমাদের। যে-ই ফিরে আসি, এখানে চলে আসব। সব সময় যোগাযোগ রাখব ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। ঠিক আছে?'

সায় জানাল সবাই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিগগিরই অন্ধকার নামবে। দুই গলি ধরে দু'দিকে রওনা

হয়ে গেল মুসা আর কিশোর। ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল রবিন আর জামান।

'কফিনটা যদি খুঁজে না পায় ওরা?' বলল জামান। 'তাহলে মমিটাও পাবে না। চিরদিনের জন্যে হারাব আমরা রা-অরকনকে। কি করে এই দুঃসংবাদ জানাব গিয়ে বাবাকে? না আমি বলতে পারব, না জলিল!'

কিশোরের কথা এখনও বিশ্বাস হয়নি জামানের, এখনও বিশ্বাস করছে রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। ব্যাপারটা নিয়ে চাপাচাপি করল না রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'জলিল কোথায়?'

'বাসায়ই বোধহয়,' জবাব দিল জামান। বলল, 'ব্যবসার কাজে নাকি ব্যস্ত থাকবে আজ। কয়েকজন কার্পেট-ব্যবসায়ী আসবে। জরুরি আলোচনা আছে তাদের সঙ্গে।'

কিসের কার্পেট-ব্যবসায়ী? দুই চোর মেথু আর ওয়েবের সঙ্গে দেখা করবে আসলে জলিল, ধরেই নিল রবিন। এমনিতেই বিষণ্ণ হয়ে আছে জামান। কথাটা জানিয়ে তাকে আরও দুঃখ দিতে ইচ্ছে হল না তার।

রবিন আর জামান কথা বলছে, ততক্ষণে কয়েকটা ব্লক দেখা হয়ে গেছে কিশোর আর মুসার। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। ব্যর্থতার কথা একটু পর পরই জানাচ্ছে একে অন্যকে। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। চকের দাগ দেখাই যাবে না আর এখন।

'পারলে আরও একটা গলি দেখ, সেকেণ্ড,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তারপর ফিরে এস ট্রাকের কাছে। আলোচনা করে ঠিক করব, এরপর কি করা যায়!'

'বুঝেছি,' খুদে স্পীকারে জবাব এল মুসার। 'আউট।'

পরের গলিটা ধরে এগিয়ে চলল কিশোর। এর আগে যে কয়েকটা গলি দেখেছে, ওটাও ওগুলোর চেয়ে আলাদা নয়। একই রকম দেখতে। ওই রকমই পুরানো ধাঁচের বাড়ি, দোকানপাট—বেশির ভাগই বন্ধ। ব্যবসা নিশ্চয় এদিকে ভাল জমে না। তাই সন্ধ্যার আগেই দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি চলে গেছে দোকানদাররা।

গলির প্রায় শেষ মাথায় বড় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। বড় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক। পুরানো। নীল শরীর, জায়গায় জায়গায় চটে গেছে রঙ। দরজাটা তুলে দিয়েছে একজন লোক। কাজেই ওটাতে প্রশ্নবোধক আঁকা আছে কিনা, জানার উপায় নেই। দাঁড়িয়ে থেকেও লাভ নেই। ঘুরতে যাবে ঠিক এই সময় কানে এল কথা।

'মেথু, ট্রাক ঢোকাও ভেতরে,' বলল একজন।

'ঢোকাচ্ছি।' ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটার গলা শোনা গেল, 'দরজার কাছ থেকে সর। এই ওয়েব···হ্যাঁ, সর, আরও।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার কিশোর। মেথু! ওয়েব! ট্রাক। বড় দরজা, বড় বাড়ি। আর কোন সন্দেহ নেই। এবাড়িটাই খুঁজছে ওরা।

পনেরো

ছুটে ট্রাকের পাশে চলে এল কিশোর। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ট্রাক। হেড লাইট জ্বালায়নি। গাঢ় অন্ধকার।

বাঁ পাশে রয়েছে ওয়েব। ট্রাকের ডান থেকে এগোল কিশোর। দরজার ফ্রেম আর ট্রাকের বডির মাঝে মাত্র দু'ফুট ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

পুরো শরীরটা ভেতরে ঢুকে গেল ট্রাকের, থেমে দাঁড়াল। কিশোর দাঁড়িয়ে পড়ল ওটার পাশে, অন্ধকারে।

'দরজা নামিয়ে দিচ্ছি আমি,' শোনা গেল ওয়েবের গলা! 'তারপর হেডলাইট জ্বালাবে। নইলে অন্ধকারে কিচ্ছু দেখতে পাব না।'

ট্রাকের পাশে উবু হয়ে আছে কিশোর। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। আলো জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে পারবে না। তাহলে চোরদের চোখে পড়ে যাবে। এর আগেই লুকিয়ে পড়তে হবে কোথাও। কোথায়?

বেশি ভাবনা চিন্তার সময় নেই। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝেতে! গড়িয়ে চলে এল ট্রাকের তলায়। দরজা নামানর প্রচণ্ড শব্দে ঢাকা পড়ে গেল তার গড়ানর মৃদু আওয়াজ। মুহূর্ত পরেই জ্বলে উঠল হেডলাইট। আলোকিত হয়ে উঠল ঘরের অনেকখানি। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কিশোরের। তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে পুরানো আমলের গাড়িটার চাকা আর কফিনের ওপরের ক্যানভাস ঠিকই চোখে পড়ল।

ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে কিশোর। সাহায্য দরকার, সঙ্গে রেডিও আছে, কিন্তু সাহায্য চাইবার উপায় নেই। কথা বললেই শুনে ফেলবে চোরেরা।

চুপচাপ পড়ে আছে কিশোর। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন বুকের ভেতর। ভয় হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ না আবার শুনে ফেলে দুই চোর।

ট্রাক থেকে নেমে এল মেথু। মাত্র ছয় ফুট দূরে দুই জোড়া পা দেখতে পাচ্ছে কিশোর।

'মক্কেল ব্যাটা রাজি হল তাহলে!' হাসল মেথু। 'জানতাম, হবে। কফিনটা পাওয়ার জন্যে যা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! কিন্তু এই বাক্স দিয়ে কি করবে ব্যাটা?'

'ওই ব্যাটাই জানে!' বলল ওয়েব। 'জান তো, কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে? হলিউডের বাইরে। একটা খালি গ্যারেজ দেখিয়ে দিয়েছে। ওর ভেতরে ঢুকে যেতে হবে ট্রাক নিয়ে।'

'তাই নাকি?'

'আরও আছে। ওর ধারণা, আমাদেরকে অনুসরণ করা হবে? ভয় পাচ্ছে। খুব সতর্ক থাকতে বলেছে আমাদেরকে। যদি দেখে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাহলে যেন মাল ডেলিভারি না দিই, এ কথাও বলে দিয়েছে।'

'ব্যাটার মাথা খারাপ!' তীক্ষ্ণ শোনাল মেথুর গলা। 'কে অনুসরণ করতে আসবে আমাদের? কেউ জানেই না কিছু। আমরা ডেলিভারি দেবই। টাকা ভীষণ দরকার।'

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। যদি দেখি অনুসরণ করা হচ্ছে না, তাহলে মাঝপথে থেমে ফোন করে তাকে জানাতে হবে। দরকার মনে করলে, ডেলিভারির ঠিকানা বদল করবে সে।'

'গরু পেয়েছে আমাদেরকে! এত বদলা-বদলি করতে পারব না। তাহলে আরও বেশি টাকা লাগবে।'

'আসল কথাটা তো শোনাইনি এখনও। ডেলিভারি দেয়ার পর আবার মালদুটো নিয়ে আসতে হবে ওর ওখান থেকে। নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে কোনরকম চিহ্ন না থাকে। আর সেজন্যে সে আরও এক হাজার ডলার দেবে আমাদেরকে।'

'আরও এক হা–জা–র! তাহলে জিনিস দুটো চাইছে কেন? পুড়িয়েই যদি ফেলবে?'

'জানি না। হয়ত কোন কারণে ভয় পেয়ে গেছে। নষ্ট করে ফেলতে চাইছে এখন। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ও থাকতে পারে। যা খুশি করুকগে আমাদের টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। পেলেই হল। এস, তুলে নিই এটা ট্রাকে।'

কফিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুই জোড়া পা। আলো পড়েছে ওটার ওপর, দেখতে পাচ্ছে কিশোর। টান দিয়ে ক্যানভাস তুলে ফেলল একজন। আরেকজন ঝুঁকল কফিনটার ওপর।

'দাঁড়াও,' বলে উঠল ওয়েব। 'খুলে আগে দেখে নিই। ব্যাটা এত পাগল কেন! নিশ্চয় মূল্যবান কিছু আছে এর ভেতর!'

ঢাকনা তুলে ফেলল দু'জনে মিলে। বাক্সের ভেতরের চারধার আর তলায় হাত চালিয়ে দেখল।

'না,' বলল ওয়েব। 'কিচ্ছু নেই। ধর, ট্রাকে তুলে ফেলি।'

আবার জায়গামত ঢাকনাটা বসাল ওরা। এক প্রান্ত থেকে ঠেলে নিয়ে এল ট্রাকের পেছনে। তুলতে গিয়ে দেখল, দরজা আর ট্রাকের পেছনে খুব একটা ফাঁক নেই। জায়গা হচ্ছে না, তাই তোলা যাচ্ছে না কফিনটা।

'আরও সামনে বাড়াতে হবে ট্রাক,' বলল ওয়েব। 'অল্প একটু বাড়ালেই চলবে।'

'তুমি বাড়াও। আমি পানি খেয়ে আসি,' বলে একদিকে চলে গেল মেথু।

ড্রাইভিং সিটে বসল ওয়েব। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কয়েক ফুট সামনে বাড়াল ট্রাক। কিশোরের ওপর থেকে সরে চলে গেছে।

বেকায়দায় পড়ে গেল কিশোর। রেডিওতে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কোণের কোন একটা জিনিসের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাহলে চলে যাবে ট্রাকটা। ওটাকে অনুসরণ করার কোন উপায় থাকবে না। ট্রাকের ভেতরে উঠে বসে থাকতে পারে। কিন্তু কফিনটা তোলার সময়ই তাকে দেখে ফেলবে চোরেরা।

ভাবনার ঝড় বইছে কিশোরের মাথায়। কোন উপায় দেখছে না। লুকিয়ে থেকে ট্রাকটাকে অনুসরণ করতে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, অথচ চোরদের চোখে পড়া চলবে না. একই সঙ্গে সবগুলো করা অসম্ভব মনে হচ্ছে তার কাছে। অথচ যেভাবেই হোক করতেই হবে।

তারপর, হঠাৎই বুঝে গেল কিশোর, কি করতে হবে।

এখনও ফেরেনি মেথু। ড্রাইভিং সিটেই বসে আছে ওয়েব। হামাগুড়ি দিয়ে কফিনটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। আস্তে করে ঢাকনার একদিক ফাঁক করে বান মাছের মত পিছলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আবার নামিয়ে দিল ঢাকনা। তবে, আগে ফাঁকের মধ্যে একটা পেন্সিল ঢুকিয়ে নিল, মুসা যা করেছিল। বাতাস চলাচল দরকার।

আর কিছুই করার নেই। এখন শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকা। দুরু-দুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল কিশোর।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসেছে মুসা। চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর জামানের সঙ্গে। সবাই উদ্বিগ্ন। কিশোরের কাছ থেকে শেষ নির্দেশ আসার পর অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। আর কোন সাড়া নেই। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করছে রবিন আর মুসা। কিন্তু একেবারে নীরব গোয়েন্দাপ্রধান। হল কি? কোন বিপদে পড়ল?

তারপর হঠাৎ করেই কথা বলে উঠল স্পীকার। 'ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! মুসা, শুনতে পাচ্ছ?'

'সেকেণ্ড বলছি। শুনতে পাচ্ছি, ফার্স্ট। কি হয়েছে?'

'যে ট্রাকটাকে খুঁজছ, ওটা এখন হলিউডের দিকে ছুটছে।' ভেসে এল কিশোরের গলা। 'নীল, রঙ-চটা, দুই টনী ট্রাক। লাইসেন্স নাম্বারঃ পি এক্স সাতশো পঁচিশ। এখন সম্ভবত পেইন্টার স্ট্রীট ধরে পশ্চিমে ছুটেছে। শুনতে পেয়েছ?'

'পেয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ওরা এখন পেইন্টার স্ট্রীটেই দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের জোরাল গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, মাত্র কয়েকটা ব্লক দূরে আছে সে।

'এখুনি পিছু নিচ্ছি ওটার, ফার্স্ট,' বলল মুসা। 'তুমি কোথায়?'

'গতরাতে তোমরা যেখানে ছিলে,' জবাব এল।

'কফিনের ভেতরে?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'এবং ডালাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা,' বলল কিশোর। 'বেরোতে পারব না। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোন উপায় নেই, রেডিও ছাড়া। ট্রাকটাকে চোখের আড়াল করবে না কিছুতেই। তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার শিগগিরই।'

'পেছনে লেগে থাকব,' বলেই ঘুরল মুসা। দ্রুত নির্দেশ দিল সঙ্গীদেরকে।

তাড়াহুড়ো করে ট্রাকে উঠে পড়ল তিনজনে। কি করতে হবে, রোভারকে বলল মুসা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েই বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। উল্টো দিকে নাক ঘুরে গেল ট্রাকের। তীব্র গতিতে পেরিয়ে এল কয়েকটা ব্লক। দেখা পেল নীল ট্রাকের। মিলে গেল লাইসেন্স নাম্বার। সন্দেহ নেই, ওটাতেই আছে কিশোর পাশা। আধ ব্লক মত পেছনে সরে এল রোভার। ওই দূরত্ব রেখেই অনুসরণ করে চলল। এখানে রাস্তায় আলো আছে ভালই, নীল ট্রাকটাকে চোখে চোখে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

'তোমার আধ ব্লক পেছনে রয়েছি, ফার্স্ট,' ওয়াকি-টকিতে জানাল মুসা। 'ঠিক কোথায় যাচ্ছে ট্রাকটা, জান?'

'জানি না,' জবাব এল কিশোরের। 'তবে হলিউডের বাইরে কোন একটা গ্যারেজে। কোন ধরনের গ্যারেজ তা-ও বলতে পারব না।'

'সিনেমা দেখছি যেন!' উত্তেজিত হয়ে উঠছে জামান। 'তবে আরও বেশি রোমাঞ্চকর! কিন্তু কিশোরের কি হবে? যদি হারিয়ে ফেলি আমরা ট্রাকটাকে?'

'ট্রাকটাকে চোখের আড়াল করা যাবে না কিছুতেই,' বিড়বিড় করল রবিন।

বেশ কয়েক মাইল পেরিয়ে এল ওরা। নীল ট্রাকটা এখনও আধ ব্লক দূরে। হঠাৎ গতি বেড়ে গেল ওটার? কোন রকম সন্দেহ হয়েছে? অনুসরণ করা হচ্ছে, বুঝতে পেরেছে?

অনেক দেরিতে বুঝল ওরা কারণটা। সামনে রেল লাইন। ট্রেন আসছে। ব্যারিয়ার পড়তে শুরু করেছে রেলগেটে। শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে চলে গেল নীল ট্রাক। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যারিয়ার ওপরে থাকতে থাকতে পৌঁছতে পারল না রোভার। আটকা পড়ে গেল এপাশে।

'ফার্স্ট!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমরা আটকা পড়ে গেছি। মালগাড়ি। মাইলখানেকের কম হবে না লম্বা! চলেছেও খুব ধীরে ধীরে। তোমাদেরকে বোধহয় হারালাম। শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি!' শোনা গেল কিশোরের গলা। 'সেকেণ্ড!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। 'মোড় নিয়েছে ট্রাক! দিক-টিক কিচ্ছু বলতে পারব না! কোন রাস্তা দিয়ে যে

চলেছি···' মৃদু হতে হতে মিলিয়ে গেল কথা।

'ফার্স্ট।' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি না! মনে হয় রেঞ্জ বেড়ে গেছে! কিশোর?'

কোন জবাব নেই।

আরেকবার চেষ্টা করল মুসা। জবাব পেল না। দুটো ট্রাকের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে, বুঝতে পারল। ওয়াকি-টকির রেঞ্জের মধ্যে নেই কিশোর।

ষোলো

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করল কিশোর কয়েক মিনিট। স্পীকারে আসছে না মুসার গলা। নিশ্চয় রেঞ্জের বাইরে পড়ে গেছে। কল্পনা করতে পারছে ও, ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসছে রোভার। চারজোড়া চোখ উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজছে নীল ট্রাকটাকে। কিন্তু অন্ধকারে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বিশৃঙ্খলা পথে এটাকে খুঁজে পাওয়া ওদের জন্যে কঠিন।

আবার মেসেজ পাঠানর চেষ্টা করল কিশোর। 'ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! শুনতে পাচ্ছ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল জবাব। কিন্তু মুসা নয়। একটা অচেনা গলা। অন্য কোন কিশোরের। 'হ্যাল্লো, কে বলছ? এসব ফার্স্ট সেকেণ্ডের মানে কি? কোন রকম খেলায় মেতেছ? তাহলে আমাকেও অংশী নাও।'

'শোন,' দ্রুত বলল কিশোর। 'খেলা নয়, এটা ভয়ানক বিপদ। আমার হয়ে পুলিশকে মেসেজ দিতে পারবে?'

'পুলিশ? কেন?'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করতে পারবে না ছেলেটা। রসিকতা ধরে নিতে পারে। হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলতে হবে তাই। 'একটা ট্রাকের পেছনে রয়েছি, আটকে গেছি। চালক আর তার সঙ্গী জানে না। বেরোতে চাই আমি। পুলিশকে ডাক। ওরা ট্রাকটা থামিয়ে আমাকে বের করে নিক।' সে বুঝে গেছে, এখন বাইরের সাহায্য অবশ্যই দরকার। একমাত্র পুলিশের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সেটা।

'ঠিক আছে, জানাচ্ছি পুলিশকে,' জবাব দিল ছেলেটা। 'লুকিয়ে গাড়ি চড়তে গিয়েছিলে, এখন পড়েছ আটকা এই তো?···জলদি কথা বল! নইলে শিগগিরই রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে! গাড়িটার কি রঙ? নাম্বার কত?'

'বলছি, ভাল করে শোন,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'নীল ট্রাক, দুই টনী। নাম্বার···'

'কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!' শোনা গেল ছেলেটার গলা। 'আরও জোরে বল!'

'আমি শুনতে পাচ্ছি,' বলল কিশোর। 'শুনছ? শুনছ?'

'হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!' শোনা গেল ছেলেটার গলা। চিৎকার করে কথা বলছে। 'চুপ হয়ে গেলে কেন! যন্ত্রে গোলমাল!...নাকি ট্র্যান্সমিটিং রেঞ্জের বাইরে চলে গেছ...' মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল তার গলা।

হতাশ হয়ে পড়ল কিশোর। এবার কি করবে? ওয়াকি-টকিটা শার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। মুক্তি পাওয়ার কোন একটা উপায় বের করতে হবে। কিন্তু কোন বুদ্ধি এল না মাথায়। দড়ি দিয়ে শক্ত করে কফিনের সঙ্গে ঢাকনাটা বেঁধে রেখেছে মেথু আর ওয়েব।

ফাঁক আছে, বাতাস চলাচল করছে যথেষ্ট, সেদিক থেকে কোন ভয় নেই। ভয় পাচ্ছে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ট্রাক থামলে, মেথু আর ওয়েব কফিনের ঢাকনা খোলার পর কি ঘটবে ভেবে, ঢোক গিলল সে। ঘামতে শুরু করল। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, তিন দুর্বৃত্ত ঘিরে দাঁড়িয়েছে কফিনটা। অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তার সাক্ষীতে তিনজনই জেলে যাবে। এবং সেখানে কিছুতেই যেতে চাইবে না ওরা। সুতরাং একটাই কাজ করবে ওরা। নিশ্চিহ্ন করে দেবে সাক্ষীকে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই তাদের জন্যে।

চিন্তার মোড় ঘোরাল কিশোর। কি করে ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে? যদি ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দৌড় দেয়? অবাক হয়ে যাবে ওরা! কয়েক মুহূর্ত দেরি করে ফেলবে সক্রিয় হয়ে উঠতে। এই সুযোগে কি পালিয়ে যেতে পারবে?

মনে হয় না!—ভাবছে কিশোর। ওরা তিনজন। যেদিকেই ছোটার চেষ্টা করুক সে, কারও না কারও হাতে ধরা পড়বেই।...আচ্ছা, তার চাচা-চাচী কি কাঁদবে তার জন্যে? মন খারাপ করবে? মেরিচাচী নিশ্চয় কাঁদবে, এতে কোন সন্দেহ নেই তার। চাচাও কাঁদবে গোপনে। আর তার বন্ধুরা? মুসা আর রবিন?

ভাবতে ভাবতে গলার কাছে কি যেন দলামত একটা উঠে এল কিশোরের। এই সুন্দর পৃথিবীতে আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই তার...ঠিক এই সময় ছিন্ন হয়ে গেল চিন্তাসূত্র। থেমে গেছে ট্রাক। উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর। ধ্বক করে উঠেছে বুকের ভেতর। এসে গেছে সময়। যে-কোন মুহূর্তে উঠে এসে কফিন নামিয়ে নেবে মেথু আর ওয়েব।

কিন্তু এল না ওরা। মিনিট পাঁচেক পর আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। মনে পড়ে গেল কিশোরের, অর্ধেক পথ এসে মক্কেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার কথা দুই চোরের। নতুন নির্দেশ থাকলে, জেনে নেবে।

আবার নানারকম ভাবনা এসে ভিড় করল কিশোরের মনে। অতীতের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে, অনেক সুখের মুহূর্ত। অনেক কিছুই ভাবল সে, কিন্তু মুক্তির কোন উপায় বের করতে পারল না। সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি কিশোর।

আবার কতক্ষণ পর থামল ট্রাক, বলতে পারবে না।

লোহার দরজা উঠে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আবার কিশোর। টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু। চলে গেছে বিষণ্ন ভাবটা। শুয়ে শুয়ে কাপুরুষের মত মরবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবে। তবে, প্রথমে দৌড়ে পালানর চেষ্টা করবে।

ট্রাকের দরজা খুলে গেল। ভারি পায়ের শব্দ। উঠে এসেছে মেথু আর ওয়েব। নড়ে উঠল কফিন।

'অদ্ভুত একটা কাণ্ড, জান!' শোনা গেল ওয়েবের গলা। 'স্টোর রুমে যখন ঠেলেছিলাম, একেবারে হালকা মনে হয়েছিল কফিনটা। যখন তুলতে গেলাম ট্রাকে, বেজায় ভারি। এখনও তাই!'

অন্য সময় হলে, খুব একচোট হেসে নিত কিশোর। ওয়েবের বিস্মিত চেহারা সহজেই কল্পনা করতে পারছে। কফিনটার ওজন অন্তত একশো পাউণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে সে। এই ওজন অবাক করবেই ওয়েব কিংবা মেথুকে। সামনে ভয়ানক বিপদ, তাই হাসতে পারল না কিশোর।

ধরাধরি করে নামানো হল কফিনটা।

শোনা গেল তৃতীয় আরেকটা গলা। 'গ্যারেজের ভেতরে নিয়ে এস, জলদি!' চাপা কণ্ঠস্বর, কিন্তু কেমন যেন পরিচিত মনে হল কিশোরের। এর আগে কোথাও শুনেছে! কোথায়?

আবার শূন্যে উঠল কফিন। খানিক পরেই পুপ্‌প্‌ করে নামানো হল আবার। সিমেন্টের মেঝেতে নামিয়েছে।

'গুড,' বলল তৃতীয় কণ্ঠ। মুখে রুমাল চেপে আছে নাকি! এমন চাপা কেন? 'মিনিট দশেকের জন্যে বাইরে যাও তোমরা। তারপর এসে নিয়ে যাবে মমি আর কফিন। আজই নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।'

'আগে টাকা, তারপর বেরব,' গোঁয়ারের মত বলে উঠল ওয়েব। 'টাকা দাও, নইলে ছুঁতেও দেব না এটা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল তৃতীয় কণ্ঠ। 'অর্ধেক পাবে এখন। পোড়াতে নিয়ে যাওয়ার আগে দেব বাকিটা।'

খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দড়ি খুলছে ওয়েব কিংবা মেথু। কফিনটাও নড়ে উঠল একবার।

'আরে, দড়ি নিচ্ছ কোথায়?' বলল মেথু। 'এখানেই থাক। আবার বেঁধে নিতে হবে না কফিনটা?'

'চল, টাকা নেবে,' বলল তৃতীয় কণ্ঠ। 'আহ্, জলদি এস!'

দরজা নামানর শব্দ শুনল কিশোর। তারপর নীরবতা। ঘরে আর কেউ নেই, বোঝাই যাচ্ছে। আস্তে করে ঢাকনা তুলে উঁকি দিল সে। আবছা অন্ধকার। কাচের

বন্ধ শার্সি দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে ম্লান হয়ে। একটা গ্যারেজ, প্রাইভেট গ্যারেজ। ঘরে আর কেউ নেই। সাবধানে কোন রকম আওয়াজ না করে বেরিয়ে এল সে। জায়গামত নামিয়ে দিল আবার কফিনের ঢাকনা। ঠিক এই সময় আবার দরজা উঠতে শুরু করল।

তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল কিশোর। অর্ধেক উঠেই থেমে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকল এক লোক। টেনে আবার নামিয়ে দিল দরজা। উজ্জ্বল আলো থেকে এসেছে, বোধহয় সেজন্যেই আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরকে দেখতে পেল না সে। ঘুরে এগিয়ে গেল কফিনের দিকে। হাতের তালু ডলছে।

'অবশেষে পেলাম!' বিড়বিড় করে বলল লোকটা কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে। 'এতগুলো বছর পর!' পেকেট থেকে একটা টর্চ বের করে আলো ফেলল কফিনটার ওপর। খুব বেশি সতর্ক, তাই গ্যারেজের আলো জ্বালছে না।

উবু হয়ে ঢাকনা তুলে নামিয়ে রাখল কাত করে, কফিনের গায়ে ঠেস দিয়ে। ঝুঁকে হাত বোলাতে শুরু করল কফিনের ভেতরের দেয়ালে। অনুভবে বোঝার চেষ্টা করছে কিছু।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল যেন কিশোর। দুই লাফে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে কফিনের ভেতর। ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পা দুটো। ঢাকনাটা তুলেই বসিয়ে দিল জায়গামত। তারপর চড়ে বসল ওটার ওপর। মূল অপরাধীকে আটকে ফেলেছে : এরপর কি করবে? কতক্ষণ রাখতে পারবে আটকে?

ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে লোকটা। চেঁচাচ্ছে। তবে খুব বেশি শোনা যাচ্ছে না চিৎকার। ঢাকনা বন্ধ, বাতাস চলাচল করতে পারছে না। গ্যারেজের দরজা নামানো। কিশোরই শুনতে পাচ্ছে না ভালমত, বাইরে থেকে শুনতে পাবে না মেথু কিংবা ওয়েব?

ঢাকনাসুদ্ধ কিশোরকে ঠেলে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে লোকটা। একেবারে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ঢাকনা, চেপে আবার নামিয়ে দিচ্ছে কিশোর। ঘামছে দরদর করে। খুব বেশিক্ষণ এভাবে আটকে রাখতে পারবে না, বুঝতে পারছে। ছুটে গিয়ে দরজা তুলতে সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে বেরিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলবে লোকটা। বাইরে নিশ্চয় পাহারায় রয়েছে দুই চোর। ওরাও মক্কেলের সাহায্যে ছুটে আসবে। সুতরাং ঢাকনায় চেপে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। তবে সেটাও নিরাপদ নয়। দশ মিনিট পর এসে কফিনটা নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আসবে মেথু আর ওয়েব। তারমানে, খামোকাই কষ্ট করছে কিশোর। ঠেকাতে পারবে না ওদেরকে শেষ অবধি।

সতেরো

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল অনেক মানুষের গলা। চিৎকার। হুঁশিয়ারি। গাড়ির হর্নের শব্দ। আরও চেঁচামেচি। ধুপধাপ শব্দ। মারামারি করছে যেন কারা!

বাইরের দিকে খেয়াল করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হয়ে পড়ল কিশোর। এই সুযোগে এক জোর ধাক্কায় ঢাকনাসহ কাত করে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল তাকে লোকটা। তাড়াতাড়ি সামলে নিল কিশোর। চাপ বাড়াল আবার ঢাকনাটায়। ঠিক এই সময় ঘট-ঘটাং আয়াজ তুলে উঠে গেল দরজা।

'কে ওখানে!' অন্ধকারে শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ। আলোর সুইচ খুঁজে পেল লোকটা। জ্বলে উঠল আলো। দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। রোভার।

হঠাৎ করেই কফিনের তলায় ঠেলাঠেলি থামিয়ে দিয়েছে বন্দী। মিটমিট করে দরজার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। রোভারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, রবিন, জামান, প্রফেসর বেনজামিন আর জলিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই তার দিকে।

অবশেষে কথা ফুটল রোভারের, 'কিশোর, তুমি হোকে?'

'হোকে,' মাথা নাড়াল কিশোর। তার কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই, এমনকি রোভারও। জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমরা এলে কি করে? চোর দুটো কোথায়?'

জবাবটা দিল রবিন। 'তোমাদের ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেললাম...' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রচণ্ড ঠেলা লাগাল কফিনের ঢাকনায়। প্রায় পড়ে যেতে যেতে আবার সামলে নিল কিশোর। বিস্মিত চোখে কফিনের দিকে চেয়ে বলল রবিন, 'ভেতরে কি!'

'হ্যাঁ, কি?' রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন প্রফেসর। গোল্ডরিম চশমার কাচের ওপাশে গোল গোল হয়ে উঠছে তাঁর চোখ।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিশোর। 'নাটের গুরু। দুই মাস আগে যে এই খেল শুরু করেছিল। সেই জ্যোতিষ, যে গিয়েছিল লিবিয়ায় জামানদের বাড়িতে। বিশ্বাস করিয়েছিল, রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। মমিসহ কফিনটা চুরির প্রেরণা জুগিয়েছে জামান আর জলিলকে।'

'জ্যোতিষ! সেই জ্যোতিষ!' চেঁচিয়ে উঠল জামান। 'কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'অসম্ভব!' জলিলও চেঁচিয়ে উঠল। 'এ হতেই পারে না! ওই জ্যোতিষ রয়ে গেছে লিবিয়ায়!'

'নিজের চোখেই দেখতে পাবেন কোথায় রয়ে গেছে,' জলিলের দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'পালানর চেষ্টা করলে রুখবেন আপনাদের জ্যোতিষকে।'

আস্তে করে ঢাকনার ওপর থেকে নেমে এল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ডালা, কাত হয়ে পড়ল একপাশে। প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চেহারা ফেকাসে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'জ্যোতিষ!' চেঁচিয়ে উঠল জামান। 'ও জ্যোতিষ নয়। সে লোকটা বুড়ো ছিল! চুলদাড়ি সব সাদা! এক চোখ কানা! কুঁজো! এ তো রীতিমত জোয়ান!'

'ছদ্মবেশে গিয়েছিল তোমাদের বাড়িতে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

হাঁ হয়ে গেছেন যেন প্রফেসর, মুসা আর রবিন। বোকার মত চেয়ে আছে কফিনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে।

'উইলসন!' বিড়বিড় করলেন অবশেষে প্রফেসর।

'হ্যাঁ, উইলসন,' জবাব দিল কিশোর। 'জামানদের প্রিয় জ্যোতিষ। মিসেস চ্যানেলের বেড়াল-চোর। মমিচোর! কফিনচোর।'

'ও চোর! উইলসন চোর!' বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন প্রফেসর বেনজামিন। 'কিন্তু সে কেন চোর হবে? এসব কেন চুরি করতে যাবে?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা কাত করলেন উইলসন। 'ছেলেটা ঠিকই বলেছে। আমি চোর। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই অপেক্ষা করে আছি মমি আর কফিনটার জন্যে। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। হাতে পেয়েও হারালাম দশ লক্ষ ডলার! কে জানে, বিশ কিংবা তিরিশ লক্ষও হতে পারে!'

'হ্যাঁ!' সামনে বাড়াল জলিল। কঠোর চোখে চেয়ে আছে উইলসনের দিকে। 'ও-ই সেই জ্যোতিষ! গলার স্বর, কথা বলার ধরন!···এখন চিনতে পারছি! এই লোকই গিয়েছিল আমার মনিবের বাড়িতে। বুঝিয়েছে, রা-অরকন তাঁদের পূর্বপুরুষ। ঠকিয়েছে ওদেরকে। লোকটা একটা ভণ্ড, শয়তান, মিথ্যুক!' থুথু ছিটিয়ে দিল সে উইলসনের মুখে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে ফেলল উইলসন। করুণ হয়ে উঠেছে চেহারা, কেঁদে ফেলবে যেন। 'এসব আমার পাওনা!' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে মুখ তুললেন। 'প্রফেসর, শুনতে চান, কেন মমি আর কফিনটার জন্যে চোর হয়েছি আমি?'

'নিশ্চয়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'ইচ্ছে করলেই, যখন খুশি আমার ওখানে গিয়ে মমিটা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারতে তুমি। চুরি করতে গেলে কেন?'

হাত তুলল কিশোর। 'এক মিনিট। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। মেথু আর ওয়েবকে ধরা হয়েছে?'

'বাইরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছি ব্যাটাদের,' জবাব দিল রোভার।

'ছুটতে পারবে না তো?'

মাথা নাড়ল রোভার।

উইলসনের দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনার কথা এবার বলুন।'

'আসলে, মমিটা মোটেই চাইনি আমি,' কফিন থেকে নেমে এল উইলসন। 'আমার দরকার ছিল এই কাঠের বাক্সটা। প্রফেসর, রা-অরকনের মমিটা যেদিন আবিষ্কার করলেন, আমার বাবা ছিল আপনার সঙ্গে।'

'ছিল,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'খুব ভাল মানুষ ছিল। কায়রোর বাজারে খুন হল বেচারা!'

'সেদিন আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন বাবা,' বলল উইলসন। 'যা আপনি জানেন না। জানানো হয়নি আপনাকে। সমাধি মন্দিরে বসে কফিনটা পরীক্ষা করছিল বাবা। গোপন একটা কুঠুরি পেয়ে গেল কফিনে, হঠাৎ করেই। ছোট একটা কাঠের টুকরো দিয়ে বন্ধ ছিল কুঠুরির মুখ। ওটার ভেতরে আছে···দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।' যন্ত্রপাতির বাক্স খুলে ছোট একটা করাত বের করে নিয়ে এল ভাষাবিদ। একপাশে কাত করে ফেলল কফিনটা। একটা জায়গায় করাত বসাতে যাবে, হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর বেনজামিন।

'না না, ওকাজ কোরো না!' চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর। 'কফিনটা খুব মূল্যবান অ্যানটিক, তুমিই বলেছ!'

'ভেতের যা আছে, তার তুলনায় কিছু না,' মলিন হাসি ফুটল উইলসনের ঠোঁটে। 'তাছাড়া, এক টুকরো কাঠ আপনার দরকার এটা থেকে, কার্বন টেস্টের জন্যে। কাঠের টুকরোটা শক্ত আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছিল বাবা। করাত দিয়ে না কেটে ওটা খোলা যাবে না। সত্যি বলছি, কাটা ছাড়া খোলা গেলে এটা চুরি করার দরকার হত না। আপনার বাড়িতেই কোন এক ফাঁকে খুলে ভেতরের জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসতে পারতাম।' কফিনে করাত বসিয়ে চালাতে শুরু করল ভাষাবিদ। কাজ করতে করতেই বলল, 'আমার বাবা, একটা চিঠি লিখেছিল আমার কাছে। তাতে লেখা ছিল সব কথা। তার মৃত্যুর পরে ওই চিঠি এসে হাতে পৌঁছে আমার। আমি তখন কলেজে পড়ছি। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিশরে। কিন্তু তখন কায়রো জাদুঘরে মমিসহ কফিনটা জমা দিয়ে ফেলেছেন আপনি। আমার আর কিছুই করার থাকল না। অপেক্ষা করে রইলাম, বছরের পর বছর। তারপর, মাস দুই আগে খবর পেলাম, কায়রো জাদুঘর থেকে আপনার নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মমিটা। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেলাম মিশরে। অনেক খুঁজে বের করলাম এক সম্ভ্রান্ত, ধনী ব্যাবিলিয়ান পরিবারকে, যাঁরা নিজেদেরকে ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করে। জ্যোতিষের ছদ্মবেশে গিয়ে একদিন হাজির হলাম তাঁদের বাড়িতে। সহজেই বিশ্বাস করিয়ে ফেললাম, রা-অরকন তাঁদের পূর্বপুরুষ। বোঝালাম, যে করেই হোক, মমিটা আমেরিকান প্রফেসরের কাছ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে নেয়া উচিত। আমি চেয়েছিলাম, মিস্টার জামান লোক পাঠাক আপনার কাছে মমিটা নেয়ার জন্যে।

ওরা এলে আপনি ফিরিয়ে দেবেন, খুব ভাল করেই জানিঃ তারপর লোক দিয়ে চুরি করাতাম ওটা, আপনি কিংবা পুলিশ ভাবত, লিবিয়ান ওই ব্যবসায়ীই চুরি করিয়েছে মমিটা। সব দোষ তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ত। আমি থেকে যেতাম আড়ালে। হয়ত বিশ্বাস করবেন না, প্রফেসর, চুরি করতে খুব খারাপ লাগছিল আমার। তাই সেটা না করে যাতে কাজ হাসিল হয়ে যায়, সেজন্যে অনেক ভেবে আরেক উপায় বের করেছিলাম। মমিটাকে কথা বলিয়েছি। ভেবেছি, ভয় পেয়ে আপনি ওটা ফেলে দেবেন, কিংবা কিছু একটা করবেন। আমি কফিনটা থেকে জিনিসগুলো হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ পাব। অথবা, প্রাচীন ভাষা বুঝতে না পেরে আমাকে ডাকবেন। ডেকেছেনও। কিন্তু আমি আপনাকে মমিটা আমার বাড়িতে আনতে দিতে রাজি করাতে পারলাম না। তাহলেও চুরির দরকার পড়ত না। জিনিসগুলো খুলে নিয়ে আবার আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিতাম। কিন্তু সেটাও হল না। আপনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না মমি। কি আর করব? বেপরোয়া হয়ে...'

'চুরি করেছ!' ধমকে উঠলেন প্রফেসর বেনজামিন। 'খুব ভাল কাজ করেছ! বাপের নাম রেখেছ! গাধা কোথাকার! তোমার বাপও ছিল একটা গাধা! আমাকে সব কথা খুলে বললেই পারত! তুমি না জানতে পার, কিন্তু তোমার বাপ তো জানত, টাকার কাঙাল আমি কখনও ছিলাম না, এখনও নই।'

মুখ নিচু করে করাত চালাচ্ছে উইলসন। খুলে আনল ছোট একটা টুকরো। একটা ফোকরের মুখ বেরিয়ে পড়ল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে।

সব ক'টা চোখ উইলসনের হাতের দিকে। ফোকর থেকে কি বের হয়ে আসে দেখার জন্যে উদগ্রীব।

হাত বের করে আনল উইলসন। একটা কাপড়ের পুটুলি, ছোট। সাবধানে পুটুলিটা খুলল মেঝেতে রেখে। কাপড় সরাল। আলোয় জ্বলে উঠল যেন তরল আগুন। লাল, নীল, কমলা, সবুজ।

'রত্ন!' কথা আটকে গেছে প্রফেসরের। সামলে নিয়ে বললেন, 'ফারাওয়ের রত্ন! দশ লক্ষ বলছ! কিচ্ছু জান না! ওগুলোর অ্যানটিক মূল্যই ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ ডলার! তার ওপর রয়েছে পাথরের দাম!'

'তাহলে বুঝতেই পারছেন, কেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল উইলসন। 'প্রফেসর, আমার বাবা এই পাথরের জন্যেই খুন হয়েছিল। তিন-চারটে পাথর বের করে নিয়েছিল। ওগুলোর মূল্য জানার চেষ্টা করেছিল কায়রো বাজারের এক জুয়েলারীর দোকানে গিয়ে। পড়ে গেল বদ লোকের চোখে। এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে আগেই অনুমান করেছিল বাবা। তবু কৌতূহল দমন করতে পারেনি। বাজারে যাবে, এটাও চিঠিতে লিখেছিল।'

'অথচ গাধাটা আমাকে বলেনি,' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'তাহলে এটা ঘটতে

দিতাম না কিছুতেই। কপালে লেখা ছিল অপমৃত্যু, কি আর হবে ওসব বলে।' থামলেন। চোখ মিটমিট করে তাকালেন উইলসনের দিকে। 'যা হওয়ার তো হয়েছে। রা-অরকনের মমিটা কি করেছ?'

'ওখানে,' গ্যারেজের পেছন দিকটা দেখিয়ে বলল উইলসন। 'চট দিয়ে ঢেকে রেখেছি।'

'যাক!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'আমার গবেষণা...' থেমে গেলেন তিনি। উইলসনের দিকে তাকালেন। 'ওসব কথা এখন থাক। তোমার কথা আগে শুনি। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। প্রথমেই শুনতে চাই, মমিটাকে কি করে কথা বলিয়েছ?'

দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে উইলসনের। জীবনের সব আশা-ভরসাই নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যেন তার। রত্নের পুটুলিটা আবার বেঁধে প্রফেসরের হাতে দিয়ে বলল, 'এখানে গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর কত? চলুন, ঘরে চলুন। বসবেন।'

আঠারো

মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিস। মস্ত ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। হাতে ক্লিপে আটকানো এক গাদা টাইপ করা কাগজ। পড়ছেন গভীর মনোযোগে।

পড়া শেষ করে কাগজগুলো ডেস্কে রাখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মুখ তুললেন, 'চমৎকার! খুব উত্তেজনা গেছে কয়েকটা দিন তোমাদের!'

শুধু উত্তেজনা? মুসার মনে পড়ে গেল, কফিনে আটকে থাকা মুহূর্তগুলোর কথা। কিশোরেরও মনে পড়ল। তবে ওসব নিয়ে বেশি ভাবতে চাইল না আর। যা হওয়ার হয়ে গেছে। অবশেষে ভালয় ভালয়ই তো শেষ হয়েছে সব।

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল কিশোর। 'তাহলে কাহিনীটা নিয়ে ছবি করছেন?'

'নিশ্চয়,' মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। 'এ-তো রীতিমত ভাল কাহিনী। আচ্ছা, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো এবার।'

'কোন কথা কি বাদ গেছে, স্যার?' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। কারণ লেখার ভার ছিল তার ওপর।

'এই দুয়েকটা ব্যাপার,' বললেন চিত্রপরিচালক। 'তবে, সেটাকে ভুল বলা চলে না। তুমি তো গল্প লেখনি, রিপোর্ট লিখেছ। যাই হোক এগুলো জানার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'বলুন, স্যার,' বলল রবিন।

'মিশরের আরও দু'একজন রাজাকে অতি সাধারণ মানুষের মত কবর দেয়া

হয়েছে,' হাতের দশ আঙুলের মাথা একত্র করে একটা পিরামিড বানালেন যেন পরিচালক। 'তাঁদের সঙ্গে গোপনে দিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক মূল্যবান রত্ন। বোধহয় পরকালের পাথেয় হিসেবে। কিন্তু কথা হল, তাদেরকে ওভাবে সাধারণ মানুষের মত কবর দেয়া হল কেন? হয়ত কবর-চোরদের ভয়ে। তবে এসব ব্যাপারে এখনও শিওর নন বিজ্ঞানীরা। রা-অরকনকেও নিশ্চয় তেমনি কোন কারণে সাধারণ ভাবে কবর দেয়া হয়েছিল।'

'প্রফেসর বেনজামিনের তাই ধারণা,' বলল রবিন।

'কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য নয়,' বললেন পরিচালক। 'ওসব প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরাই মাথা ঘামাক। আমরা আমাদের কথা বলি। মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটা কে চুরি করেছিল, এটা এখন পরিষ্কার। উইলসন কাউকে দিয়ে করিয়েছিল। মমি চুরি করেছে মেথু আর ওয়েব। কখন করল?'

'আমি, কিশোর আর প্রফেসর বেনজামিন টেপটা নিয়ে গিয়েছিলাম উইলসনের বাড়িতে,' বলল রবিন। 'যখন কথা বলছিলাম উইলসনের সঙ্গে, তখন একবার কলিং বেল বেজে উঠেছিল আমরা থাকতেই। মমিটা নিয়ে ফিরে এসেছিল মেথু আর ওয়েব। কফিনটা আনেনি বলে সে সময়ই ধমক-ধামক মেরেছিল ওদেরকে তাষাবিদ। আবার পাঠিয়েছিল কফিনটা চুরি করতে।'

'আনুবিস সেজে হুপারকে ভয় দেখিয়েছিল কে? নিশ্চয় মেথু কিংবা ওয়েব?'

'ওয়েব, স্যার। ভয় দেখিয়েই কাবু করে ফেলেছিল বেচারাকে। ওকে সামনে রেখে কিছুতেই চুরি করতে পারত না ওরা। ওদের বর্ণনা, ট্রাকের বর্ণনা ওরা বাড়ি থেকে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দিত খানসামা। ভয় পেয়েও বেহুঁশ না হলে হয়ত পিটিয়ে বেহুঁশ করত।'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝেছি। বুঝতে পারছি না, নীল ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেলেও এত তাড়াতাড়ি, ঠিক সময়ে গিয়ে কি করে হাজির হল উইলসনের বাড়িতে?'

'মুসা, তুমি বল,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' সোজা হয়ে বসল মুসা। 'নীল ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা তখন ধরে নিয়েছি, জলিলই অপরাধী। ওকে ধরতে হলে, আগে প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে যেতে হবে। তিনি রিগো অ্যাণ্ড কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জলিলের বাসার ঠিকানা জানতে পারবেন। তাই করা হল। জলিলের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনজন কার্পেট ব্যবসায়ীকে সে বিদায় জানাচ্ছে। আমাদের মুখে নীল ট্রাক আর মেথু-ওয়েবের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। বুঝলাম, সে কিছু জানে না। অপরাধী সে নয়। তখন এমন অবস্থা, পুলিশকে জানানো ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু প্রফেসর তখনও পুলিশকে জানাতে দ্বিধা করছেন। অবশেষে ঠিক করলেন, উইলসনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সময়ে-অসময়ে কোন বিপদ কিংবা বেকায়দায় পড়লেই পরামর্শ নিতে যেতেন প্রফেসর তার কাছে। আগে যেতেন

ভাষাবিদের বাবার কাছে। যাই হোক, গেলাম…'

'এবং গিয়েই দেখলে নীল ট্রাকটা,' মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'নিশ্চয় খুব চমকে গিয়েছিলে।'

'মেথু আর ওয়েবকে ধরে খুব পিট্টি দিয়েছে, স্যার, ওরা,' হেসে বলল কিশোর। 'পিটুনি খেয়ে ওরা বলেছে, কফিনটা গ্যারেজে আছে। পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওদেরকে। আগেও অনেক অপরাধ করেছে, রেকর্ড রয়েছে পুলিশের খাতায়। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিল না এতদিন। এখন তো প্রচুর চোরাই মালসহ ওদের আস্তানাটাই পাওয়া গেছে।' থামল সে। তারপর বলল, 'প্রফেসর উইলসনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করেননি প্রফেসর বেনজামিন। কাজেই বেঁচে গেছেন তিনি। মিডল ইস্টে চলে গেছেন প্রাচীন ভাষার ওপর গবেষণা করতে।'

'রত্নগুলো?'

কায়রো মিউজিয়মে দান করে দিয়েছেন প্রফেসর বেনজামিন, প্রফেসর উইলসনেরও সায় রয়েছে এতে। তবে তাকে একেবারে খালি হাতে বিদায় করেনি মিউজিয়ম। গবেষণা আর মিশরে তার থাকার সমস্ত খরচ বহন করবে ওরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি তো রয়েছেই। মোটা বেতন পাচ্ছে ওখান থেকে, পেতেই থাকবে। ওরাও এটাকে একটা মিশন হিসেবে ধরে নিয়েছে। মিশনের খরচ বেঁচে যাওয়ায় বরং খুশিই বিশ্ববিদ্যালয়।'

'গুড,' কিশোরের দিকে সরাসরি তাকাল পরিচালক। 'আসল রহস্যটাই জানা হল না এখনও। মমিটাকে কি করে কথা বলিয়েছে উইলসন?'

'ও, ওটা?' হাসি গোপন করল কিশোর। 'ভেন্ট্রিলোকুইজম, স্যার। রবিনের বাবা ঠিকই বলেছিলেন।'

ভুরুজোড়া কাছাকাছি চলে এল পরিচালকের। 'ইয়ং ম্যান, সিনেমা ব্যবসায়ে অনেক বছর ধরে আছি। আমি জানি, ঠিক কতখানি দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে ভেন্ট্রিলোকইস্টরা। মনে হবে পুতুলের মুখ দিয়েই কথা বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সেজন্যে ওটার খুব কাছাকাছি থাকতে হয় তাদের। দূর থেকে মোটেও সম্ভব না।'

চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। তারা জানত, অনেক দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা।

'কিন্তু, স্যার,' বলল কিশোর। 'প্রফেসর উইলসন পেরেছেন। তবে ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিলেন তিনি সব সময়। সেজন্যেই প্রথমে তাকে সন্দেহ করতে পারিনি। তবে করা উচিত ছিল। কারণ, কাছাকাছি তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি মিশরের প্রাচীন ভাষা জানেন। কিন্তু বেড়ালের পায়ে রঙ করা হয়েছে, এটা জানার আগে তার কথা খেয়ালই করিনি। বেড়ালটা ছদ্মবেশী। সন্দেহ হল, জ্যোতিষও ছদ্মবেশী। প্রথমেই মনে এল, প্রফেসর বেনজামিন ছাড়া আর কে

সবচেয়ে বেশি জানে রা-অরকন সম্পর্কে? প্রফেসর উইলসন। প্রাচীন মিশরীয় ভাষা জানেন। ধ্যানে বসার অভিনয় করে অনর্গল বলে যেতে পারা কিছুই না তার জন্যে।'

'ঠিকই ভেবেছ,' বললেন পরিচালক। 'কিন্তু এসব তো শুনতে চাই না। আমার প্রশ্ন এটা নয়।'

'আসছি, স্যার, সে কথায়,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'প্রফেসর উইলসন ভাষাবিদ। অনেক ধরনের মাইক্রোফোন, টেপ-প্লেয়ার আর রেকর্ডার ব্যবহার করতে হয়। আপনি নিশ্চয় জানেন স্যার, আজকাল একধরনের প্যারা-বলিক মাইক্রোফোন বেরিয়েছে, যার সাহায্যে শত শত ফুট দূরের শব্দও রেকর্ড করা যায়।'

'জানি,' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচালকের চেহারা। 'বলে যাও।'

'এ-ও জানেন, স্যার, একধরনের স্পীকার আছে, ডিরেকশন্যাল স্পীকার, যার সাহায্যে শব্দকে...ইয়ে, কি বলব। ...জমাট করে ফেলা যায় বলি...। হ্যাঁ, জমাট করে ফেলে শত শত ফুট দূরে চালান করে দেয়া যায়। ওই ধরনের মাইক্রোফোন আর স্পীকার আছে প্রফেসর উইলসনের বাড়িতে। প্রফেসর বেনজামিনের বাড়ি থেকে সরাসরি তিনশো ফুট দূরে ওর বাড়ি।' চুপ করল কিশোর।

'বল, বল, বলে যাও, তোমার কথা শেষ কর,' তাগাদা দিলেন পরিচালক।

'প্রাচীন আরবী ভাষায় কিছু কথা টেপে রেকর্ড করেছিলেন প্রফেসর উইলসন। টেলিস্কোপ আছে তার। প্রফেসর বেনজামিন কাজ করেন জানালা খুলে। সুতরাং কখন তিনি কাজ করেছেন, দেখতে অসুবিধা হত না ভাষাবিদের, কথা ছুঁড়ে দিতে পারতেন মেশিনের সাহায্যে। স্পীকার ফোকাস করে লাইন দেয়াই ছিল প্লেয়ারের সঙ্গে। ক্যাসেটটা ভরে শুধু প্লে বাটনটা টিপে দিতেন। বাস শুরু হয়ে যেত মমির কথা বলা। সকালে চলে যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কাজে। ফিরতেন দুপুরের পর। তাই, মমিটা যখনই কথা বলেছে, বলেছে বিকেলে, অর্থাৎ দুপুরের পর যে-কোন এক সময়। এবং বলেছে শুধু প্রফেসর বেনজামিনের উপস্থিতিতেই। কারণ শুধু তাকেই ভয় পাওয়ানর দরকার ছিল উইলসনের। আমার সামনে কথা বলেছে, কারণ দূর থেকে আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেননি ভাষাবিদ। কিন্তু যখন কফিনে দাড়ি আটকে গেল আমার, খুলে রয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে দিল মমি।' হাসল কিশোর।

'হুমম্!' ওপরে নিচে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'আনুবিসের মুখের বিচিত্র ভাষাও তাহলে তারই কাজ!'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল কিশোর। 'আসলে ওয়েব যখন আনুবিস সেজে হুপারের সামনে আসছে, তার মুখে ভাষা ছুঁড়ে দিয়েছে ভাষাবিদের মেশিন। ব্যাপারটার নাম দিয়েছি আমি, উইলসন্‌স-ভেন্ট্রিলোকুইজম।'

'প্রতিভা আছে লোকটার!' স্বীকার করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তবে আবার কোন কুকর্মে জড়িয়ে না পড়লেই হল!'

'আর করবে বলে মনে হয় না, স্যার। যা লজ্জা পেয়েছে!'

'হুঁ। তবে লোভ বড় ভয়ানক জিনিস!...যাই হোক, আমরা আশা করব, এরপর থেকে তার বিজ্ঞান সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে উইলসন।'

নীরবতা।

'তাহলে।' নড়েচড়ে উঠল কিশোর, 'আমরা তাহলে আজ উঠি, স্যার?'

'আচ্ছা।...হ্যাঁ, ভাল কথা। জামান আর তার ম্যানেজার তো নিশ্চয় লিবিয়ায় ফিরে গেছে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। 'তাদের কোম্পানির সবচেয়ে ভাল একটা কার্পেট পাঠাবে বলেছে, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারের জন্যে।'

'ভেরি গুড,' পরিচালকও উঠে দাঁড়ালেন। 'রকি বীচের ওদিকে একটা কাজ আছে আমার। যেতে হবে এখনি। চল, তোমাদেরকে একটা লিফট দিই।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।

— o —

রত্নদানো

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট, ১৯৮৬

'রামধনু রত্নহার চুরি করা যায় কিনা ভাবছি!' আপনমনেই বলল কিশোর পাশা।

সোলডারিং আয়রনটা মুসার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হল। রেডিওর তার ঝালাই বাদ দিয়ে ফিরে তাকাল সে। তিন গোয়েন্দার কার্ড শেষ হয়ে এসেছে, আবার ছাপা দরকার, কম্পোজ করছে রবিন, তাও হাত থেমে গেল।

'কী!' চোখ বড় হয়ে গেছে গোয়েন্দা সহকারীর।

'বলছি, রামধনু রত্নহারটা চুরি করা যায় কিনা!' আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ধর যদি আমরা চোর হতাম?'

'যা নই সেটা নিয়ে ভাবতে যাব কেন? চুরি করা অন্যায়।'

'তা ঠিক!' হাতের খবরের কাগজে বিশেষ ফিচারটার দিকে আবার তাকাল কিশোর।

হাতের স্টিকটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলল রবিন। 'কিশোর, রামধনু রত্নহার! কিসের বাংলা করলে?'

'রেইনবো জুয়েলস।'

'পিটারসন মিউজিয়মের নেকলেসটা?'

'হ্যাঁ।'

গত রাতেই নেকলেসটার কথা শুনেছে রবিন, তার বাবা বাসায় আলোচনা করছিলেন।

'পিটারসন মিউজিয়ম। নেকলেস! কি বলছ তোমরা?' কিছুই বুঝতে পারছে না মুসা।

'কোন দেশে বাস কর? খোঁজখবর রাখ কিছু!' বিদ্যে জাহির করার সুযোগ পেয়ে গেছে নথি। 'মিউজিয়মটা হলিউডে, একটা পাহাড়ের চূড়ায় পুরানো একটা বাড়ি, মালিক ছিলেন এক মস্ত ধনী লোক, হিরাম পিটারসন। মিউজিয়মের জন্যে বাড়িটা দান করে দিয়েছেন তিনি।'

'বর্তমানে ওখানে একটা প্রদর্শনী হচ্ছে,' বলল কিশোর। 'রত্ন প্রদর্শনী। এর ব্যবস্থা করেছে জাপানের মস্ত বড় এক জুয়েলারি কোম্পানি, সুকিমিচি জুয়েলারস। আমেরিকার সব বড় বড় শহর ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী করবে ওরা। এটা আসলে এক ধরনের বিজ্ঞাপন। এদেশে অলঙ্কারের বড় মার্কেট রয়েছে। ওই কোম্পানির

বিশেষত্ব হল মুক্তোর তৈরি অলঙ্কার। অনেক পুরানো দামি জিনিসও আছে ওদের স্টকে। তারই একটা রেইনবো জুয়েলস, সোনার তৈরি সাতনরি হার, হীরা-চুনি-পান্নাখচিত। নাড়া লাগলেই রামধনুর সাতরঙ যেন ছিটকে বেরোয় পাথরগুলো থেকে। দাম অনেক।'

'আরও একটা দামি জিনিস এনেছে ওরা,' কিশোরের কথার পিঠে বলে উঠল রবিন। 'একটা সোনার বেল্ট। অনেকগুলো পান্না বসানো আছে ওতে। জিনিসটার ওজন পনেরো পাউণ্ড। ওটার মালিক ছিলেন নাকি জাপানের প্রাচীন এক সম্রাট।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কিশোর!' বিস্ময় কাটেনি এখনও মুসার। 'এত দামি জিনিস চুরি করার সাধ্য কারও নেই! নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে জিনিসগুলো, ব্যাঙ্কের ভল্টের মত...'

'তার চেয়েও কড়া পাহারায় রয়েছে। জিনিসগুলো যে-ঘরে রাখা হয়েছে, ওখানে পালা করে সর্বক্ষণ পাহারা দেয় পিস্তলধারী প্রহরী। মানুষের চোখকে পুরোপুরি বিশ্বাস নেই, তাই বসানো হয়েছে একটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন-ক্যামেরা। তবে যদি ক্যামেরা ঠিকমত কাজ না করে? সেজন্যে অদৃশ্য আলোকরশ্মির ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোন একটা রশ্মি কোনভাবে বাধা পেলেই চালু হয়ে যাবে অ্যালার্ম সিস্টেম। কাচের বাক্সে রাখা হয়েছে রেইনবো জুয়েলস আর সোনার বেল্ট। ওই বাক্সেও রয়েছে অ্যালার্ম ব্যবস্থা। বাক্সের ভেতর কেউ হাত দিলেই বেজে উঠবে বেল। কারেন্ট ফেল করলেও অসুবিধে নেই, ব্যাটারি কানেকশন রয়েছে প্রতিটি সিসটেমের সঙ্গে।'

'ওই তো, যা বলেছিলাম,' বলল মুসা। 'কেউ চুরি করতে পারবে না জিনিসগুলো।'

'হ্যাঁ, বড় রকমের চ্যালেঞ্জ একটা,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'চ্যালেঞ্জ!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'আমরা কি চুরি করতে যাচ্ছি নাকি ওগুলো!'

'করার মত কোন কাজ এখন আমাদের হাতে নেই,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারও অনেকদিন কোন কাজ দিতে পারছেন না। সময় তো কাটাতে হবে আমাদের। ব্রেনটা চালু রাখতে হবে। জিনিসগুলো চুরি করার একটা উপায় নিশ্চয় আছে, সেটা যদি জানতে পারি, ভবিষ্যতে অনেক কঠিন রত্ন-ডাকাতির কেস সহজেই সমাধান করতে পারব আমরা।'

'অযথা সময় নষ্ট!' ঠোঁট ওল্টাল মুসা। 'চুরিচামারির কথা ভাবার চেয়ে চল গিয়ে ডাইভিং প্র্যাকটিস করি, পুরোপুরি রপ্ত হয়নি এখনও আমাদের।'

'আমিও তাই বলি,' মুসার পক্ষ নিল রবিন। 'বাবা কথা দিয়েছে, ডাইভিংটা ভালমত শিখে নিলে আমাদেরকে মেক্সিকোতে নিয়ে যাবে। উপসাগরে সাঁতার কাটতে পারব, পানির তলায় ওখানে বড় বড় জ্যান্ত চিংড়ি পাওয়া যায়।

অক্টোপাসের বাচ্চা…'

'চুপ চুপ, আর বল না, রবিন!' জোরে জোরে হাত নাড়ল মুসা। 'এখুনি ওখানে চলে যেতে ইচ্ছে করছে আমার!'

'খবরের কাগজে লিখেছে।' দুই সহকারীর কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, 'আজকে মিউজিয়মে চিলড্রেনস ডে। আঠারো বছরের নিচের যে-কোন কিশোর হাফ-টিকেটে ঢুকতে পারবে আজ। ইউনিফর্ম পরে যে বয়স্কাউটরা যাবে, তাদের পয়সাই লাগবে না।'

'আমাদের ইউনিফর্ম নেই,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা। 'তারমানে আমরা বাদ।'

'গত হপ্তায় চাচাকে সাহায্য করেছি আমরা, ইয়ার্ডের কাজ করে বেশ কিছু কামিয়েছি,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'হাফ কেন, ফুল টিকেট কিনে প্রদর্শনী দেখার ক্ষমতা,এখন আমাদের আছে। ভাবছি, আজই কেন চলে যাই না? আর কিছু না হোক, রেইনবো জুয়েলস দেখার সৌভাগ্য তো হবে। আসল মুক্তো আর হীরা-চুনি-পান্না দেখতে পারব। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এই অভিজ্ঞতা।'

'মুসা,' গোয়েন্দা সহকারীর দিকে চেয়ে বলল নথি। 'ওকে ভোটে হারাতে পারব আমরা, কি বল?'

'নিশ্চয় পারব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পাথর দেখে কি হবে? জানিই তো কি রঙের হবে পাথরগুলো, কেমন হবে। ওগুলো দেখে কি করব?'

'মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে দেখলে…,'

'…দেখলে কি হবে?' কিশোরকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রবিন। 'বড় দেখাবে, এই তো?'

'ক্রিকেট বল, নাহয় ফুটবলের মতই দেখাক,' হাতের আঙুল ওপরের দিকে বাঁকা করে নাড়ল মুসা। 'আমাদের কি? হ্যাঁ, একটাই কাজ করা যেতে পারে ওই পাথর দিয়ে, গুলতিতে লাগিয়ে ছুঁড়ে পাখি মারা যেতে পারে।…আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আবিষ্কার করে ফেলেছি, কি করে চুরি করা যায়! গুলতির সাহায্যে হারটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারলেই হল! বাইরে চোরের সঙ্গী বড় ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, লুফে নেবে ঝুড়িতে! তারপর ছুটে পালাবে! বা বা, এই তো একটা উপায় বের করে ফেলেছি! পানির মত সহজ কাজ!'

'চমৎকার বুদ্ধি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় মগ্ন রইল কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'মোটেই চমৎকার নয়। দুটো ফাঁক রয়েছে। ঝুড়িতে নিল যে, সে হয়ত পালাতে পারবে, কিন্তু যে ছুঁড়ল, সে ঘরেই থেকে যাবে তখনও, ধরা পড়বে গার্ডের হাতে। আরেকটা দুর্বলতা হল,' মুসা আর রবিনের দিকে একবার করে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'পিটারসন মিউজিয়মের যে ঘরে রাখা হয়েছে রেইনবো জুয়েলস, ওই ঘর থেকে জানালা দিয়ে ছোঁড়া যাবে না জিনিসটা। কারণ… নাটকীয় ভাবে

চুপ করল সে।

'কারণ?' সামনে ঝুঁকল মুসা।

'হ্যাঁ, কেন ছোঁড়া যাবে না?' মুসার পর পরই প্রশ্ন করল রবিন।

'কারণ, পিটারসন মিউজিয়মে কোন জানালাই নেই,' মুচকে হাসল কিশোর। 'চল রওনা হয়ে যাই, দেরি না করে।'

দুই

ঘন্টাখানেক পর ছোট পাহাড়টার গোড়ায় এসে পৌছল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পিটারসন মিউজিয়ম। গ্রিফিথ পার্ক থেকে বেরিয়ে একটা পথ চলে গেছে উপত্যকা ধরে। এখান দিয়ে প্রায়ই পার্কে পিকনিক করতে যায় লোকে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরাই বেশি যায়। বিরাট বাড়িটার দু'দিকে দুটো শাখা যেন ঠেলে বেরিয়েছে, দুটোরই ছাতের জায়গায় রয়েছে বিশাল দুটো গম্বুজ। বাড়ির সামনে পেছনের চাল সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ঘুরে ঘুরে একটা পথ উঠে গেছে বাড়ির পেছনে, আরেকটা পথ নেমে এসেছে; একটা ওঠার, আরেকটা নামার জন্যে।

মোটর কার আর স্টেশন ওয়াগনের সারি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে মিউজিয়মের দিকে। পথের এক পাশ ধরে উঠতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। ঠাসাঠাসি করে গাড়ি রাখা হয়েছে পার্কিং লট-এ, আরও এসে ঢুকছে। ঢোকার সময় তো ঢুকেছে, বেরোনর সময় বুঝবে ঠেলা, ভাবল কিশোর। চারদিকে ভিড়, বেশির ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। নীল ইউনিফর্ম পরা কাব স্কাউটরা বিশৃঙ্খল ভাবে ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক, সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাদের ডেন মাদার (পরিচালিকা)। গার্ল স্কাউটেরা ছোটাছুটি বিশেষ করছে না, কিন্তু তাদের কলরবে কান ঝালাপালা। কে যে কি বলছে, বোঝার উপায় নেই। বাচ্চা ব্রাউনিদের কাছাকাছিই রয়েছে কয়েকজন লম্বা বয়স্কাউট, বেল্টে গোঁজা ছোট্ট কুঠার, হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ।

'জায়গাটা ভালমত দেখে নেয়া দরকার,' সহকারীদেরকে বলল কিশোর। 'আগে মিউজিয়মের বাইরেটা দেখব।'

বাড়ির পেছনে এক চক্কর দিল তিনজনে। একসময় অনেক জানালা ছিল, কিন্তু এখন বেশির ভাগই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইঁট গেঁথে। নিচের তলা আর গম্বুজওয়ালা ঘরগুলোতে একটা জানালাও নেই, সব বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। গুলতির সাহায্যে কেন অলঙ্কার চুরি করা যাবে না, বুঝতে পারছে এখন রবিন আর মুসা। জানালাই নেই, ছুঁড়বে কোন্ পথ দিয়ে? গম্বুজওয়ালা একটা ঘরের দিকে এতই মনোযোগ তার, ডেন মাদারের সঙ্গে কয়েকজন কাব স্কাউটকে দেখতেই পেল না, পড়ল গিয়ে একজনের গায়ে। 'আঁউউ!...ইস্স্, সরি!'

ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়েছে একটা ছেলে, রবিনের ধাক্কা খেয়ে। লজ্জিত

হাসি হাসল ছেলেটা, ঝিক করে উঠল একটা সোনার দাঁত। হাত ধরে টেনে তাকে উঠতে সাহায্য করল রবিন। আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল। ডেন মাদারের সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেছে অন্য স্কাউটেরা, তাদেরকে ধরতে ছুটল ছেলেটা।

'আরে আরে, দেখ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'কি!' ভুরু কুঁচকাল মুসা, ঠোঁট বাঁকাল। 'কি দেখব! বাড়ির পেছনটা ছাড়া তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

'তারগুলো দেখতে পাচ্ছ না? ওই, ওই যে? পোল থেকে নেমে এসেছে, ইলেকট্রিক তার। সবগুলোকে এক করে পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটা গর্তের ভেতর দিয়ে! ওই তো, বাড়িটার এক কোণে! সহজেই কেটে ফেলা যায়!'

'তোমার যা কথা!' বলল রবিন। 'কে কাটতে যাবে?'

'রত্নচোরেরা। তবে ওগুলো কাটলে বড় জোর আলো নেভাতে পারবে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো হবে না। সে যা-ই হোক, এটা একটা দুর্বলতা!'

বাড়ির সামনে-পেছনে ঘোরা শেষ করল তিন গোয়েন্দা। সামনে দিয়ে ভেতরে ঢোকার গেটের দিকে এগোল। ওরা ইউনিফর্ম পরে আসেনি, কাজেই টিকেট কিনতে হল। পঁচিশ সেন্ট করে হাফ টিকেটের দাম।

গেট পেরিয়ে প্যাসেজে এসে ঢুকল তিনজনে।

'তীর চিহ্ন ধরে এগিয়ে যাও,' পথের নির্দেশ দিল একজন গার্ড।

ডান শাখার বিশাল এক হলঘরে এসে ঢুকল তিনজনে। গম্বুজওয়ালা এই ঘরটা প্রায় তিন-তলার সমান উঁচু। দেয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতায় অর্ধেকটা ঘিরে রয়েছে ব্যালকনি। 'বন্ধ' নির্দেশিকা ঝুলছে ওখানে।

কারুকাজ করা সুদৃশ কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই দামি দামি ছবি ঝুলছে দেয়ালে। ওগুলো মিউজিয়মের সম্পত্তি। ছবির প্রতি তেমন আকর্ষণ দেখাল না তিন গোয়েন্দা, তারা এসেছে রত্ন আর অলঙ্কার দেখতে।

ছবিগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। 'ছবিগুলো কিভাবে ঝোলানো হয়েছে, লক্ষ্য করেছ? দেয়ালের ওপরের দিকের খাঁজ থেকে আটকানর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে কিন্তু এভাবে ছবি ঝোলানো হত না। সিলিঙে হুক লাগিয়ে লম্বা শেকল দিয়ে ঝোলানো হত। দেখেছ, হুকগুলো এখনও আছে?'

একবার ওপরে তাকিয়ে দেখল মুসা, কিন্তু গুরুত্ব দিল না। প্রায় দরজা-আকারের বড় বড় জানালাগুলোর দিকে তার মন। 'জানালা বন্ধ করে দিল কেন ওরা?'

'দেয়ালে বেশি করে জায়গা করেছে, আরও বেশি ছবি ঝোলানর জন্যে,' বলল কিশোর। 'এটা একটা কারণ। তবে আসল কারণ বোধহয় ভাল এয়ারকণ্ডিশনিঙের জন্যে। দামি দামি ছবি, তাপমাত্রার পরিবর্তনে ক্ষতি হতে পারে, তাই সব সময়

একই রকম উত্তাপ রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা হয়েছে।'

ধীরে ধীরে পুরো ঘরে চক্কর দিল ওরা, তারপর ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পেছন দিকের আরেকটা বড় হলঘরে এসে ঢুকল। তারপর চলে এল বাঁ-শাখার গম্বুজওয়ালা ঘরটায়। এখানেই রত্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ডান শাখার ঘরটার মত এখানেও দেয়ালের মাঝামাঝি ব্যালকনি রয়েছে। ব্যালকনিতে ওঠার সিঁড়ির মাথা দড়ি আটকে রুদ্ধ করা হয়েছে।

ঘরের ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে রেইনবো জুয়েলস। কাচের বাক্সটা ঘিরে রয়েছে খুঁটি, ওগুলোতে বেঁধে রঙিন মখমলের দড়ির ঘের দেয়া হয়েছে। ঘেরের এপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বাক্সটার নাগাল পাওয়া যায় না।

'সুন্দর ব্যবস্থা,' সারির মধ্যে থেকে চলতে চলতে বলল কিশোর। 'হঠাৎ গিয়ে ঘুসি মেরে বাক্স ভেঙে হারটা তুলে নিতে পারবে না চোর।'

এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু দেখার উপায় নেই, এত ভিড়। সারি চলছে ধীরে ধীরে, তারই মাঝে থেকে চলতে চলতে যতখানি দেখে নেয়া যায়। বড় একটা হীরা—নীল আলো ছড়াচ্ছে, মস্ত জোনাকির মত জ্বলে আছে একটা পান্না, জ্বলন্ত কয়লার মত ধক ধক করছে একটা চুনি, আর জ্বলজ্বলে সাদা বিশাল একটা মুক্তা—এই চারটে পাথরই বেশ কায়দা করে বসানো হয়েছে রত্ন হারটাতে। ওগুলোকে ঘিরে ঝকমক করছে ছোটবড় আরও অসংখ্য পাথর। ঠিক নামই রাখা হয়েছে, রামধনু রত্নহার, রামধনুর মতই সাত রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে পাথরগুলো থেকে।

কাচের বাক্সের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে একজন গার্ড। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল হারটার দাম বিশ লক্ষ আমেরিকান ডলার। দাম শুনে 'হু-ই-ই-ই' করে উঠল এক গার্ল স্কাউট।

এক দিকের দেয়ালের কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা। ব্যালকনির ঠিক নিচেই আরেকটা কাচের বাক্সে রাখা হয়েছে ফুট তিনেক লম্বা সোনার বেল্টটা। অনেকগুলো চারকোণা সোনার টুকরো গেঁথে তৈরি হয়েছে বেল্ট। প্রতিটি টুকরোর মাঝখানে বসানো একটা করে চৌকোণা পান্না, ধারগুলোতে বসানো হয়েছে মুক্তা। দুই মাথার বকলেসে রয়েছে হীরা এবং চুনি। বেল্টের আকার দেখেই বোঝা যায়, এটা যিনি পরতেন, বিশালদেহী মানুষ ছিলেন তিনি।

'সম্রাটের সোনার বেল্ট এটার নাম,' বেল্টের বাক্সের কাছে দাঁড়ানো এক গার্ড বলল। 'জিনিসটা প্রায় হাজার বছরের পুরানো। ওজন পনেরো পাউণ্ডের মত। খুবই দামি জিনিস, কিন্তু আসল দাম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এর ঐতিহাসিক মূল্য।'

আরও কিছুক্ষণ বেল্টটা দেখার ইচ্ছে ছিল তিন গোয়েন্দার, কিন্তু পেছনের চাপে বাধ্য হয়ে সরে আসতে হল। অসংখ্য কাচের বাক্সে সাজিয়ে রাখা হয়েছে

আরও অনেক মূল্যবান জিনিস, তার প্রায় সবই সুকিমিচি জুয়েলারস-এর তৈরি। আঠা দিয়ে মুক্তা আর কাচ জুড়ে তৈরি হয়েছে হাঁস, ঘুঘুপাখি, মাছ, হরিণ আর অন্যান্য অনেক জীবজন্তুর প্রতিকৃতি। ছেলেরা চুপচাপ মুগ্ধ চোখে দেখছে, কিন্তু মেয়েরা চুপ করে থাকতে পারছে না। চারদিক থেকে কেবল তাদের হুঁইই-হাঁইই, ইস্‌স্‌-আস্‌স্‌ শোনা যাচ্ছে।

প্রায় ভরে গেছে এখন ঘরটা। কথা বলার জন্যে খালি একটু জায়গা দেখে সরে এল তিন গোয়েন্দা।

'কত গার্ড দেখেছ?' বলল কিশোর। 'দিনের বেলা এখানে চুরি করা সম্ভব নয়। করলে রাতে করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? ঢুকবে কি করে? অ্যালার্ম ফাঁকি দিয়ে বাক্স ভাঙবে কি করে?' মাথা নাড়ল সে আপনমনেই। 'আমার মনে হয় না চুরি করতে পারবে, যদি না...'

'হুপ্‌প্‌!' কিশোরের গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে পিছিয়ে এসেছে, আর কোনদিকেই নজর ছিল না।

'আরে, মিস্টার মার্চ?' বলে উঠল কিশোর।

'কে!' ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা।

'আরে, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কিশোর, কিশোর পাশা। টেলিভিশনে কমিকে অভিনয় করতাম, মনে নেই? আমরা বাচ্চারা যত গণ্ডগোল বাধাতাম, আপনি তার খেসারত দিতেন, মনে পড়ছে?'

'কি কিশোর পাশা! ও ইয়ে...হ্যাঁ হ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'কিন্তু এখন তো কথা বলার সময় নেই আমার, অভিনয় করতে হবে।'

'অভিনয়?'

'দেখ, কি করি,' হাসল মিস্টার মার্চ। 'মজা দেখ। ওই যে, একটা গার্ড।' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'গার্ড! গার্ড!'

ঘুরল ইউনিফর্ম পরা গার্ড। থমথমে চেহারা। 'কি হয়েছে?' ভারি কণ্ঠ।

টলে উঠল মার্চ। 'আমার...আমার মাথা ঘুরছে!...পানি! পানি!' পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল সে। হাত কাঁপছে বলেই বোধহয়, রুমালের ভাঁজ থেকে খুট করে কিছু একটা মেঝেতে পড়ে গেল। লাল একটা পাথর, পান্নার মত দেখতে। 'আহ্‌হা!' চেহারায় শঙ্কা ফুটল অভিনেতার।

দুই লাফে কাছে চলে এল গার্ড। 'কোত্থেকে চুরি করেছ এটা!' গর্জে উঠল সে। 'এস, এদিকে এস!' মার্চের কলার চেপে ধরে টানল লোকটা।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে কলার ছাড়িয়ে নিল মার্চ, জোরে এক ধাক্কা মারল গার্ডের বুকে।

আর দ্বিধা করল না গার্ড। হুইসেল বাজাল। বদ্ধ ঘরের বাতাস যেন চিরে দিল বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দ। জমে গেল যেন ঘরের প্রতিটি লোক। সব কটা চোখ প্রায় একই

সঙ্গে ঘুরে গেছে গার্ড আর মার্চের দিকে। দেখতে দেখতে ছুটে এসে মার্চকে ঘিরে ফেলল গার্ডেরা। অপরাধী একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে অভিনেতা।

'এই যে মিস্টার...' শুরু করল হেড গার্ড। কিন্তু তার কথা শেষ হল না, তার আগেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল পুরো ঘরটা।

এক সেকেণ্ড নীরবতা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একটা উত্তেজিত কণ্ঠ, 'আলো! আলো জ্বেলে দাও!'

'হারের বাক্সটার কাছে চলে যাও দু'জন!' শোনা গেল হেড গার্ডের আদেশ। 'বিল, ডিক, তোমরা গিয়ে দরজা আটকাও। খবরদার, কেউ যেন বেরোতে না পারে!'

এরপর শুরু হল হট্টগোল। যার যেভাবে খুশি চেঁচাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকে ভয়ে হাউমাউ জুড়ে দিয়েছে, চেঁচিয়ে, বুঝিয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মায়েরা।

'চীফ!' চেঁচিয়ে উঠল এক গার্ড। 'ছেলেপিলেগুলোর জন্যে এগোতে পারছি না! বাক্সটার কাছে যাওয়া যাচ্ছে না!'

'যেভাবেই হোক, যাও!' আবার বলল হেড গার্ড। 'ডাকাত! ডাকাত পড়েছে!'

ঠিক এই সময় ঝন ঝন করে ভাঙল কাচ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল যেন অ্যালার্ম বেল। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে চলল দর্শকরা। অন্ধকারের মধ্যে কে কত জোরে চেঁচাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলেছে যেন।

'রক্তহার!' কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে বলল মুসা। 'হারটা চুরি করার তালে আছে কেউ!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোরের কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে সে। 'ভেবেচিন্তে প্ল্যান করেই এসেছে ডাকাতেরা।...চল, সামনের দরজার কাছে চলে যাই। ব্যাটারা ওদিক দিয়েই হয়ত বেরোবে। চল চল।'

'পেছনেও দরজা আছে,' বলল রবিন।

'তা আছে। কিন্তু এক সঙ্গে দু'দিকে দেখতে পারব না। চল, সামনের দিকেই যাই।'

দু'হাতে বাচ্চাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দরজার দিকে এগোলো কিশোর। তাকে সাহায্য করল মুসা। ভিড়ের মধ্যে কোনমতে পথ করে এগোল তিন গোয়েন্দা।

দরজার কাছে যেতে পারল না ওরা। গার্ডেরা কাউকে বেরোতে দিচ্ছে না, ফলে দরজার কাছে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে লোকজন। এ ওকে ঠেলা মারছে, সে তাকে গুঁতো দিচ্ছে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন সবাই। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এখন কোনভাবে এক-আধটা বাচ্চা পড়ে গেলে জনতার পায়ের চাপেই চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

অ্যালার্ম আর হট্টগোল ছাপিয়ে শোনা গেল একটা কণ্ঠ; কথায় জাপানী টান।

থামিয়ে দেয়া হল বেল। বোধহয় ইমার্জেন্সী সুইচ অফ করে ব্যাটারি কানেকশন কেটে দেয়া হয়েছে। আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠে আদেশ, 'গার্ডস! জলদি বাইরে চলে যাও!' লোককে হল থেকে বেরোতে দাও। কিন্তু সাবধান! এরিয়ার বাইরে যেন যেতে না পারে কেউ! সবাইকে সার্চ করে তবে ছাড়বে!'

দরজার কাছ থেকে বোধহয় সরে দাঁড়াল গার্ডেরা। কারণ, অন্ধকারেই বুঝতে পারল কিশোর, ঢেউ খেলে গেল যেন জনতার মাঝে। নড়তে শুরু করেছে সবাই একদিকে, বেরিয়ে যাচ্ছে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে তাদের মাঝে ঢুকে গেল সে।

তিন গোয়েন্দাকে যেন ছিটকে বের করে নিয়ে এল জনতার স্রোত। দেয়াল ঘেরা বড় একটা লনে বেরিয়ে এসেছে ওরা। আশেপাশে অসংখ্য গার্ড, দর্শকদের কাউকেই লনের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। বাচ্চা আর মহিলাদের শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে কয়েকজন। পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। খানিক পরেই লনের গেট দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল কয়েকটা পুলিশের গাড়ি আর হাফট্রাক। লাফ দিয়ে নেমে এল সশস্ত্র পুলিশ।

শুরু হল তল্লাশি। বয়স্কাউট আর গার্ল গাইডরা পুলিশকে সাহায্য করতে লাগল।

দ্রুত চলল তল্লাশি। সারি দিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে দর্শকরা, যাদেরকে তল্লাশি করা হয়ে যাচ্ছে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই রবিন আর মুসাকে নিয়ে পেছনে রইল কিশোর, যাতে তাদের পালা পরে আসে।

মিস্টার মার্চের পালা এল। বিধ্বস্ত চেহারা তার। একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? ডাকাতি…'

'…এই যে মিস্টার,' মার্চকে দেখেই বলে উঠল হেড গার্ড। 'আপনাকে এখন যেতে দেয়া হবে না। হাত ধরে টেনে অভিনেতাকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে নিয়ে চলল সে।

'কিছু পাওয়া যাবে না ওর কাছে,' নিচু গলায় দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। 'সহজে ছাড়াও পাবে না। জেরার পর জেরা চলবে।…কিন্তু ডাকাত ব্যাটারা পালাল কোন পথে?'

'তাই তো বুঝতে পারছি না!' পুরো লনে চোখ বোলাল মুসা। 'পুরুষ আর তেমন কেউ নেই, খালি মহিলা, আর বাচ্চা! এদের কাউকেই তো ডাকাত মনে হচ্ছে না!'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ওদের কাছে কিছু পাওয়া যাবে না…'

হুড়মুড় করে এই সময় মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে এলেন এক ছোটখাট জাপানী ভদ্রলোক, হাতে টর্চ। চেঁচিয়ে গার্ডদেরকে বললেন, 'লোকেরা চলে গেছে, না? হায় হায়, গেল বুঝি! রেইনবো জুয়েলস না, নেইনবো জুয়েলস না, বেল্টা নিয়ে গেছে!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখ। 'অবাক কাণ্ড তো! ব্যাটারা বেল্ট চুরি করতে গেল কেন? হারটা নেয়া অনেক সোজা ছিল! এতবড় জিনিস, লুকাল কোথায়!'

'ওই যে দু'জন বয়স্কাউট,' আঙুল তুলে দেখাল রবিন। 'লম্বু দুটোকে দেখছ না, আমার মনে হয় ওদের কাজ। কুঠার দিয়ে বাড়ি মেরে কাচের বাক্স ভেঙেছে…। বেল্টটা আছে ওদের কাছেই

'আমার মনে হয় না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান, ঠোঁট গোল করে শিস দিল। 'গোল্ডেন বেল্ট ওদের কাছে পাওয়া যাবে না।'

কিশোরের কথা ঠিক হল। স্কাউটদেরকেও তল্লাশি করা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না সোনার বেল্ট। তাদের ব্যাগে খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই, মিউজিয়ম থেকে গ্রিফিথ পার্কে গিয়ে পিকনিকের ইচ্ছে, তাই সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে খালি হয়ে এল লন। তিন গোয়েন্দাকেও তল্লাশি করা হল। এবার বেরিয়ে যেতে পারে ওরা, কিন্তু বেরোল না কিশোর। আরেকবার মিউজিয়মে ঢোকার ইচ্ছে তার।

আর কাউকে তল্লাশি করা বাকি নেই। মিউজিয়মে এখনও আলো জ্বালানর ব্যবস্থা হয়নি। কয়েকটা টর্চ জোগাড় করে অন্ধকার মিউজিয়মে ঢুকল গিয়ে কয়েকজন গার্ড। মুসা আর রবিনকে নিয়ে কিশোরও ঢুকে পড়ল।

যে কাচের বাক্সে বেল্টটা রাখা হয়েছিল, ওটার ওপরের আর এক পাশের কাচ ভেঙে চুরমার। অন্য বাক্সগুলো ঠিকই আছে, বেল্টটা বাদে আর কিছু চুরিও হয়নি।

এই সময় পেছনে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, 'আরে, এই যে, ছেলেরা, তোমরা এখানে কি করছ? এখানে কি?'

সেই জাপানী ভদ্রলোক।

'স্যার।' পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, 'আমরা গোয়েন্দা। আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই।'

টর্চের আলোয় কার্ডটা পড়লেন ভদ্রলোক। তারপর মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন।

হেসে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'যে-কোন ধরনের রহস্য সমাধান করতে রাজি আমরা। ভৌতিক রহস্য, চুরি ডাকাতি…'

'পাগল! আমেরিকান ছেলেগুলো সব বদ্ধ পাগল। যত্তোসব!' কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ভদ্রলোক। 'আমি টোহা মুচামারু, সুকিমিচি জুয়েলারস কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ, আমিই ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হল! আর তিনটে বাচ্চা খোকা এসেছে এর সমাধান করতে! হুঁহ!…যাও, খোকারা, বাড়ি যাও। খামোকা গোলমাল কোরো না। বেরোও।' প্রায় ধাক্কা দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে মিউজিয়ম থেকে বের করে দিলেন মুচামারু।

তিন

পরদিন খবরের কাগজে বেশ বড়সড় হেডিং দিয়ে ছাপা হল 'গোল্ডেন বেল্ট' চুরির সংবাদ, খুঁটিয়ে পড়ল কিশোর। নতুন কিছু তথ্য জানা গেল। মেকানিক-এর পোশাক পরা একজন লোককে মিউজিয়মের সীমানার ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে, এর কয়েক মিনিট পরেই গাড়িতে করে দ্রুত চলে গেছে লোকটা। যারা দেখেছে, তারা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। যে-কোন বাড়িতে যে-কোন সময় বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটতে পারে, সারানর জন্যে মিস্ত্রি আসতে পারে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। নিখুঁত পরিকল্পনা করে চুরি করতে এসেছিল একটা দল, মাপা সময়ে যার যার কাজ করে সরে পড়েছে। কেউ বাইরে থেকে কাজ করেছে, কেউ করেছে ভেতর থেকে। কে ছিল ভেতরে?

পেছনের দরজা দিয়ে কেউ বেরোয়নি। কাগজে লিখেছে, বেরোনর উপায় ছিল না কারণ, পেছনের দরজা এমন ভাবে বন্ধ করা ছিল, ওটা খুলে বোরোনো অসম্ভব। তারমানে চোরও বেরিয়েছে সামনের দরজা দিয়েই। মিউজিয়মের ভেতরে দর্শক যারা যারা ঢুকেছিল, তাদের সবাইকে লনে আটকানো হয়েছে, ভালমত তল্লাশি করা হয়েছে। তাহলে কোনদিক দিয়ে গেল চোর?

কাগজে লিখেছে, মিস্টার টোড মার্চকে জেরা করার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

'এই মিস্টার মার্চের ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'রুমাল থেকে ইচ্ছে করেই একটা লাল পাথর ফেলল! আসল পাথর নয়, নকল, কাচ-টাচের তৈরি হবে।'

হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। কিশোরের কথা শেষ হয়নি, বুঝতে পেরে চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

ক্যারাভানের দেয়ালের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই, পেশাদার দলের কাজ। প্রতিটি সেকেণ্ড পর্যন্ত মেপে নিয়েছে। নাহ, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না! কি করে সোনার বেল্টটা বের করল ওরা?'

'গার্ডদের কেউ হতে পারে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'নিশ্চয় চোরের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে! কোন গার্ডকে কিন্তু তল্লাশি করা হয়নি!'

প্রশংসার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। 'ঠিক, এটা হতে পারে! কিন্তু হ্...আরও একটা সম্ভাবনা আছে। হয়ত মিউজিয়মেই কোথাও লুকিয়ে ছিল চোর। সবাই চলে যাওয়ার পর কোন এক সুযোগে বেরিয়েছে।'

'উঁহু!' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কাগজে লিখেছে, দর্শকরা সব বেরিয়ে যাওয়ার পর পুরো মিউজিয়ম খুঁজে দেখা হয়েছে। কারও পক্ষে তখন লুকিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না।'

'হয়ত কোন গোপন ঘর আছে,' বলল রবিন। 'ওসব পুরানো বাড়িগুলোতে থাকে।'

চুপ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে, 'আমার মনে হয় না! তেমন ঘর থেকে থাকলে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ জানবেই। আর গার্ডদের ব্যাপারটা···কি জানি···! একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই, এটা বুঝলেই অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব—হার না নিয়ে বেল্টটা নিল কেন ওরা? হারটার দাম বেশি, লুকানো সহজ, বেচতে পারত সহজে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গোয়েন্দাপ্রধান। চিমটি কেটে চলল নিচের ঠোঁটে।

'দেখি, আবার প্রথম থেকে একটা একটা পয়েন্ট আলোচনা করি,' বলল কিশোর। 'প্রথমেই লাইট চলে যাওয়ার ব্যাপারটা। এটা সহজ কাজ, বাইরে থেকে সহজেই করা গেছে। দুই, আলো চলে যাওয়ার পর গার্ডরা অসুবিধেয় পড়েছে। কারণ, বাচ্চা আর মহিলারা নরক গুলজার শুরু করে দিয়েছিল মিউজিয়মের ভেতর। গার্ডেরা দর্শক সামলাতেই হিমশিম খেয়ে গেছে, এই সুযোগে কাজ সেরে ফেলেছে চোর। তারমানে, ইচ্ছে করেই চিলড্রেনস ডে বেছে নিয়েছে চোরেরা। ঠিক কিনা?'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'তিন, রেইনবো জুয়েলসের দিকেই লক্ষ্য বেশি ছিল গার্ডদের, ফলে বেল্টটা সহজেই হাতিয়ে নিতে পেরেছে চোর। বাক্সের চারপাশে দড়ির রিঙ, তার বাইরে থেকেই কাজটা করতে পারে একজন লম্বা মানুষ।'

'গার্ডদের অনেকেই খুব লম্বা,' মনে করিয়ে দিল রবিন।

'ঠিক,' সায় দিল কিশোর। 'বাক্স ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠল, দরজার দিকে দৌড় দিল কিছু গার্ড। দর্শকদেরকে বেরোতে দেয়া হল লনে, তাদেরকে তল্লাশি করা হল, তারপর ছেড়ে দেয়া হল।'

'এগুলো কোন তথ্য নয়,' বলল মুসা। 'এ-থেকে রহস্যের সমাধান করা যাবে না।···আচ্ছা, আমরা যেচে সাহায্য করতে চাইলাম, এমন ব্যবহার করল কেন জাপানী সিকিউরিটি অফিসার?'

ঠোঁট উল্টাল কিশোর। 'কি জানি! হয়ত আমাদেরকে বেশি ছেলেমানুষ মনে করেছে, তাই। ইস্‌স্, মিস্টার ক্রিস্টোফার ওই মিউজিয়মের ডিরেক্টর হলে কাজটা পেয়ে যেতাম আমরা!'

'তিনি নন,' বলল মুসা। 'ওকথা ভেবে আর কি লাভ?'

'মিস্টার মার্চের ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক,' টেবিলে আস্তে আস্তে টোকা দিল কিশোর।

'মানে?' প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর মুসা।

'মনে আছে কি কি করেছ। টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'মিস্টার মার্চ আমাকে বলেছে, এবার অভিনয় শুরু করবে সে। তারপর অভিনয় শুরু করেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছার ছলে ইচ্ছে করেই পাথর ফেলেছে। গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সন্দেহ জাগিয়েছে। তারপর কি ঘটল?'

'কি ঘটল?' একই প্রশ্ন করল রবিন, এবং উত্তর দিল নিজেই, 'গার্ড চেঁচামেচি শুরু করল, অন্য গার্ডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল মিস্টার মার্চের দিকে।'

'ঠিক তাই।' খুশি খুশি একটা ভাব ফুটেছে কিশোরের চেহারায়। 'দর্শক আর গার্ডদের নজর অন্যদিকে সরিয়ে দিল লোকটা। ওই সুযোগে অন্য অপরাধীরা তাদের যার যার কাজ করে গেছে নিরাপদে। এমন কিছু, যেটা আমাদের নজরে পড়েনি।'

'সেই এমন কিছুটা কি?' প্রশ্ন করল মুসা।

'সেটাই তো জানি না। তবে ওদের সময়জ্ঞানে আশ্চর্য হতেই হচ্ছে! পাথরটা মেঝেতে ফেলল মিস্টার মার্চ, এক গার্ড বাঁশি বাজাল, অন্য গার্ডরা দৌড়ে এল। তার এক কি দুই সেকেণ্ড পরেই দপ করে নিভে গেল সব বাতি। অন্ধকার হয়ে গেল ঘর, আর সেই সুযোগে গোল্ডেন বেল্ট চুরি করে পালাল চোরেরা। প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সেরেছে।'

চিন্তিত দেখাল রবিনকে। 'কিন্তু কারা ওরা? বেল্ট বের করে নিয়ে গেল কিভাবে?'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিশোর, ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

তৃতীয়বার রিঙ হতেই ফোনের তারের সঙ্গে যুক্ত লাউডস্পীকারের সুইচ টিপে অন করে দিল কিশোর। রিসিভার তুলে নিল। 'হ্যালো।'

'কিশোর পাশা?' মহিলা কণ্ঠ বেজে উঠল স্পীকারে। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার চাইছেন তোমাকে।'

বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল যেন তিন গোয়েন্দার চোখে মুখে। দীর্ঘদিন পর আবার এসেছে ডাক! মিস্টার ক্রিস্টোফার চাইছেন, তারমানে নিশ্চয় জটিল কোন রহস্য।

'কিশোর বলছি।'

'ধরে থাক, প্লীজ।'

দুই সেকেণ্ড খুটখাট শব্দ হল স্পীকারে। তারপরই ভেসে এল ভারি গমগমে কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো, কিশোর। কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল, স্যার!' উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোরের গলা।

'হাতে কোন কাজ আছে এখন তোমাদের। মানে কোন কেস?'

'না, স্যার, কিচ্ছু নেই! বসে থেকে থেকে...'

'তাহলে একটা কাজ দিচ্ছি। আমার এক লেখিকা বান্ধবীকে সাহায্য করতে পারবে?'

'সাহায্য? কি সাহায্য!'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। বোধহয় গুছিয়ে নিচ্ছেন মনে মনে। 'কি বলল ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, ফোনে কথা হয়েছে। রক্তদানোরা নাকি বিরক্ত করছে ওকে।'

'র-ক্ত-দা-নো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন রবিন আর মুসা।

'তাই তো বলল,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'রক্তদানো। ওই যে, খুদে পাতাল-মানব, যারা নাকি চামড়ার পোশাক পরে, পাতালে বাস করে, আর সুড়ঙ্গ কেটে কেটে খালি রক্তের সন্ধানে ফেরে।'

'রক্তদানো কি, জানি, স্যার। কিন্তু ওরা তো কল্পিত জীব, কেচ্ছা কাহিনীতে আছে। সত্যি সত্যি আছে বলে তো শুনিনি কখনও!'

'আমিও শুনিনি।। কিন্তু আমার বান্ধবী বলছে, সে নিজের চোখে দেখেছে। রাতে চুরি করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে দানোরা, সমস্ত ছবি উল্টেপাল্টে রাখে, বই ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে যায় যেখানে সেখানে। পুলিশকে বলেছে সে, কিন্তু পুলিশ এমনভাবে তাকিয়েছে যেন মহিলার মাথা খারাপ। ভীষণ অসুবিধেয় পড়ে শেষে আমাকে জানিয়েছে সে।'

কয়েক মহূর্ত নীরবতা।

'কিশোর, ওকে সাহায্য করতে পারবে?'

'পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা তো নিশ্চয় করব! ঠিকানাটা দেবেন?'

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে ঠিকানা লিখে নিল রবিন।

ছেলেদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন চিত্র পরিচালক।

'যাক!' জোরে একটা শ্বাস ফেলল কিশোর। 'গোল্ডেন বেল্টের কেস পাইনি, কিন্তু তার চেয়েও মজার একটা পেলাম! রক্তদানো! চমৎকার!'

চার

মিস শ্যানেল ভারনিয়া থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলীতে। বাসে যেতে অসুবিধে, একটা গাড়ি হলে ভাল হয়। মেরিচাচীকে ধরল তিন গোয়েন্দা। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা দিতে রাজি হলেন চাচী। চালিয়ে নিয়ে যাবে দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, বোরিস।

খালি মুখে বেরোতে রাজি হল না মুসা। অগত্যা কিশোর আর রবিনকেও টেবিলে বসতে হল।

খেয়ে দেয়ে মস্ত ঢেকুর তুলল মুসা। পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এইবার দানো শিকারে যাওয়া যায়।'

'আর কিছু খাবে?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আর?' টেবিলের শূন্য প্লেটগুলোর দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'আর তো কিছু নেই!'

মুচকি হেসে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে একটা জগ বের করল কিশোর। নিয়ে এসে বসল আবার টেবিলে।

'কমলার রস।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দাও দাও, জলদি দাও! ইস্‌স্, পুডিংটা খাওয়া উচিত হয়নি! তবে তেমন ভাবনা নেই। পানির ভাগ বেশি তো, পেটে বেশিক্ষণ থাকবে না।'

দুটো গেলাসে কমলালেবুর রস ঢেলে একটা রবিনকে দিল কিশোর। আরেকটা নিজে রেখে জগটা ঠেলে দিল মুসার দিকে।

প্রায় ছোঁ মেরে জগটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে খেতে শুরু করল মুসা। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় মুখের সামনে থেকে জগ সরিয়ে বলল, 'কিশোর, গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হয়েছে, বুঝে গেছি!'

অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। 'কি করে?'

'গার্ল স্কাউটের লীডার মেয়েটাকে দেখেছিলে না? ওর মাথায় বড় বড় চুল ছিল। আমার মনে হয় পরচুলা। পরচুলার নিচে করে নিয়ে গেছে বেল্টটা!'

মুসার বুদ্ধি দেখে গোঙানি বেরোল কিশোরের।

রবিন বলল, 'খেয়ে খেয়ে মাথায় আর কিছু নেই ওর! পরচুলার নিচে করে গোল্ডেন বেল্ট? তা-ও যদি বলত চোরাখুপরিওলা কোন লাঠির কথা···কিশোর, পেয়েছি! লাঠি! হ্যাঁ, এক বুড়োকে মোটা লাঠি হাতে দেখেছি সেদিন! নিশ্চয় ওটার চোরা খুপরির ভেতরে ভরে···'

'তোমাদের দু'জনের মাথায়ই গোবর,' থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'পনেরো পাউণ্ড ওজনের তিন ফুট লম্বা একটা বেল্ট! হারটা হলে পরচুলা কিংবা লাঠির ভেতরে করে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এতবড় বেল্ট···অসম্ভব! অন্য কিছু ভাব।'

'আর কিছু ভাবতে পারব না আমি,' আবার মুখে জগ তুলল মুসা।

'আমার মাথায়ও আর কিছু আসছে না।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। 'চুলোয় যাক গোল্ডেন বেল্ট! হ্যাঁ, এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখলাম, রত্নদানো···'

'···এখন না, গাড়িতে উঠে বল,' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'দেখি, বোরিস গাড়ি বের করল কিনা।'

সামনের সিটে বোরিসের পাশে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা। মিস ভারনিয়ার বাড়ির ঠিকানা দিল বোরিসকে কিশোর। ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পথে উঠে এল হাফট্রাক, ছুটে চলল লস অ্যাঞ্জেলেস-এর শহরতলীর দিকে।

'হ্যাঁ, এইবার বল রবিন, রত্নদানোর ব্যাপারে কি কি জেনেছ?' বলল কিশোর।

'রত্নদানো হল,' লেকচারের ভঙ্গিতে শুরু করল রবিন, 'এক ধরনের ছোট্ট জীব, মানুষের মতই দেখতে, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক ছোট, বামনদের সমান কিংবা তার চেয়েও ছোট। ওরা থাকে মাটির তলায়, গুপ্তধন খুঁজে বের করাই ওদের কাজ। রত্নদানোদের সঙ্গে বাস করে কুৎসিত চেহারার আরেক জাতের জীব, গবলিন। গবলিনরা দক্ষ কামার। শাবল, কোদাল, গাঁইতি বানাতে ওদের জুরি নেই। স্বর্ণকার হিসেবেও ওরা ওস্তাদ। সোনা আর নানারকম মূল্যবান পাথর দিয়ে চমৎকার গহনা বানায় রত্নদানোদের রানী আর রাজকুমারীদের জন্যে।'

'এসব তো কিসসা!' ঘঁউক করে এক ঢেকুর তুলল মুসা। 'আরিব্বাপরে, খাওয়াটা বেশিই হয়ে গেছে! থাকগে, রাতে দেরি করে খেলেই হবে!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রত্নদানো, গবলিন, এসব হল গিয়ে কল্পনা। মি...মিউথো...'

'মিথোলজি,' বলে দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, মিথোলজির ব্যাপার-স্যাপার। বাস্তবে নেই। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে আসবে কোত্থেকে?' নড়েচড়ে বসল মুসা।

'সেটাই তো জানতে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু রত্নদানো তো বাস্তবে নেই,' আবার বলল মুসা।

'কে বলল নেই?' পথের দিকে নজর রেখে বলে উঠল বোরিস। 'ব্যাভারিয়ার ব্ল্যাক ফরেস্টে জায়গাটা খুব খারাপ!'

'দেখলে তো?' হাসি চাপল কিশোর। 'রত্নদানো আছে, এটা বোরিস বিশ্বাস করে।'

'বোরিস করে, সেটা আলাদা কথা,' পেটটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বিড়বিড় করল মুসা। 'বোতাম খুলে দেব নাকি প্যান্টের? যাকগে, হজম হয়ে যাবে একটু পরেই।...হ্যাঁ, এটা ব্ল্যাক ফরেস্ট নয়। আমেরিকার—ক্যালিফোর্নিয়ার-লস, অ্যাঞ্জেলেস। এখানে রত্নদানো আসবে কোত্থেকে, কি করে?'

'হয়ত রত্ন খুঁজতেই এসেছে,' মুসার হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে হাসছে রবিন। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় কি রত্ন নেই, সোনার গহনা নেই? ১৮৪৯ সালে সোনার খনিও পাওয়া গেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। খবরটা হয়ত অনেক দেরিতে পেয়েছে ওরা, তাই এতদিন পরে এসেছে। মাটির তলায় খবর যেতে দেরি হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'রত্নদানো থাকুক বা না থাকুক,' হালকা কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'রহস্যজনক কিছু একটা ঘটছে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে, এটা ঠিক। ওখানে গেলেই হয়ত জানতে পারব।'

শহরতলীর অতি পুরানো একটা অঞ্চলে এসে ঢুকল ওরা। গাড়ির গতি কমিয়ে

রাস্তার নাম্বার খুঁজতে লাগল বোরিস। বিরাট একটা পুরানো বাড়ির কাছে এনে গাড়ি থামাল।

বাড়ি না বলে দুর্গ বলা চলে ওটাকে। অসংখ্য গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভ রয়েছে। যেখানে সেখানে নকশা আর ফুল আঁকা হয়েছে সোনালি রঙ দিয়ে. বেশির ভাগ জায়গায়ই বিবর্ণ হয়ে গেছে কিংবা চটে গেছে রঙ। অস্পষ্ট একটা সাইনবোর্ড পড়ে বোঝা গেল ওটা একটা থিয়েটার বাড়ি, মূরেরা তৈরি করেছিল। পুরানো সাইনবোর্ডটার কাছেই আরেকটা নতুন সাইনবোর্ড—বারোতলা অফিস তৈরি হচ্ছে।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল বোরিস। থিয়েটারের পর একটা উঁচু পাতাবাহারের বেড়া পেরিয়ে এল। পলকের জন্যে বেড়ার ওপাশে, অন্ধকার, সরু লম্বা একটা দালান চোখে পড়ল কিশোরের। বেড়ার পরে আরেকটা বাড়ি, একটা ব্যাংক, পুরানো ধাঁচের বাড়ি, পাথরে তৈরি দেয়াল।

আরেকটা ব্লকের কাছে চলে এল ট্রাক। এখানে একটা সুপারমার্কেট, দোকানগুলো পুরানো। অনেক আগে এটা বাণিজ্যিক এলাকা ছিল, বোঝাই যাচ্ছে।

'বাড়িটা পেছনে ফেলে এসেছি,' ব্যাংক আর সুপারমার্কেটের মাঝখানে বসানো পাথর ফলকে রাস্তার নাম্বার দেখে বলল কিশোর।

'বেড়ার ওপাশের বাড়িটাই হবে,' রবিন বলল। 'একমাত্র ওটাকেই বসতবাড়ির মত দেখতে লাগছে।'

'পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও পার্ক করুন,' বোরিসকে বলল কিশোর।

খানিকটা পিছিয়ে এনে পাতাবাহারের বেড়ার ধারে গাড়ি পার্ক কলল বোরিস। ছয়ফুট উঁচু গাছগুলো অযত্নে বেড়ে উঠেছে, মাথা সবগুলোর সমান নয়, রাস্তার ধুলোবালিতে আসল রঙ হারিয়ে গেছে রঙিন পাতার। বেড়ার ওপাশে পুরানো বাড়িটার দিকে আবার তাকাল কিশোর, মনে হল, বাইরের ব্যস্ত দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে আছে ওটা।

বেড়ার ধার ধরে হেঁটে গেল মুসা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সাদা রঙ করা ছোট একটা গেটের সামনে। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এই তো! মিস শ্যানেল ভারনিয়া!'

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন।

'এটা একটা জায়গা হল!' বলল মুসা। 'দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এই ভূতের গলিতে এসে বাসা বাঁধলেন কেন মহিলা!...আরিসব্বোনাশ! কাণ্ড দেখেছ!' আঙুল তুলে গেটের এক জায়গায় সাঁটানো কাগজ দেখাল সে। যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে কাচ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তবু রোদে হলদেটে হয়ে গেছে সাদা মোটা কাগজ। বিড়বিড় করে পড়ল মুসা, 'মানুষ হলে বেল বাজান, প্লীজ। রক্তদানো, বামন কিংবা খাটোভূত হলে শিস দাও। সেরেছে, কিশোর, পাগল!

পাগলের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছি! চল, ভাগি!'

ভুরু কুঁচকে লেখাটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'বোঝা যাচ্ছে, ওই সব কল্পিত জীবগুলোর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন মিস ভারনিয়া। মুসা, এক কাজ কর, শিস দাও...'

ফিক করে হেসে ফেলল রবিন।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমি কি রক্তদানো নাকি?'

'রক্তদানো না হলেও পেটুকদানো, এতে কোন সন্দেহ নেই। যা বলছি, কর। শিস দাও। দেখা যাক, কি ঘটে।'

কিশোর ঠাট্টা করছে না বুঝতে পেরে আর প্রতিবাদ করল না মুসা। ঠোঁট গোল করে টানা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাতাবাহারের ঝোপের ভেতরে কথা বলে উঠল কেউ, 'কে?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল কিশোর। ঝোপের ভেতরে স্পীকার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ির ভেতরে বসে স্পীকারের মাধ্যমে কথা বলছে কেউ। বড় বড় এলাকা নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে যে সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে আজকাল, অনেক বাড়িতেই এই স্পীকারের ব্যবস্থা রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল ঝোপের ভেতরে। কিছু দেখা গেল না। দু'হাতে পাতা আর ডাল সরাতেই দেখা গেল জিনিসটা। পাখি পোষার ছোট বাক্সে বসানো হয়েছে স্পীকার, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্যে। মাইক্রোফোন বসানো রয়েছে স্পীকারের পাশেই।

'গুড আফটারনুন, মিস ভারনিয়া,' মার্জিত গলায় বলল কিশোর। 'আমরা তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন। আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে এসেছি আমরা।'

'ও, নিশ্চয় নিশ্চয়! তালা খুলে দিচ্ছি,' মিষ্টি হালকা গলা।

গেটে মৃদু গুঞ্জন উঠল। বাড়ির ভেতরে বসেই নিশ্চয় সুইচ টেপা হয়েছে, মেকানিজম কাজ করতে শুরু করেছে পাল্লার, খুলে গেল ধীরে ধীরে।

আগে ভেতরে ঢুকল কিশোর। তার পেছনে মুসা আর রবিন।

পেছনে গেটটা আবার বন্ধ হয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। ওদের মনে হল, বাইরের জগত থেকে আলাদা হয়ে গেল যেন। মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে ছয় ফুট উঁচু বেড়া, রাস্তা দেখা যায় না। এক পাশে পরিত্যক্ত থিয়েটার বাড়ির পুরানো দেয়াল উঠে গেছে কয়েক তলা সমান উঁচুতে। আরেক পাশে ব্যাংকের গ্র্যানিট পাথরের দেয়াল। দেয়াল বেড়া সবকিছু মিলে সরু পুরানো বাড়িটাকে গিলে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। বাড়িটা তিন তলা, কিছু কিছু ঘরের দেয়াল রেডউড কাঠে তৈরি, কড়া রোদ বিবর্ণ করে দিয়েছে কাঠের রঙ। নিচের তলার সামনের দিকে বারান্দা, কয়েকটা টবে লাগানো ফুল গাছে ফুল ফুটেছে, পুরো

এলাকাটায় তাজা উজ্জ্বল রঙ বলতে শুধু ওই ফুল ক'টাই।

একই সময়ে প্রায় একই অনুভূতি হচ্ছে তিনজনের। বাড়িটা দেখতে দেখতে ওদের মনে হল, রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসেছে যেন কোন ডাইনীর বাড়ি।

কিন্তু মিস শ্যানেল ভারনিয়াকে মোটেই ডাইনীর মত লাগল না। সদর দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন। লম্বা, পাতলা শরীর, চঞ্চল চোখ, সাদা চুল।

'এস,' পাখির গলার মত মোলায়েম মিষ্টি কণ্ঠস্বর মিস ভারনিয়ার। 'তোমরা আসাতে খুব খুশি হয়েছি। এস, ভেতরে এস।'

লম্বা হলঘর পেরিয়ে বড়সড় লাইব্রেরিতে ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন লেখিকা। দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় আলমারি, বুক-শেলফ, বই উপচে পড়ছে। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ঝোলানো রয়েছে সুন্দর পেইন্টিং আর ফটোগ্রাফ, সবই বাচ্চা ছেলেমেয়ের।

'বস,' তিনটে চেয়ার দেখিয়ে বললেন লেখিকা। 'হ্যাঁ, যে জন্যে ডেকেছি তোমাদেরকে,' কোন রকম ভূমিকা না করে শুরু করলেন তিনি। 'রত্নদানোরা বড় বিরক্ত করছে আমাকে। কয়েকদিন আগে পুলিশকে জানিয়েছিলাম, আমার দিকে যে-রকম করে তাকাল, রত্নদানোর কথা বলতে আর কোনদিন যাব না ওদে কাছে...'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আর্মচেয়ারে আরাম করে বসেছিল, এখন সোজা হয়ে গেছে পিঠ, জানালার দিকে চেয়ে আছে। চোখে অবিশ্বাস। জানালার বাইরে একটা ছোট্ট মানুষের মত জীব! মাথায় টোপরের মত টুপি। বিচ্ছিরি দাড়িতে মাটি লেগে আছে, কাঁধে একটা ঝকঝকে গাঁইতি। মুখ ভয়ানক বিকৃত, চোখ লাল।

পাঁচ

'রত্নদানো! চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'আমাদের ওপর নজর রাখছিল!'

'কই, কোথায়!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল মুসা আর কিশোর।

'ওই যে, ওখানে, জানালার বাইরে ছিল!' আঙুল তুলে জানালাটা দেখা রবিন। 'চলে গেছে! হয়ত আঙিনায়ই আছে এখনও!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল রবিন। তার পেছনে কিশোর, সবার পেছনে মুসা। দুটো আলমারির মাঝের ফাঁকে একটু অন্ধকার মত জায়গায় রয়েছে 'জানালাটা'। চোখ মিটিমিটি করে তাকাল রবিন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল মসৃ কাচ।

'আয়না,' বলল কিশোর। 'প্রতিবিম্ব দেখেছ, রবিন।'

ফিরে তাকাল অবাক রবিন। মিস ভারনিয়াও উঠে দাঁড়িয়েছেন। আয়না উল্টো দিকের একটা জানালা দেখালেন তিনি। আয়নার দিকে আঙুল ম

বললেন, 'ওদিকটা অন্ধকার হয়ে থাকে, তাই আয়না বসিয়েছি। জানালার আলো প্রতিফলিত করে।'

ছুটে খোলা জানালার কাছে চলে এল ছেলেরা। মাথা বাড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল কিশোর, আঙিনাটা দেখল। 'কেউ নেই!'

কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও জানালার বাইরে মাথা বের করে দিল। 'নাহ্, কেউ নেই আঙিনায়! রবিন, তুমি ঠিক দেখেছিলে তো?'

জানালার নিচে তাকাল রবিন, শূন্য থিয়েটার বাড়ির উঁচু দেয়াল দেখল। কোথাও কিচ্ছু নেই। দাড়িওয়ালা রত্নদানোর ছায়াও চোখে পড়ছে না।

'আমি ওকে দেখেছি!' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রবিন। 'নিশ্চয় বাড়ির আশপাশে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। গেট বন্ধ, বাইরে যেতে পারবে না। খুঁজলে এখনও হয়ত পাওয়া যেতে পারে ওকে।'

'পাবে না, কারণ ওটা রত্নদানো,' বলে উঠলেন মিস ভারনিয়া। 'জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ওরা।'

'কিন্তু তবু খুঁজে দেখতে চাই,' বলল কিশোর। 'পেছনে কোন গেট-টেট আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লেখিকা। তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন বাড়ির পেছনের আরেকটা ছোট বারান্দায়। ওখান থেকে আঙিনায় নেমে পড়ল ছেলেরা।

'মুসা, তুমি বাঁয়ে যাও,' নির্দেশ দিল কিশোর। 'রবিন, তুমি এস আমার সঙ্গে। ডানে যাব।'

তেমন বিশেষ কোন জায়গা নেই, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে রত্নদানো। আঙিনায় ছোট ছোট কয়েকটা ঝোপ। বাড়ির পেছনে কাঠের বেড়া, বেড়ার ওপাশে সরু গলি। বেড়ায় কোন ফোকর নেই, যেখান দিয়ে গলে বেরোতে পারে রত্নদানো। পেছনে একটা গেট আছে, তালাবদ্ধ। পুরানো, মরচে ধরা লোহার গেট, দেখেই বোঝা যায়, অনেক বছর ধরে খোলা হয়নি। ওই গেট পেরোলেই থিয়েটার বাড়ির সীমানা।

'ওদিক দিয়ে যায়নি,' মাথা নাড়ল রবিন।

যত ছোটই হোক, তবু সব ক'টা ঝোপ খুঁজল রবিন আর কিশোর, নিচতলায় ভাঁড়ারের জানালাগুলো পরীক্ষা করল বাইরে থেকে। জানালার পাল্লাগুলো অসম্ভব নোংরা, দীর্ঘদিন খোলাও হয়নি, পরিষ্কারও করা হয়নি। বাড়ির সামনের দিকে বেড়ার ধারে চলে এল দু'জনে। পুরো বেড়াটা পরীক্ষা করল, কোথাও ফোকর নেই, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে পাতাবাহারের গাছ। বামন-আকৃতির একটা মানুষেরও আঙিনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই, একমাত্র গেট ছাড়া।

তাহলে? যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে রত্নদানো!

মুসাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

'চল তো,' কিশোর বলল। 'জানালার নিচে পায়ের দাগ আছে কিনা দেখি।'

লাইব্রেরি ঘরের যে জানালায় রক্তদানো দেখেছে রবিন, সেটার নিচে চলে এল তিনজনে। শুকনো কঠিন মাটি, পায়ের ছাপ নেই, পড়েনি।

'নেই!' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'আরেকটা রহস্য!'

'মানে!' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রবিন।

উবু হয়ে মাটি থেকে কিছু তুলে নিল কিশোর। 'এই যে, দেখ, আলগা মাটি। জুতোর তলা থেকে খসে পড়েছে।'

'মিস ভারনিয়ার টবের মাটিও হতে পারে,' বলল রবিন। 'কোনভাবে পড়েছে এখানে।'

'সম্ভাবনা কম,' ওপর দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'জানালাটা দেখ। চৌকাঠের নিচটাও আমাদের মাথার ওপরে। রবিন, খুব ছোট একটা মানুষকে দেখেছিলে, না?'

'মানুষ না, রক্তদানো!' জবাব দিল রবিন, 'ফুট তিনেক লম্বা! মাথায় টোপরের মত টুপি, নোংরা দাড়ি, কাঁধে ধরে রেখেছে গাঁইতি। ওর কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এমনভাবে চেয়ে ছিল আমার দিকে, যেন ভীষণ রেগে গেছে।'

'তা কি করে হয়?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'জানালার চৌকাঠ মাঠি থেকে ছয় ফুট উঁচুতে। তিন ফুট লম্বা রক্তদানোর কোমর দেখা যাবে কিভাবে? ওর মাথাই তো দেখা যাওয়ার কথা না!'

প্রশ্নটা প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিল রবিন আর মুসাকে।

'হয়ত মই,' খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবে বলল মুসা। 'হয়ত কেন, নিশ্চয়ই মই!'

'নিশ্চয়!' ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল কিশোরের গলায়। 'ভাঁজ করে এই এত্তোটুকুন করে সেই মই পকেটে ভরে ফেলা যায়! তোমার কি ধারণা? মই পকেটে নিয়ে ফোর্থ ডাইমেনশনের কোন গর্তে ঢুকে পড়েছে দানোটা?'

কিশোরের কথার ধরনই ওমনি, রাগ করল না মুসা। মাথা চুলকাতে লাগল।

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ওরা জাদু জানে। জাদুর বলে বাংলাদেশে ভানুমতির খেল দেখিয়ে ভ্যানিস হয়ে গেছে।'

'আমার মনে হয় আসলে কিছু দেখনি তুমি, রবিন,' বলল কিশোর। 'হয়ত কল্পনা করেছ, মানে, কল্পনার চোখে দেখেছ।'

'আমি ওটা দেখেছি!' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'ওর চোখও দেখেছি! টকটকে লাল, জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছিল!'

'লাল চোখওয়ালা রক্তদানো! ইয়াল্লা!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। রবিন, দোহাই তোমার, বল, ওটা তোমার কল্পনা!'

বার বার ছাগলকে কুকুর বলছে ওরা!—নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর সন্দিহান হয়ে

উঠল রবিন। তাই তো, বেশিক্ষণ তো দেখিনি ওটাকে। মাত্র এক পলক! 'কি জানি!' গলায় আর আগের জোর নেই তার। 'মনে তো হল, দেখেছি! কিন্তু...কি জানি, কল্পনাও হতে পারে! তখন অবশ্য এনসাইক্লোপীডিয়ায় দেখা রক্তদানোর ছবির কথা ভাবছিলাম। নাহ্, খুব সম্ভব কল্পনাই করেছি!'

'কল্পিত জীবকে পাওয়া যাওয়ার কথা না,' দ্বিধায় পড়ে গেছে কিশোর। 'কিন্তু যদি সত্যি দেখে থাক, তাহলে জাদু জানে ব্যাটা! গায়েব হওয়ার মন্ত্র!'

'এছাড়া বেরোবে কি করে আঙিনা থেকে?' যোগ করল মুসা।

'চল, ঘরে যাই,' বলল কিশোর। 'মিস ভারনিয়ার কথা শুনিগে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।'

সামনের বারান্দা দিয়ে আবার ঘরে ঢুকল ওরা। হল পেরিয়ে লাইব্রেরিতে এল।

'ওকে পাওনি তো?' জিজ্ঞেস করলেন লেখিকা।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন। 'গায়েব।'

'আমি জানতাম, পাবে না,' মাথা দুলিয়ে বললেন মিস ভারনিয়া। 'রক্তদানোরা ওরকমই, এই আছে এই নেই! তবে আমিও অবাক হয়েছি, দিনের বেলায় আসতে দেখে। দিনের আলোয় সাধারণত বেরোয় না ওরা। জাকগে, এস আগে চা খেয়ে নিই। তারপর বলল, কি কি ঘটেছে।'

চীনামাটির কেটলি থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন লেখিকা, 'আশা করি তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কিস্টোফারের খুব ভাল ধারণা তোমাদের ওপর। কয়েকটা অদ্ভুত রহস্য নাকি ভেদ করেছ।'

'তা করেছি,' সবার আগে কাপ টেনে নিয়ে চায়ে প্রচুর পরিমাণে দুধ আর চিনি মেশাতে লাগল মুসা। 'তবে বেশির ভাগ কৃতিত্বই কিশোরের, তাই না রবিন?'

'অন্তত আশি পার্সেন্ট,' গম্ভীর গলায় বলল নথি। 'বাকি বিশ পার্সেন্ট আমাদের দু'জনের। কিশোর, ঠিক না? এই কিশোর?'

পাশের একটা কাউচে পড়ে থাকা খবরের কাগজের হেডলাইনে মনোযোগ কিশোরের। রবিনের ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস ভারনিয়া, রবিন আর মুসার সাহায্য ছাড়া একটা রহস্যও ভেদ করতে পারতাম না।'

'মিউজিয়মের খবরটা দেখছ মনে হচ্ছে?' চা আর বিস্কুট বাড়িয়ে ধরে কিশোরকে বললেন মিস ভারনিয়া। 'কি যে হয়েছে দিনকাল! চারদিকে খালি গোলমাল আর গোলমাল! রহস্যের ছড়াছড়ি!'

একটা বিস্কুট আর কাপটা নিল কিশোর। এক কামড় বিস্কুট ভেঙে চিবিয়ে চা দিয়ে গিলে নিল। 'গোল্ডেন বেল্টটা যখন চুরি হয়, তখন মিউজিয়মেই ছিলাম আমরা, সে এক তাজ্জব কাণ্ড! সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাজি হলেন না

সিকিউরিটি ইনচার্জ। আমরা নাকি বড় বেশি ছেলেমানুষ।'

'ভাগিয়ে দিলেন, সেকথা বলছ না কেন?' এক সঙ্গে দুটো বিস্কুট মুখে পুরেছে মুসা, কথা অস্পষ্ট।

'আরে, এ কি!' মুসার দিকে চেয়ে বলে উঠল কিশোর। 'এই না একটু আগে হাঁসফাঁস করছিলে বেশি খেয়ে ফেলেছিলে বলে?'

'ও হ্যাঁ, তাই তো!' কিশোর মনে করিয়ে দেয়ায় যেন মনে পড়ল মুসার। পেটে হাত রাখল। প্লেট থেকে বড় আকারের আরও গোটা চারেক বিস্কুট এক সঙ্গে তুলে নিয়ে বলল, 'এই ক'টাই, ব্যস, আর খাব না। আরে, এত উত্তেজনা, পেটের কথা মনে থাকে নাকি?'

মুচকি হাসল কিশোর।

'আরে থাক, থাক,' বললেন মিস ভারনিয়া। 'ছেলেমানুষ, এই তো তোমাদের খাওয়ার বয়েস।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইনচার্জ তোমাদেরকে ভাগিয়ে দিয়ে উচিত করেনি। তবে আমার জন্যে ভালই হল। তোমরা অন্যখানে ব্যস্ত থাকলে আমার এখানে আসতে পারতে না। খাও, চা-টা আগে শেষ কর, তারপর কথা হবে।'

মিস ভারনিয়ার ভরসা পেয়ে পুরো প্লেট খালি করে দিল মুসা। আরেক কাপ চা নিয়ে আবার দুধ আর চিনি মেশাতে শুরু করল।

'পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে!' বললেন লেখিকা। 'আহা, কি সব দিনই না ছিল। কতদিন পর আবার ছেলেদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি! পুরো একটা হপ্তাও পেরোত না, টি-পার্টি দিতাম, রক্তদানো, বামন আর খাটোভূতদের নিয়ে।'

বিষম খেল মুসা। গলায় চা আটকে যাওয়ায় কাশতে শুরু করল। বিস্কুটে কামড় বসিয়ে মাঝ পথেই থেমে গেল রবিন।

শুধু কিশোরের অবস্থা স্বাভাবিক রইল। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'প্রতিবেশী বাচ্চাদের দাওয়াত করতেন, না? ওদের নামই দিয়েছেন রক্তদানো, বামন আর খাটোভূত?'

'নিশ্চয়।' হাসি ফুটল লেখিকার মুখে। 'খুব চালাক ছেলে তো তুমি! কি করে বুঝলে?'

'ডিডাকশন,' খালি কাপটা টিপয়ে নামিয়ে রাখল কিশোর। দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো দেখিয়ে বলল, 'সব বাচ্চাদের ছবি। পোশাক-আশাক পুরানো ছাঁটের, এখন আর ওসব ডিজাইন কেউ পরে না। কোন কোন ছবির নিচে লেখা দেখলামঃ প্রিয় মিস ভারনিয়াকে। আপনি একজন লেখিকা, কল্পিত জীব নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, সবই বাচ্চাদের জন্যে। দুটো বই পড়েছিও আমি। দারুণ বই। রক্তদানো আর খাটোভূতের চরিত্রগুলো সব মানুষের বাচ্চার মত। ধরেই নিলাম, আদর করে আপনার বাচ্চা বন্ধুদেরকে ওসব নামে ডাকেন।'

হাঁ হয়ে গেছে রবিন আর মুসা। ওই দুটো বই ওরাও পড়েছে, দেয়ালে

টাঙানো ছবিগুলোও দেখেছে। কিন্তু কিশোরের মত ভেবেও দেখেনি, গুরুত্বও দেয়নি।

'ঠিক, ঠিক বলেছ।' আনন্দে বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠলেন মিস ভারনিয়া। 'তবে একটা ব্যাপার ভুল বলেছ। বামন কিংবা খাটোভূত কল্পিত হতে পারে, কিন্তু রত্নদানোরা নয়। ওরা বাস্তব। আমি শিওর।' একটু থেমে বললেন, 'আমার বাবার যথেষ্ট টাকা পয়সা ছিল। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, আমার জন্যে একজন গভর্নেস রেখে দিয়েছিলেন বাবা। কি সব সুন্দর সুন্দর গল্প যে জানত মহিলা! আমাকে শোনাত। ব্ল্যাক ফরেস্টে রত্নদানো আর বামনেরা বাস করে, ওই মহিলাই প্রথম বলেছে আমাকে। বড় হয়ে তার মুখে শোনা অনেক গল্প নিজের মত করে লিখেছি। একটা বই উপহার দিয়েছিল আমাকে মহিলা। বইটা জার্মান ভাষায় লেখা। হয়ত বুঝবে না তোমরা, কিন্তু ছবি বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। নিয়ে আসছি বইটা।'

উঠে গিয়ে শেলফ থেকে চামড়ায় বাঁধাই করা মোটা, পুরানো একটা বই নিয়ে এলেন মিস ভারনিয়া। 'প্রায় দেড়শো বছর আগে জার্মানীতে ছাপা হয়েছিল এ-বই।' ছেলেরা ঘিরে বসলে এক এক করে পাতা উল্টাতে শুরু করলেন তিনি। লেখক অনেক দিন বাস করেছেন ব্ল্যাক ফরেস্টে। রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতদের নাকি তিনি দেখেছেন। নিজের হাতে ছবি এঁকেছেন ওগুলোর। 'এই যে, এই ছবিটা দেখ।'

পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে একটা ড্রইং। কুৎসিত চেহারার একটা মানুষ যেন। মাথায় চূড়া আর বারান্দাওয়ালা চামড়ার টুপি, হাত-পায়ে বড় বড় রোম। কাঁধে ধরে রেখেছে একটা ছোট গাঁইতি। লাল চোখ, যেন জ্বলছে। রেগে আছে যেন কোন কারণে।

'ঠিক একটা...মানে এই চেহারাই দেখেছি জানালায়!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'লেখক এর নাম দিয়েছেঃ রত্নদানোর দুষ্ট রাজা!' বলে গেলেন মিস ভারনিয়া। 'কিছু কিছু রত্নদানো আছে, যারা খুবই খারাপ। তবে ভাল রত্নদানোও আছে। যারা খারাপ, লেখকের মতে, তাদের চোখ লাল হয়ে যায়।'

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা।

'খারাপটাকেই দেখেছি তাহলে!' আপনমনেই বলল রবিন। রত্নদানো সত্যিই দেখেছে, এই বিশ্বাস আবার ফিরে আসছে তার।

পাতা উল্টে সাধারণ পোশাক পরা আরও কিছু রত্নদানোর ছবি দেখালেন মিস ভারনিয়া। 'ঠিক এই ধরনের পোশাক পরা রত্নদানো দেখেছি আমি কয়েকটা,' আস্তে বইটা বন্ধ করে রেখে দিলেন তিনি। 'ছবি তো দেখাই আছে, তাই ব্যাটাদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছি। যা যা ঘটেছে, সবই বলব। তবে আগে অন্যান্য কথা কিছু বলে নিই। পুরানো দিনের কথা, যখন খোকা-খুকুদের জন্যে আমি লিখতাম।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল লেখিকার, অতীতের সোনালি দিনগুলোর কথা

মনে পড়ে যাওয়াতেই বোধহয়। 'অল্প বয়েস থেকেই লিখতে শুরু করি আমি। বাবা-মা মারা গেলেন, তখন নামডাক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আমার। ভাল পয়সা আসতে শুরু করল। এসব অনেক আগের কথা, তোমাদের জন্মও হয়নি তখন। আমার বাড়ি খুঁজে বের করত বাচ্চারা, আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসত, আমার সই নিতে আসত। বাচ্চাদেরকে ভালবাসি আমি, তাই আশপাশের বাড়ির যত বাচ্চা ছিল, সবাই ছিল আমার বন্ধু। ধীরে ধীরে সময় বদলাল, পরিবেশ বদলাল। পুরো অঞ্চলটা বদলে গেল কি করে, কি করে জানি! পুরানো বাড়িঘর সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হল, ভাল ভাল গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হল, বসত বাড়ির জায়গায় দিনকে দিন গজিয়ে উঠতে লাগল দোকানপাট। আমার বাচ্চা বন্ধুরা যেন হুড়মুড় করে বড় হয়ে গেল, কে যে কোথায় চলে গেল তারপর, জানি না। অনেকেই আমাকে এখান থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু পারলাম না। কিছুতেই এই পরিচিত বাড়িটা বিক্রি করে যেতে পারলাম না। যাবও না। যতদিন বাঁচব, এখানে, এই বাড়িতেই থাকব। এখানে কেন পড়ে আছি, বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে?'

তিনজনেই মাথা নোয়াল একবার।

'বদলেই চলেছে সবকিছু,' আবার বললেন মিস ভারনিয়া। 'বেশ কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে থিয়েটারটা। ফলে লোক সমাগমও অনেক কমে গেছে আগের চেয়ে, প্রায় নির্জনই বলা চলে এখন অঞ্চলটাকে। গেটে কার্ড লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পুরানো বন্ধুদের কেউ যদি কখনও আসে, শিস দিয়ে আমাকে ডাকবে। এটাই নিয়ম ছিল, এভাবেই ডাকত আমার রত্নদানো, বামন আর খাটোভূতেরা।' লেখিকার চোখের কোণ টলমল করছে। 'জান, এখনও কালেভদ্রে ওদের কেউ না কেউ আসে, শিস দিয়ে ডাকে আমাকে। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিই। কিন্তু আগের সেই নিষ্পাপ ফুলগুলোকে আর দেখি না! ওরা আজ অনেক বড়!' চুপ করলেন মিস ভারনিয়া।

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'যাব না যাব না, বলছি বটে, কিন্তু যাবার দিন হয়ত এসে গেছে আমার,' বললেন মিস ভারনিয়া। 'আমাকে সরে যেতে বাধ্য করবে ওরা। ইতিমধ্যেই কয়েকবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মিস্টার রবার্ট। আমার জায়গাটা কিনে নিতে পারলে তার সুবিধে হয়। কিন্তু মুখের ওপর মানা করে দিয়েছি। ওরা বুঝতে পারে না, আমি এখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি, জীবনের সোনালি দিনগুলো আমার এখানেই কেটেছে, এই জায়গা ছেড়ে আমি কি করে যাই? আমার খাটোভূতদের স্মৃতি যে জড়ানো রয়েছে এর প্রতিটি ইঁটকাঠে!'

মহিলাকে বাড়ি ছাড়া করতে খুব কষ্ট হবে মিস্টার রবার্টের, বুঝতে পারল তিন গোয়েন্দা। আদৌ পারবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরেক কাপ চা ঢেলে নিলেন মিস ভারনিয়া। 'আমার অতীত নিয়ে বড় বেশি বকবক করে ফেলেছি, না? হয়ত তোমাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু কতদিন পর মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি! উহ্, কতদিন!' কাপে চুমুক দিলেন তিনি। 'থাক এখন ওসব কথা। কাজের কথায় আসি। মাত্র কয়েক রাত আগে, হ্যাঁ, মাত্র কয়েক রাত। রত্নদানোদের দেখেছি আমি। না না, আমার বাচ্চা বন্ধু নয়, সত্যিকারের দানো!'

'খুলে বলুন, প্লীজ,' অনুরোধ করল কিশোর। 'রবিন, নোট নাও।'

পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করল রবিন।

'বয়েস হয়েছে,' বললেন মিস ভারনিয়া। 'কিন্তু ঘুম ভালই হয় আমার এখনও। কয়েক রাত আগে, অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। নরম মাটিতে গাঁইতি চালাচ্ছে যেন কেউ, এমনি শব্দ।'

'মাঝরাত? গাঁইতি?' ভুরু কুঁচকে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ। প্রথমে ভেবেছি, ভুল শুনেছি। রাত দুপুরে মাটি কাটতে আসবে কে? একমাত্র...'

'...রত্নদানোরা ছাড়া!' বাক্যটা সমাপ্ত করে দিল মুসা।

'হ্যাঁ, রত্নদানো ছাড়া!' মাথা ঝাঁকালেন মিস ভারনিয়া। 'উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম! ও-মা! আঙিনায় চারটে খুদে মানুষ! একেবারে ছবিতে যে রকম দেখেছি, তেমনি পোশাক পরা। লাফাচ্ছে ওরা, নাচানাচি করছে, খেলছে আনন্দে! ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেল জীবগুলো!' ছেলেদের মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করলেন লেখিকা, তাঁর কথা বিশ্বাস করছে কিনা ওরা। 'আমি স্বপ্ন দেখিনি। পরের দিন পরিচিত এক কনস্টেবলকে রাস্তায় দেখে তাকে ডেকে বললাম সব কথা। কি একখান চাউনি যে দিল আমাকে! আহ্, যদি দেখতে!' ক্ষণিকের জন্যে ঝিক করে উঠল মহিলার নীল চোখের তারা। আমাকে উপদেশ দিল ব্যাটা! নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখতে বলল। শিগগিরই বাইরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসতে বলল। ওকেও আচ্ছামত কথা শুনিয়েছি আমি। ওর সামনেই প্রতিজ্ঞা করেছি, রত্নদানোর কথা আর কক্ষণো বলব না পুলিশকে।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ হেসে উঠলেন মিস ভারনিয়া। 'আসলে পুলিশেরও দোষ দেয়া উচিত না। রাতদুপুরে রত্নদানো দেখেছি, একথা বললে কে বিশ্বাস করতে চাইবে? যাই হোক, সেদিন জোর করেই মনকে বোঝালাম, রত্নদানো দেখিনি। ওসব আমার কল্পনা। দ্বিতীয় রাত গেল, কিছু ঘটল না। তৃতীয় রাতে আবার দেখলাম ওদের। একই সময়ে, একই জায়গায়। তাড়াতাড়ি ফোন করে বললাম আমার এক ভাইপোকে। বব, আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বিয়ে করেনি এখনও, মাইল কয়েক দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে সে। ওকে অনুরোধ করলাম আসতে। অবাক হল, কিন্তু আসবে বলে কথা দিল। ভাঁড়ারে

দানোদের হুটোপুটির আওয়াজ পেলাম। টর্চটা নিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নামলাম, এগোলাম ভাঁড়ারের দিকে। যতই এগোলাম, শব্দ আরও স্পষ্ট হতে থাকল। ঘরে ঢুকেই টর্চের সুইচ টিপে দিলাম। কি দেখলাম জান?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তিন ছেলে। একই সঙ্গে বলে উঠল, 'কী!'

তিনজনের দিকেই একবার করে তাকালেন মিস ভারনিয়া। স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু না!'

চেপে রাখা শ্বাস শব্দ করে ছাড়ল রবিন। পুরোপুরি হতাশ হয়েছে।

'হ্যাঁ, প্রথমে কিচ্ছু না!' আবার বললেন মিস ভারনিয়া। 'টর্চ নিভিয়ে দিলাম। আবার ওপরে উঠে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই দেখলাম ওটাকে। ছোট একটা মানুষের মত জীব, ফুট তিনেক লম্বা। চামড়ার টুপি, চামড়ার কোট-প্যান্ট, চোখা মাথাওয়ালা জুতো। নোংরা দাড়ি, বোধহয় মাটি লেগেছিল। এক হাতে একটা গাঁইতি কাঁধে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে মোমবাতি। মোমের আলোয় ওর চোখ দেখতে পেলাম, টকটকে লাল, যেন জ্বলছে!'

'ঠিক! ওই ব্যাটাকেই খানিক আগে দেখেছি আমি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'রত্নদানো। কোন সন্দেহ নেই,' সায় দিয়ে বললেন মিস ভারনিয়া।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'তারপর?' হঠাৎ প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।

কাপে চুমুক দিলেন মিস ভারনিয়া, অল্প অল্প কাঁপছে তাঁর হাত। 'আমার দিকে চেয়ে ফোঁসে উঠল দানোটা। গাঁইতি বাগিয়ে শাসাল। তারপর এক ফুঁয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করে বন্ধ হল দরজার পাল্লা। ছুটে গেলাম দরজার কাছে। বন্ধ! বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে। ভাঁড়ারে আটকা পড়লাম আমি!'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল মুসা, থেমে গেল। ঘরের দূর প্রান্তে ঝনঝন শব্দ উঠল। আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল ওরা, চমকে উঠল ভীষণ ভাবে।

ছয়

'সর্বনাশ!' কণ্ঠস্বরে মনে হল মিস ভারনিয়ার গলা চেপে ধরেছে যেন কেউ। 'হল কি?...আরে! আমার ছবিটা পড়ে গেছে।'

ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা। মেঝেতে পড়ে আছে সোনালি ধাতব ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা বড়সড় ছবি। ছবিটা চিৎ করল কিশোর। মিস ভারনিয়ার সুন্দর একটা ছবি, তরুণী ছিলেন তখন তিনি।

'আমার বইয়ের ছবি আঁকত যে শিল্পী,' বললেন লেখিকা, 'সে-ই এই ছবিটা

এঁকে দিয়েছিল।'

ছবিতে ঘাসের ওপর বসে বই পড়ছেন মিস ভারনিয়া, তাঁকে ঘিরে বসে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, লেখিকার 'রত্নদানো', 'বামন', আর 'খাটোভূত'।

ওপর দিকে তাকাল কিশোর। ছাতের হুক থেকে ঝুলছে একটা সরু শেকল, ওটাতেই ঝোলানো ছিল ছবিটা। কোন কারণে শেকল ছিঁড়ে পড়েছে, ফ্রেমের সঙ্গে লাগানো আছে শেকলের ছেঁড়া একটা অংশ।

ছেঁড়া মাথাটা ভালমত পরীক্ষা করল কিশোর, মুখের ভাব বদলে গেল। 'মিস ভারনিয়া, শেকলটা ছিঁড়ে পড়েনি। লোহাকাটা করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল এমন ভাবে, যাতে ছবিটা ঝুলে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বাতাসে বা অন্য কোনভাবে নাড়া লাগলেই খসে পড়ে।'

'বল কি!' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন লেখিকা। 'রত্নদানো! নিশ্চয় রত্নদানোর কাজ! যে রাতে···ও, এখনও আসিনি সে-কথায়।'

'শেকল জোড়া লাগিয়ে আবার ঝুলিয়ে দিচ্ছি ছবিটা। কাজ করতে করতে আপনার কথা শুনব।···ও হ্যাঁ, প্লায়ার্স আছে?'

'আছে।'

কিশোর আর মুসা শেকল জোড়া লাগাতে বসে গেল। মিস ভারনিয়া তাঁর কাহিনী বলে গেলেন, নোট নিতে থাকল রবিন।

সে-রাতে ভাঁড়ারে আটকা পড়েছিলেন মিস ভারনিয়া। তাঁর ভাইপো এসে দরজার ছিটকিনি খুলে তাঁকে উদ্ধার করল। ফুফুর কাহিনী মন দিয়ে শুনল বব, কিন্তু এক বিন্দু বিশ্বাস করল না। অবশেষে আস্তে করে বলল, কোন চোর-টোর ঢুকেছিল বাড়িতে, সে-ই দরজা আটকে দিয়েছে।···

'এক মিনিট, ভারনিয়া,' হাত তুলল কিশোর। 'ছবিটা আবার তুলে দিই, তারপর শুনব বাকিটা।'

একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছবিটা তার হাতে তুলে দিল কিশোর। রবিন দেখল, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ। এই উজ্জ্বলতার কারণ জানে নথি। নিশ্চয় কোন বুদ্ধি এসেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়।

'কি হল, কিশোর?' কাছে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন।

শেকল জোড়া লাগিয়ে ছবিটা আবার আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে এল মুসা।

রবিনের দিকে চেয়ে হাসল কিশোর। 'মনে হয় গোল্ডেন বেল্ট রহস্যের কিনারা করে ফেলেছি,' ফিসফিস করে বলল।

'তাই। বল, বল!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রবিন। 'কি করে কোন পথে চুরি করল?'

'পরে, এখন বলার সময় না। মিস ভারনিয়ার কথা শেষ হয়নি এখনও, সেটা শুনি আগে।'

হতাশ হল রবিন। জানে, এখন আর চাপাচাপি করে লাভ নেই। কিশোরের সময় না হলে সে কিছুই বলবে না। মিস ভারনিয়ার ছবিটার দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করল কি করে চুরি হয়েছে গোল্ডেন বেল্ট, কিছুই বুঝতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। আবার গিয়ে আগের জায়গায় নোট লিখতে বসল।

'ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে আমাকে রাতে থাকতে বলল বব,' আবার শুরু করলেন মিস ভারনিয়া। 'রাজি হলাম না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বব, রত্নদানোরা আর এল না। রহস্যজনক শব্দও হল না। শেষে চলে গেল সে। সে-রাতে আর কিছুই ঘটল না। পরের রাতে আবার রহস্যময় শব্দ শুনলাম। একবার ভাবলাম, ববকে ফোন করি, কিন্তু আগের রাতে তার হাবভাব যে-রকম দেখেছি, আর ডাকতে ইচ্ছে হল না। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নিচের তলায়। লাইব্রেরিতে খুটখাট ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। গিয়ে উঁকি দিলাম। আমার সমস্ত বই মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো, কয়েকটা ছবি খুলে নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে বইয়ের স্তূপের ওপর। যত রকমে সম্ভব, আমাকে বিরক্ত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে যেন রত্নদানোরা। মনে হয়, ওই রাতেই শেকলটা করাত দিয়ে কেটেছে ওরা।

'খুব দমে গেলাম। ববকে ফোন করলাম পরদিন সকালে। লাইব্রেরির অবস্থা দেখল সে, কিন্তু রত্নদানোরা করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করল না। কায়দা করে বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দোষটা আমার ওপরই চাপিয়ে দিল। ঘুমের ঘোরে আমি নিজেই নাকি লাইব্রেরিতে ঢুকে এই কাণ্ড করেছি। আমার মাথায় গোলমাল হয়েছে, আকারে-ইঙ্গিতে এ-কথাও বলল। কোন ভাল জায়গায় গিয়ে ক'দিন ভালমত বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিল। বিরক্ত হয়ে শেষে তাকে বকাটকা দিয়ে বের করে দিলাম। আমি জানি আমি কি করেছি, কি দেখেছি। আমি জানি, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিনি। কিন্তু এসবের মানে কি, কিছুই বুঝতে পারছি না!' এক হাত দিয়ে আরেক হাত মুচড়ে ধরলেন মিস ভারনিয়া। 'কি মানে? কেন ঘটছে এসব? আমার ওপর রত্নদানোরা খেপে গেল কেন হঠাৎ?'

প্রশ্নগুলোর জবাব মুসা আর রবিনও জানে না। অবিশ্বাস্য এক গাঁজাখুরি গল্প, কিন্তু মিস ভারনিয়া যে মিছে কথা বলছেন না, এটাও ঠিক, অন্তত তাদের তাই মনে হচ্ছে।

প্রশ্নগুলোর জবাব কিশোরেরও জানা নেই। অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'এখন আমাদের প্রথম কাজ, রত্নদানোর অস্তিত্ব সম্পর্কে শিওর হওয়া। কেন আপনাকে বিরক্ত করছে ওরা, সেটা পরে জানা যাবে।'

'বেশ, যা ভাল বোঝ কর,' হাতের তালু দিয়ে তালু চেপে ধরলেন মিস ভারনিয়া।

'ফাঁদ পাততে হবে ব্যাটাদের জন্যে,' বলল কিশোর।

'ফাঁদ?' সামনে ঝুঁকল মুসা। 'কিসের ফাঁদ?'

'রক্তদানোদের জন্যে। আজ রাতটা আমরা যে-কেউ একজন এখানে কাটাব, রক্তদানো ধরার চেষ্টা করব।'

'কে থাকছে?'

'তুমিই থাক।'

'দাঁড়াও!' হাত তুলল মুসা। 'আমি টোপ হতে চাই না। রক্তদানো আছে বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ঝুঁকি নেয়ারও ইচ্ছে নেই আমার।'

'কিন্তু তুমি থাকলেই ভাল হয়। তোমার গায়ে সিংহের জোর, একবার যদি আঁকড়ে ধরতে পার, রক্তদানোর সাধ্যি নেই ছাড়া পায়। তুমিই থাক, মুসা।'

প্রশংসায় গলে গেল মুসা। তবু আমতা আমতা করল, 'কিন্তু একা···রবিন থাকলে···'

'না না, আমি পারব না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রবিন। 'আজ রাতে আমার খালাম্মা বেড়াতে আসবে। আমাকে থাকতেই হবে বাড়িতে। কাজেই আমি বাদ।'

'তোমার তো আজ কোন কাজ নেই, কিশোর,' বলল মুসা। 'আগামী কাল রোববার, ইয়ার্ড বন্ধ। কালও কোন কাজ নেই। তুমিই থাক না আমার সঙ্গে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। মাথা কাত করল। 'ঠিক আছে, থাকব। একজনের জায়গায় দু'জন, বরং ভালই হবে। মিস ভারনিয়া, আমরা থাকলে আপনার কোন অসুবিধে হবে?'

'না না, অসুবিধে কি?' খুশিতে উজ্জ্বল হল লেখিকার মুখ। 'বরং ভালই লাগবে। সিঁড়ির মাথায় একটা ঘর আছে, ওখানে থাকতে পারবে। তোমাদের খারাপ লাগবে কিনা সেটা বল। সাংঘাতিক কোন বিপদে না আবার পড়ে যাও।'

'রক্তদানোরা বিপদে ফেলবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এ পর্যন্ত আপনার গায়ে হাত তোলেনি ওরা, দূর থেকেই ভয় দেখানর চেষ্টা করেছে শুধু। আমাদেরও ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। আজ রাতে ওদের একটাকে ধরার চেষ্টা করব! রাতের অন্ধকারে ফিরে এসে অপেক্ষা করব আমরা। বেরোব হৈ-হট্টগোল করে, ফিরব চুপে চুপে, যাতে কেউ না দেখে।'

'ভাল বুদ্ধি!' সায় দিলেন মিস ভারনিয়া। 'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব আমি। শুধু একবার বেল বাজাবে, গেটের তালা খুলে দেব।'

হৈ-চৈ করে মিস ভারনিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। আড়াল থেকে তাদের ওপর কেউ চোখ রেখে থাকলে, সে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে।

গেটের বাইরে এসেই প্রশ্ন করল মুসা, 'কিশোর, সব কিছুই মহিলার অনুমান নয়ত?'

'জানি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। 'হতেও পারে। কিন্তু

মহিলার ব্যবহারে মনে হল না মাথায় কোন গোলমাল আছে। হয়ত সত্যিই রক্তদানোদের দেখেছেন!'

'দুর্‌র্‌! রক্তদানো থাকলে তো দেখবে?'

'থাকতেও পারে। লোকে তো বিশ্বাস করে!'

'লোকে তো ভূতও বিশ্বাস করে।'

জবাব দিল না কিশোর।

রবিন বলল, 'বিশ্বাস অনেক সময় সত্যিও হয়ে যায়। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকার উপকূলে একটা আজব মাছ ধরা পড়েছিল। তার আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওই মাছ। কোয়েলাকান্থ ওর নাম। একটা দুটো নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোয়েলাকান্থ বেঁচে আছে আজও, ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরের তলায়। তাহলে?' লেকচার দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে রবিন। 'ধর, অনেক অনেক বছর আগে হয়ত বামন মানুষেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করত। তারপর একদিন এল লম্বা মানুষেরা, ওদের ভয়ে ছোট মানুষেরা গিয়ে লুকাল মাটির তলায়। অনেকেই মরে গেল, কিন্তু কেউ কেউ মাটির তলায় বাস করাটা রপ্ত করে নিল। ব্যস, টিকে গেল ওরা; হয়ত কোয়েলাকান্থের মতই আজও টিকে আছে ওরা। তাদের নাম রক্তদানো কিংবা বামন কিংবা খাটোভূত হতে দোষ কি?'

'চমৎকার থিওরি' হাসল কিশোর। 'দেখা যাক, আজ রাতে রক্তদানো ধরা পড়ে কিনা। পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে যাব আমরা রাতারাতি।'

পথে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কেবল কিশোর।

অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। 'কী দাঁড়িয়ে আছ চুপচাপ! চল বাড়ি যাই। খিদে পেয়েছে।'

'তোমার পেটে রাক্ষস ঢুকেছে!' সহকারীকে মৃদু ধমক দিল গোয়েন্দাপ্রধান! 'এস, আগে পুরো ব্লকটা ঘুরে দেখি। পাতাবাহার আর কাঠের বেড়া শুধু ভেতর থেকে দেখেছি, বাইরে থেকে একবার দেখি।'

'রক্তদানোরা কোন পথে বেরোয়, সেটা দেখতে চাইছ?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। তখন তাড়াহুড়োয় হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। ভাল করে দেখলে পথটা পেয়েও যেতে পারি।'

থিয়েটার বাড়ির এক পাশ থেকে শুরু করল ওরা। খিদের কথাটা আকারে-ইঙ্গিতে আরেকবার জানাল মুসা। হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন। শিগগিরই বাড়ি যাবে, কথা দিয়ে, কাজ শুরু করল কিশোর।

থিয়েটারের সদর দরজা তক্তা লাগিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। তার ওপর লাগানো হয়েছে কন্ট্রাকটরের সাইনবোর্ড। মোড় ঘুরে সরু গলিপথটায় এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা, মিস ভারনিয়ার বাড়ির পেছন দিয়ে যেটা গেছে সেটাতে। খানিক

দূর এগিয়েই এক পাশে একটা লোহার গেট পড়ল, থিয়েটার বাড়ির পেছনের গেট। পাল্লা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে, তারমানে খোলা। ভেতর থেকে হঠাৎ ভেসে এল মানুষের গলা।

'আশ্চর্য তো!' গেটের পাল্লায় লাগানো বোর্ডের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'নোটিশ ঝুলিয়েছে বন্ধ, অথচ খোলা!'

'নিশ্চয় ভূতেরা কথা বলছে,' বিড় বিড় করে বলল মুসা। 'নইলে এখানে মরতে আসবে কে? এই সময়?'

সঙ্গীদের নিয়ে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। সিঁড়ি, তারপর আরেকটা দরজা। দরজার কপালে লেখা 'স্টেজডোর'। রঙ চটে গেছে, কিন্তু পড়া যায়।

পাথরের সিঁড়িতে বসে পড়ল কিশোর। ভেতর থেকে আর কথা শোনা যায় কিনা তার অপেক্ষা করছে। একবার খুলছে আবার বাঁধছে জুতোর ফিতে। দু'জন মানুষের চাপা গলায় কথা শোনা গেল আবার।

'শুনছ...' শুরু করেই থেমে গেল মুসা।

'শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'গোল্ডেন বেল্ট শব্দটা বুঝতে পেরেছি!'

'গোল্ডেন বেল্ট! মানে...' বলতে গিয়ে বাধা পেল রবিন।

'আস্তে!' কান খাড়া করে ঘরের ভেতরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর। 'মিউজিয়ম শব্দটাও শুনলাম!'

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করল মুসা, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'কি খুঁজতে এসে কি পেয়ে যাচ্ছি! পুলিশ ডেকে আনব নাকি?'

'ভালমত বুঝে নিই, তারপর ডাকা যাবে,' উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতল কিশোর।

রবিন আর মুসাও এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। আবার 'মিউজিয়ম' শব্দটা বলা হল, এবার শুনল তিনজনেই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দরজায় কান পাতল ওরা। পাল্লা ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে শুধু, ঠেলা লাগল, খুলে গেল হাঁ হয়ে। বেশি হেলে ছিল কিশোর, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। পড়ার আগে মুসার কাপড় খামচে ধরে পতন রোধের চেষ্টা করল, পারল তো না-ই, মুসার ভারসাম্যও নষ্ট করে দিল। গোয়েন্দা সহকারীও পড়ল, এবং পড়ল রবিনকে নিয়ে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করল ওরা। ঠিক এই সময় মুসা আর রবিনের কলার চেপে ধরল ভারি থাবা। 'চোর!' গর্জে উঠল লোকটা। 'মিস্টার রবার্ট, চোর! কয়েকটা ছেলে ঢুকেছে চুরি করতে!'

সাত

গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক। কালো ঘন ভুরু। চোখ মুখ পাকিয়ে রেখেছে। কলার ধরে টেনে তুলল সে রবিন আর মুসাকে। 'ব্যাটারা! এইবার পেয়েছি! মিস্টার রবার্ট, আরেকটা রয়েছে! জলদি এসে ধরুন!'

'কিশোর, পালাও!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'বোরিসকে নিয়ে এস!'

পালাল না কিশোর, দাঁড়িয়ে রইল। 'ভুল করছেন আপনি,' নিরীহ গলায় লোকটাকে বলল সে। 'খালি বাড়িতে কথার আওয়াজ পেয়ে অবাক লাগল, তাই দেখতে এসেছি। আমরাই বরং ভেবেছি, চোর ঢুকেছে।'

'তাই, না?' কড়া চোখে লোকটা তাকাল কিশোরের দিকে। 'চোর ঢুকেছে ভেবেছ?'

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, এমনি চেহারা করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর।

আরেকজন এসে দাঁড়াল, রোগা শরীর, পাতলা চুল। 'আরে বার্ট, কি করছ? খালি বাড়ি, তাই সন্দেহ হয়েছে ওদের। হতেই পারে।'

'ওদের ভাবসাব পছন্দ হচ্ছে না আমার, মিস্টার রবার্ট!' বার্টের গলায় সন্দেহ।

'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কথা বলছি,' এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। 'আমি জন রবার্ট। এই বাড়ির মালিক। ভাঙচুর চলছে, নতুন করে বাড়ি তৈরি করব, তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসি। এ হল বার্ট ইঅং, আমার দারোয়ান। তা তোমাদের কেন সন্দেহ হল ভেতরে চোর ঢুকেছে?'

'গেটে তালা...' শুরু করল কিশোর, কিন্তু তার কথার মাঝেই বলে উঠল মুসা, 'গোল্ডেন বেল্ট শব্দটা কানে এল! সন্দেহ জাগল আমাদের। আরও ভালমত কান পাতলাম, মিউজিয়ম শব্দটাও শুনলাম। ধরেই নিলাম বেল্ট চুরি করে এখানে ঢুকেছে চোরেরা!'

'মিস্টার রবার্ট,' গম্ভীর গলায় বলল ইঅং। 'ছেলেগুলোর মাথায় হয় গোলমাল আছে, নইলে চোর। আমি যাই, পুলিশ নিয়ে আসি।'

'থাম!' ধমক দিল রবার্ট। 'তুমি কি বোঝ?...আচ্ছা, গোল্ডেন বেল্ট...!' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় হাসল সে। 'অ-অ, বুঝেছি! মনে পড়েছে। আমি আর বার্ট পরামর্শ করছিলাম থিয়েটারটা ভেঙে ফেলার আগেই গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টগুলো সরিয়ে ফেলব। সোনালি রঙ করা কিংবা গিলটি করা অনেক কারুকাজ, অনেক নকশা রয়েছে এখানে, একেবারে মিউজিয়মের মত মনে হয়। গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টকেই তোমরা গোল্ডেন বেল্ট শুনেছ। বুঝতে পারছি, গোল্ডেন বেল্ট চুরির ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছ তোমরা।' হাসল সে।

গোমড়া মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ইঅং। 'খুব বেশি কল্পনা করে বিচ্ছুগুলো।'

'তোমার কি?' কড়া গলায় বলল রবার্ট। 'খাও আর ঘুমাও। কল্পনা করবে কখন? কোন কিছু তোমাকে নাড়া দেয় নাকি? এই যে গত কয়েক রাতে কি সব শব্দ হল, ভয়ে পালাল দু'জন নাইট গার্ড, কেন কি হল, একবারও ভেবেছ?'

'শব্দ?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। 'কেমন শব্দ?'

'কি জানি! ওরা বলল, ভূতে নাকি দরজায় টোকা দেয়, গোঙায়,' বলল রবার্ট। 'আসলে, বাড়িটা পুরানো, ঢুকলে এমনিতেই গা ছমছম করে। অন্ধকারে নানারকম শব্দ হয়। কেন হয় দেখতে চাও? এস আমার সঙ্গে। গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্টও দেখতে পাবে। দেখবে?'

তিনজনই বলল, দেখবে।

'বার্ট, মেইন লাইনটা দিয়ে দাও তো। এস, তোমরা আমার সঙ্গে এস।' আগে আগে অন্ধকার একটা গলি ধরে এগোল রবার্ট। পেছনে অনুসরণ করল ছেলেরা।

অন্ধকারে কিছু একটা রবিনের গাল ছুঁয়ে গেল, চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বাদুড়!'

'হ্যাঁ,' অন্ধকার থেকে ভেসে এল রবার্টের গলা। 'অনেক বছর খালি পড়ে আছে বাড়িটা। বাদুড় আর ইঁদুরের আড্ডা! ওরাই রহস্যময় শব্দ করে। একেকটা ইঁদুর যা বড় না, বেড়াল খেয়ে ফেলতে পারবে!'

ঢোক গিলল রবিন, চুপ করে রইল। অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাপটানর শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কিচকিচ আওয়াজ হচ্ছে, শিরশির করে ওঠে গা।

হঠাৎ গাঁ ই-ই-চ করে উঠল কিসে যেন। চমকে উঠল ছেলেরা।

'ভয় পাচ্ছ?' অন্ধকারেই বলল রবার্ট। 'ও কিছু না। পর্দা টানার জন্যে, নানারকম সিনসিনারির ছবি ঝোলানর জন্যে পুলি আর মোটা দড়ি ব্যবহার হত. ছিঁড়ে গেছে বেশির ভাগই, পুলিতে মরচে পড়েছে। দড়িগুলোতে বাদুড় ঝুললেই টান পড়ে, বিচিত্র শব্দ হয়।...অহ্, এতক্ষণে আলো জ্বলল।'

মাথার ওপর বিশাল এক ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে, সবুজ, লাল, হলুদ আর নীল কাচের ফানুসগুলোতে বালি যেন লেপটে রয়েছে। এমনিতেই কম পাওয়ারের বাল্ব ওগুলোর ভেতরে, তার ওপর বালিতে ঢাকা পড়ায় আলো তেমন ছড়াচ্ছে না। অদ্ভুত এক রঙিন আলো আঁধারীর সৃষ্টি হয়েছে হলের ভেতরে। আবছামত দেখা যাচ্ছে হলের জিনিসপত্র। এক প্রান্তে মস্তবড় মঞ্চ। চারপাশে শুধু সিট আর সিট। বিরাট থিয়েটার ছিল এককালে।

হলের দু'পাশের দেয়ালে বড় বড় জানালা, তাতে সোনালি সুতোয় নকশা করা লাল মখমলের ভারি পর্দা ঝুলছে। দেয়ালে দেয়ালে নানা রকমের চিত্র, নাইট আর সারাসেনদের লড়াইয়ের দৃশ্য, যোদ্ধাদের পরনে সোনালি বর্ম। ঠিকই বলেছে রবার্ট, গোল্ড অ্যাণ্ড গিল্ট-এর ছড়াছড়ি। হলের ভেতরের পরিবেশও মিউজিয়ামের মত।

'উনিশশো বিশ সালে তৈরি হয়েছিল এই থিয়েটার,' বলল রবার্ট। 'মূরেরা তৈরি করেছিল। এ-ধরনের জাঁকজমক তখন পছন্দ করত লোকে। বাইরে থেকে দেখেছ না, কেমন দুর্গদুর্গ লাগে? এটাও তখনকার দর্শকদের পছন্দ ছিল। আজকাল তো এসব জায়গায় লোকে ঢুকতেই চাইবে না, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে!'

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরল রবার্ট। হঠাৎ একটা চেয়ারের হাতলে লাফিয়ে উঠল কালচে-ধূসর রোমশ একটা জীব, ছোটখাট একটা বেড়াল বললেই চলে।

'আমাদের একজন বাসিন্দা,' ইঁদুরটাকে দেখে হেসে বলল রবার্ট। 'অনেক বছর ধরে বাস করছে, তাড়াতে বহুত কষ্ট হবে।'

আগের ঘরটায় ফিরে এল ওরা। 'তারপর, মূরিশ থিয়েটারের ভেতর তো দেখলে। বাড়িটা ভাঙা হবে যেদিন, সেদিন এস। সে এক দেখার ব্যাপার। কয়েক হপ্তার মধ্যেই ভাঙব। গুডবাই, অ্যাঁ।'

ছেলেরা বাইরে বেরোতেই পেছনে বন্ধ করে দেয়া হল দরজা। ছিটকিনি তুলে দেয়ার শব্দ কানে এল ওদের।

'বাপরে বাপ!' ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'কি একেকখান ইঁদুর! বেড়াল কি, হাতিও খেয়ে ফেলবে! এ-জন্যেই পালিয়েছে নাইট গার্ডরা।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'রহস্যময় শব্দের ভালই ব্যাখ্যা। গোল্ডেন বেল্ট আর মিউজিয়মের ব্যাপারটাও বেশ ভালই বোঝানো হয়েছে!' জিভ আর টাকরার সাহায্যে বিচিত্র শব্দ করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিন্তুহ্...যাকগে, ওটা আমাদের কাজ নয়। আমরা এসেছি মিস ভারনিয়াকে সাহায্য করতে। চল, দেখাদেখির কাজটা শেষ করে ফেলি।'

গলিটা দেখল ওরা, ইঁটের দেয়াল আর কাঠের বেড়া পরীক্ষা করল, পাতাবাহারের বেড়ার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল! রত্নদানো বেরোনর কোন পথই নেই।

'নাহ্, কিছু পাওয়া গেল না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর। 'বুঝতে পারছি না!'

'এখন বোঝা যাবেও না!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'খিদেয় পেট জ্বলছে, বাড়ি যাবে নাকি তাই বল?'

'হ্যাঁ, এখানে এখন আর কিছু করার নেই। চল, যাই।'

গভীর মনোযোগে খবরের কাগজ পড়ছে বোরিস। ছেলেরা গাদাগাদি করে বসল তার পাশে। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে।

বড় রাস্তায় এসে উঠল ট্রাক, ছুটে চলল দ্রুতগতিতে।

একটা প্রশ্ন কেবলই খোঁচাচ্ছে রবিনকে। গোল্ডেন বেল্ট কি করে চুরি হয়েছে? কিশোরকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন

গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে ঘনঘন। এখন তাকে প্রশ্ন করলেও জবাব পাওয়া যাবে না।

অগত্যা কৌতূহল চেপে চুপ করে রইল রবিন।

আট

রকি বীচে পৌঁছুল ট্রাক। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল।

ট্রাক থেকে সবার আগে নামল মুসা। 'এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে আমাকে। ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ বাবার জন্মদিন। স্পেশাল খাবার রাঁধবে মা।'

'ঠিক আটটায় আসবে,' বলল কিশোর। 'বাড়িতে বলে এস, মিস্টার ক্রিস্টোফারের এক বান্ধবীর বাড়িতে রাতে থাকবে। আগামীকাল সকাল নাগাদ ফিরবে।'

'ঠিক আছে।' তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা।

ট্রাক থেকে কিশোরকে নামতে দেখে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী।

'এই যে কিশোর, এসেছিস,' বললেন চাচী। 'আধঘন্টা ধরে তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছেলেটা বসে আছে।'

'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে! কে, চাচী?'

'নাম বলল মিরো মুচামারু। জাপানী, কিন্তু ভাল ইংরেজি বলে। কত কথা বলল আমাকে। মুক্তার কথা বলল। ট্রেনিং দেয়া ঝিনুক নাকি আছে, মুক্তা ফলানতে কাজে লাগে ওগুলো। আরও কত কথা!' হাসলেন মেরিচাচী।

মনে মনে কিশোর হাসল। ইয়ার্ডের কাজ করানর সময় চাচীর এই হাসি কোথায় থাকে, ভেবে অবাক হল সে। 'কই, চল তো দেখি? রবিন, এস।' হাঁটতে হাঁটতে বলল সে, 'চাচী, আজ রাতে মিস্ ডারনিয়ার বাড়িতে থাকতে হবে। কি সব শব্দ নাকি রাতে বিরক্ত করে মহিলাকে। আমি আর মুসা আজ রাতে পাহারা দেব ঠিক করেছি।'

'তাই নাকি!' কিশোরকে অবাক করে দিয়ে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন চাচী। 'ঠিক আছে, যাস। বোরিসকে ছেড়ে দিস, সকালে গিয়ে নিয়ে আসবে আবার।' কাচে ঘেরা অফিসের সামনে এসে ডাক দিলেন তিনি, 'মিরো, কিশোর এসেছে। এই রবিন, না খেয়ে যেয়ো না কিন্তু। আধ ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ-রে কিশোর, মুসাকে দেখছি না?'

'ওর বাবার জন্মদিন, ভাল রান্নাবান্নার ব্যবস্থা, ও কি আর থাকে?' হেসে বলল কিশোর।

'পাগল ছেলে!' সস্নেহ হাসি ফুটল চাচীর মুখে। 'ও হ্যাঁ, মিরোকেও ধরে রাখিস। খেয়ে যাবে এখানেই।' বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি।

মেরিচাচীর ডাক শুনে দরজায় বেরিয়ে এল এক কিশোর। লম্বায় রবিনের সমান হবে। পরনে নিখুঁত ছাঁটের নীল সুট, গলায় নীল টাই। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। খাটো করে ছাঁটা চুল।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল মিরো। 'তুমি নিশ্চয় কিশোর-স্যান?' কথায় জাপানী টান স্পষ্ট। 'আর তুমি রবিন-স্যান? আমি মিরো, টোহা মুচামারুর ছেলে। আমার বাবা সুকিমিচি জুয়েলারস কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ।'

'হ্যাল্লো, মিরো,' জোরে মিরোর হাত ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'গতকাল পরিচয় হয়েছে তোমার বাবার সঙ্গে।'

'জানি,' লজ্জিত হাসি হাসল মিরো। 'তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি বাবা, এ-ও জানি। কিছু মনে কোরো না, বাবার তখন মাথা ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলে ফেলেছে। তার হয়ে তোমাদের কাছে মাফ চাইতে এসেছি।'

'আরে দূর, কি যে বল?' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'যা অবস্থা ছিল তখন, মাথার ঠিক থাকে নাকি মানুষের? এতবড় দায়িত্ব, এত টাকার ব্যাপার। তাছাড়া আমাদের বয়েস কম, রত্নচোরের পেছনে লাগতে পারব বলে ভাবেননি আর কি। এখন বললেও অবশ্য কেসটা আর নিতে পারব না। অন্য একটা কাজ নিয়ে ফেলেছি, রত্নদানো ধরার কাজ।'

'রত্নদানো!' বড় বড় হয়ে গেল মিরোর চোখ। 'ওই যে বামন মানুষেরা, যারা সুড়ঙ্গে বাস করে, আর মাটির তলায় গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়? জাপানেও ওদের কথা জানে লোক। খবরদার, বেশি কাছাকাছি যেয়ো না! ভয়ঙ্কর জীব ওরা। বিপদে ফেলে দেবে।'

'বিপদে ফেলুক আর যা-ই করুক, আজ রাতে একটাকে ধরার চেষ্টা করব।' কিশোর বলল দাঁড়িয়ে কেন, চল বসি। চা খাবে?'

'খেয়েছি,' আবার অফিসে ঢুকল মিরো কিশোরের পিছু পিছু।

'আচ্ছা, আমাদের নাম জানলে কি করে?' বসতে বসতে বলল কিশোর। 'ঠিকানা পেলে কোথায়?'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল মিরো। দলে মুসড়ে গিয়েছিল কার্ডটা, টেনেটুনে আবার ঠিক করা হয়েছে। 'মিউজিয়মে কুড়িয়ে পেয়েছি এটা। আর ঠিকানা? এ-শহরে তো তোমরা পরিচিত। প্রথম যে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে-ই বলে দিল।'

'কপাল ভাল, শুঁটকির পাল্লায় পড়নি,' হেসে বলল রবিন।

'শুঁটকি?' মিরো অবাক।

'একটা ছেলে, আমাদের দেখতে পারে না,' প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, মিরো, গোল্ডেন বেল্ট খুঁজে পাওয়া গেছে?'

'না, কিশোর-স্যান,' হতাশভাবে মাথা নাড়ল মিরো। 'এত খুঁজল পুলিশ আর

আমাদের গার্ডরা, লাভ হল না। খুব মুষড়ে পড়েছে বাবা। তার নাকের ডগা দিয়ে বেল্ট চুরি করে নিয়ে গেল চোর, কিছুই করতে পারল না, এই দুঃখেই কাতর হয়ে পড়েছে। বেল্টটা না পাওয়া গেলে তার চাকরি থাকবে না, লজ্জা তো আছেই।'

কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কথা খুঁজে পেল না রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ বলল, 'যা যা জেনেছ, সব খুলে বল তো মিরো?'

নতুন তেমন কিছুই জানার নেই, খবরের কাগজে প্রায় সবই জেনেছে কিশোর। আবার সে-সবই শুনল মিরোর মুখে। কোন পথে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোল্ডেন বেল্ট, জানা যায়নি। রেইনবো জুয়েলস না নিয়ে কেন বেল্টটা নিল, এটাও একটা বড় রহস্য। পুরানো কথা সব।

'আমার ধারণা, গার্ডদের কেউই চুরি করেছে,' বলল রবিন।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল মিরো। 'অনেক বেছে, দেখে শুনে তবে নেয়া হয়েছে গার্ড। প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। তবু সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেছে বাবা। কাউকেই সন্দেহ হয়নি তার।'

'আচ্ছা, মিস্টার মার্চের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তার সম্পর্কে কি জেনেছে পুলিশ?'

মিরো জানাল, পুলিশের দৃঢ় ধারণা ছিল, বেল্ট চুরির সঙ্গে মার্চও জড়িত। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। প্রশ্ন, তাহলে মিউজিয়মে সেই অভিনয় কেন করল মার্চ? স্রেফ টাকার জন্যে। চুরির আগের দিন নাকি ফোনে এক মহিলা যোগাযোগ করেছে তার সঙ্গে (মহিলাকে চেনে না অভিনেতা, দেখেনি), বলেছে ছোট্ট একটা অভিনয়ের জন্যে পঞ্চাশ ডলার দেয়া হবে মার্চকে। লোভ দেখিয়েছে, এতে টাকা তো পাবেই অভিনেতা, তার নামও ছড়িয়ে পড়বে হলিউডে। পত্রিকায় ছবি ছাপা হবে তার, নাম ছাপা হবে। এরপর নাকি একটা ছবি করবে মহিলার স্বামী, ছবির নাম হবে 'দ্য গ্রেট মিউজিয়ম রবারি'। সেই ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে মার্চকে। ব্যস, মজে গেল অভিনেতা। রাজি হয়ে গেল মিউজিয়মে ছোট্ট অভিনয়টুকু করতে। সেদিনই ডাকে তার কাছে এল ছোট্ট একটা প্যাকেট, তাতে একটা নকল পাথর, আর একটা খামে পঞ্চাশ ডলার।

'যা ভেবেছি,' বলল কিশোর। 'বেল্ট চুরির সঙ্গে জড়িত নয় টোড মার্চ। কি করে কোন পথে বেল্টটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও বুঝতে পারছে না পুলিশ, না?'

'না, পারছে না।'

'যদি বলি, বেল্টটা এখনও মিউজিয়মেই রয়েছে,' বোমা ফাটাল যেন কিশোর।

'মিউজিয়মে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কিন্তু মিউজিয়মের তো কোথাও খোঁজা বাদ নেই!' প্রতিবাদ করল মিরো। 'বেল্ট লুকানর আর জায়গা কোথায়, কিশোর স্যান?'

'আজ আরেকটা কেস নিয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ বুঝে গেলাম কোথায় আছে গোল্ডেন বেল্ট। আমার ধারণা...' নাটকীয় ভাবে চুপ করল কিশোর।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রবিন আর মিরো।

'রবিন,' কিশোর বলল। 'মিস ভারনিয়ার বাড়িতে যে ছবিটা পড়ে গিয়েছিল...'

'হ্যাঁ। বল।'

'বড়সড় ভারি ছবি,' যেন রবিন দেখেনি, তাকে ছবিটা কেমন বোঝাচ্ছে কিশোর, 'ধরে তুললাম। প্রায় আড়াই ইঞ্চি মত মোটা ফ্রেম, ছবির পেছনে জায়গা রয়েছে অন্তত দুই ইঞ্চি। ওই রকম ফ্রেম কিংবা তার চেয়েও বড় অনেক ফ্রেমে বাঁধাই ছবি ঝোলানো রয়েছে মিউজিয়মে। তারমানে...'

'...তারমানে,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ছবির পেছনের ওই খালি জায়গায় গোল্ডেন বেল্ট লুকিয়ে রাখা হয়েছে! অন্ধকারে বেল্টটা তুলে নিয়ে ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে চোর!'

'চোরেরা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল কিশোর। 'মিস্টার মার্চকে ফোন করেছিল যে মহিলা, চোরের সঙ্গে সে-ও নিশ্চয় জড়িত।'

আর শোনার অপেক্ষা করল না মিরো, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'সারা মিউজিয়ম খুঁজেছে ওরা, কিন্তু ছবির পেছনে খুঁজে দেখার কথা মনে আসেনি কারও! এখুনি গিয়ে বাবাকে বলছি।'

'উত্তেজনা কমার অপেক্ষায় থাকবে চোর,' মিরোর কথা যেন শোনেইনি কিশোর। 'তল্পিতল্পা গুছিয়ে একদিন সুকিমিচি কোম্পানি চলে যাবে, তখন সময় বুঝে গিয়ে বেল্টটা নিয়ে আসবে। ও হ্যাঁ, তোমার বাবাকে বল, ব্যালকনিতে ঝোলানো ছবিও যাতে বাদ না দেয়।'

'কিন্তু ব্যালকনিতে ওঠার পথ তো বন্ধ!'

'তাতে কি? একটা দড়ি হলেই উঠে যাওয়া যায় ওখানে। লুকানর সবচেয়ে ভাল জায়গা সারা মিউজিয়মে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, কিশোর স্যান!' জ্বলজ্বল করছে মিরোর চোখ। 'তোমার অনুমান ঠিকই হবে! আমি যাই, বাবাকে গিয়ে বলি।'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলল কিশোর। 'চাচী খেয়ে যেতে বলেছে।'

'আজ না, ভাই, আরেকদিন। আমি চলি,' আর দাঁড়াল না মিরো। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ইয়ার্ড থেকে।

কিশোরের দিকে চেয়ে হাসল রবিন। 'গোল্ডেন বেল্ট রহস্য ভেদ হয়ে গেল। আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দিল তো, এখন লজ্জা পাবেন মিস্টার

মুচামারু।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'আরও একটা ব্যাপার হতে পারে,' আপনমনেই বলল সে। 'কিন্তু...নাহ্, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। বেল্টটা বের করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তারমানে ভেতরেই আছে এখনও। তাহলে ছবির পেছনে ছাড়া লুকিয়ে রাখার আর জায়গা কোথায়?'

'আছে, ছবির পেছনেই,' বলল রবিন।

'কাল সকালেই জানা যাবে,' নিশ্চিত হতে পারছে না যেন কিশোর। 'এখন চল, খেয়ে নিই। তুমি খেয়ে বাড়ি চলে যাও, আমাকে কিছু জিনিসপত্র গোছাতে হবে। রত্নদানো ধরতে দরকার হবে। মুসা এলে তাকে নিয়ে মিস ভারনিয়ার বাড়িতে চলে যাব। কি হল না হল সকালে ফোনে জানাব তোমাকে। ফোনের কাছাকাছি থেক। আমি ফোন করলে পরে বোরিসকে নিয়ে আমাদের আনতে যেয়ো।'

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করল রবিন। 'আচ্ছা, সত্যিই কি রত্নদানো আছে? নাকি ওসব মহিলার অতিকল্পনা? হয়ত ববের কথাই ঠিক, নিশিডাকে পায় তাঁকে।'

অসম্ভব নয়। ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত সব কাণ্ড করে বসে মানুষ। এক ভদ্রলোকের কথা জানি, কয়েকটা মুক্তো নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকত। খালি ভাবত, গেল বুঝি চুরি হয়ে। শেষে, এক রাতে উঠে সেফ থেকে মুক্তোগুলো বের করে লুকিয়ে রাখল আরেক জায়গায়, ঘুমের ঘোরে। সকালে উঠে সেফে ওগুলো না দেখে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। রাতে নিজেই যে সরিয়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারল না। আরেক রাতে ঘুমের ঘোরেই মুক্তোগুলো বের করে এনে সেফে আগের জায়গায় রেখে দিল আবার।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'মিস ভারনিয়াও তেমন কিছু করে থাকতে পারেন। আজ রাতেই সেটা বুঝব। যদি সত্যিই,' রবিনের দিকে চেয়ে হাসল গোয়েন্দাপ্রধান, 'রত্নদানো আসে, তিন গোয়েন্দার ফাঁদে ধরা পড়তেই হবে তাকে।'

নয়

খুব ব্যস্ত রত্নদানোরা, গাঁইতি দিয়ে সমানে মাটি কুপিয়ে চলেছে, সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় রয়েছে খুদে মানুষগুলো, আবছা দেখতে পাচ্ছে রবিন। দ্রুত মনস্থির করে নিয়ে পা টিপে টিপে ওদের দিকে এগোল সে। কেবলই মনে হচ্ছে, ইস্, মুসা আর কিশোর যদি থাকত সঙ্গে! সুড়ঙ্গের বেশি গভীরে যেতে সাহস হচ্ছে না তার, কিন্তু এতখানি এসে ফিরেও যেতে চাইছে না।

বুকের ভেতরে জোরে জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, রবিনের ভয় হচ্ছে,

রক্তদানোদের কানে চলে যাবে ধুকপুক শব্দ। কিন্তু থামল না সে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। রক্তদানোরা তার দিকে পেছন করে মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত।

শুকনো সুড়ঙ্গ, গাঁইতির ঘায়ে ধুলো উড়ছে, নাকে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। হাঁচি পেল রবিনের। চেপেচুপে রাখার চেষ্টা করল, পারল না, 'হ্যাঁচচো' করে উঠল।

ধীরগতি ছায়াছবির মত যেন ধীরে ধীরে ঘুরল সবকটা রক্তদানো, কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে গাঁইতি।

ছোটার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু আঠা দিয়ে তার হাত-পা মাটিতে সেঁটে দেয়া হয়েছে যেন, এক চুল নড়াতে পারল না। চেঁচানর চেষ্টা করল, কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে।

লাল টকটকে চোখ মেলে নীরবে চেয়ে আছে রক্তদানোরা। এই সময়ে রবিনের কানে এল একটা শব্দ। গায়ে মোলায়েম স্পর্শ। আবার ছুটে পালানর চেষ্টা করল সে, এবারেও ব্যর্থ হল।

কাঁধ চেপে ধরল শক্ত আঙুল, জোরে ঝাঁকুনি দিল। ডাক শোনা গেল, 'রবিন! এই রবিন! এমন করছিস কেন?'

ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল রক্তদানোরা। মিলিয়ে গেল সুড়ঙ্গ। নড়েচড়ে উঠল রবিন, চেঁচাল, 'ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!'

'এই রবিন, ওঠ, চোখ মেল!'

আস্তে করে চোখ মেলল রবিন। পাশে দাঁড়িয়ে তার মা।

'দুঃস্বপ্ন দেখছিলি?' মা বললেন। 'ঘুমের মধ্যে এমন সব শব্দ করছিলি, যেন গলা টিপে ধরেছে কেউ। ওঠ, বারান্দায় খানিক হেঁটে আয়।'

'হ্যাঁ, মা, একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। জাগিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। মা, কিশোর ফোন করেছিল?'

'কিশোর? এত রাতে ও ফোন করতে যাবে কেন? যা, বারান্দা থেকে হেঁটে এসে শুয়ে পড়। রাতদুপুর এখন।'

'হাঁটতে হবে না।'

'তাহলে আবার তো দুঃস্বপ্ন দেখবি।'

'দেখব না,' পাশ ফিরে কোলবালিশটা টেনে নিল রবিন।

মুসা আর কিশোরের কথা ভাবল, ওরা এখন কি করছে?

*

লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীর দিকে ছুটে চলেছে ট্রাক। বোরিস চালাচ্ছে। পাশে বসেছে কিশোর আর মুসা।

রক্তদানো ধরার জন্যে কি কি যন্ত্রপাতি এনেছে, মুসাকে এক এক করে দেখাচ্ছে কিশোর। 'এই যে ক্যামেরা, স্পেশাল ক্যামেরা, দশ সেকেণ্ডেই ছবি তৈরি হয়ে যায়। ভাঙা অবস্থায় কিনেছিলাম একটা ছেলের কাছ থেকে, টুকটাক যন্ত্র

লাগিয়ে সারিয়ে নিয়েছি। চমৎকার কাজ দেয় এখন। এই যে, ফ্ল্যাশগানও রয়েছে। রক্তদানো এলেই টুক করে ছবি তুলে নেব আগে।' ক্যামেরাটা রেখে ব্যাগ থেকে দু'জোড়া দস্তানা বের করল। ওগুলোর তালুর কাছে চামড়া লাগানো। 'দানো ব্যাটাদের আঁকড়ে ধরার জন্যে, পিছলে ছুটে যেতে পারবে না। ব্যাটাদের হাতে লম্বা চোখা নখ থাকার কথা, খামছি দিলেও এই দস্তানার জন্যে লাগাতে পারবে না।'

'সেরেছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'রক্তদানো আসবে, ধরেই নিয়েছে মনে হচ্ছে?'

'আগে থেকেই তৈরি থাকা ভাল। টর্চ এনেছি, আর এই যে দড়ি, নাইলনের, ভীষণ শক্ত। দানো ব্যাটাদের ধরে বাঁধলে ছিঁড়তে পারবে না।'

দড়ি আর দস্তানা রেখে একটা ওয়াকি-টকি বের করল কিশোর। রেঞ্জ কম যন্ত্রটার, কিন্তু দরকারের সময় খুব কাজে লাগে। যোগাযোগ রাখায় খুব সুবিধে। ওটা রেখে টেপরেকর্ডার বের করে দেখাল মুসাকে। রক্তদানোরা কোন রকম শব্দ করলে, সেটা রেকর্ড করবে।

যন্ত্রপাতির ব্যাগটার দিকে চেয়ে আপনমনেই মাথা নাড়ল কিশোর। 'সবই এনেছি। আর কিছু বাকি নেই। ও হ্যাঁ, মুসা, চক এনেছ?'

পকেট থেকে নীল চক বের করে দেখাল মুসা। কিশোর এনেছে সাদা চক।

'না, আর কিছু বাকি নেই,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'টুথব্রাশ এনেছ?'

পাশে রাখা ছোট হ্যাণ্ডব্যাগটা দেখাল মুসা। 'পাজামাও এনেছি। রাতে থাকব, ওসব তো দরকার।'

'পাজামা লাগবে না। রাতে তো আর ঘুমাচ্ছি না। কাপড়চোপড় সব পরে বসে থাকব, রক্তদানো এলেই যেন ছুটে গিয়ে খপ করে ধরতে পারি।'

আর চুপ থাকতে পারল না বোরিস। 'দানো ধরার জন্যে তৈরিই হয়ে এসেছে একেবারে! সাবধান, খুব খারাপ জীব ওরা। বিকেলে রোভারের সঙ্গেও আলাপ করেছি, ও আমার সঙ্গে একমত। রক্তদানোরা খারাপ, বিশেষ করে ব্ল্যাক ফরেস্টের গুলোতে একেকটা সাক্ষাৎ ইবলিস। ওদের চোখের দিকে সরাসরি তাকিও না, পাথর হয়ে যাবে!'

এতই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল বোরিস, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা। রক্তদানো বাস্তবে নেই, এতক্ষণ যে ধারণাটা ছিল, সেটা বদলে গেল মুহূর্তে। বোরিস বলছে, রক্তদানো আছে, রোভারও বিশ্বাস করে, মিস ভারনিয়া নাকি দেখেছেন, এমনকি রবিনও দেখেছে। এতগুলো লোক...

কিশোরের কথায় মুসার ভাবনায় ছেদ পড়ল। 'কিন্তু বোরিস, মিস ভারনিয়াকে সাহায্য করব কথা দিয়ে ফেলেছি আমরা। এখনও জানি না, সত্যি রক্তদানোরাই বিরক্ত করছে তাঁকে, নাকি অন্য কিছু। তাছাড়া, কি ধরনের রহস্য নিয়ে কাজ

করতে পছন্দ করে তিন গোয়েন্দা…'

'যে কোন ধরনের উদ্ভট রহস্য…' বলতে বলতে থেমে গেল মুসা। এই রক্তদানোর ব্যাপারটা উদ্ভটের চেয়েও উদ্ভট হয়ে যাচ্ছে না তো?

দশ

মিস ভারনিয়ার আঙিনা অন্ধকার। নির্জন ব্যাংক আর পোড়ো থিয়েটার বাড়িটাকে যেন গিলে ফেলেছে গাঢ় অন্ধকার। সরু বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলছে, তার মানে অপেক্ষা করছেন লেখিকা, জেগে আছেন গোয়েন্দাদের অপেক্ষায়।

ট্রাক থেকে নেমে এল কিশোর আর মুসা।

জানালার বাইরে মুখ বের করল উদ্বিগ্ন বোরিস। 'কিশোর, আবার বলছি, রক্তদানো ধরার চেষ্টা কোরো না। ব্ল্যাক ফরেস্টে অনেক পুরানো গুঁড়ি আর পাথর দেখেছি, এক সময় ওরা জ্যান্ত মানুষ ছিল। রক্তদানোরা ওদের ওই অবস্থা করেছে। খবরদার, ওদের চোখে চোখে চেও না কিছুতেই!'

গাঢ় বিশ্বাস বোরিসের। মুসার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। অস্বস্তি বোধ বাড়ছে। অবচেতন মন হুঁশিয়ার করে দিল, সামনে রাতটা ভাল যাবে না।

বোরিসকে বিদায় জানাল কিশোর। কথা দিল, হুঁশিয়ার থাকবে, যাতে তাকে পাথর না বানাতে পারে রক্তদানোরা। বলল, সকালে রবিনের কাছে ফোন করবে, তখন যেন তাকে সহ ট্রাক নিয়ে চলে আসে।

বেড়ার ধার ঘেঁষে গেটের দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। আড়াল থেকে কেউ তাদের ওপর চোখ রাখছে না তো? কি জানি! এত অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

হাতড়ে হাতড়ে গেটের পাশে লাগানো বেলপুশটা বের করে একবার টিপল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জন উঠল গেটের মেকানিজমে। খুলে গেল পাল্লা, দুই গোয়েন্দা আঙিনায় ঢুকে পড়তেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল কিশোর। অবাক লাগছে মুসার, এত সাবধানতা কেন? বিপদ সত্যি আশা করছে গোয়েন্দাপ্রধান? নাকি অযথাই অতিরিক্ত নাটকীয় করে তুলছে পরিস্থিতিকে। কিন্তু তেমন স্বভাব তো নয় কিশোরের? ভয় পেল মুসা।

অন্ধকার আঙিনা। নিঃশব্দে কিশোরের পেছনে এগোল মুসা। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল। দরজার পাল্লা ভেজানো, ঠেলা দিতেই খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জন।

শুকনো, ফ্যাকাসে মুখে দুই গোয়েন্দাকে স্বাগত জানালেন মিস ভারনিয়া। হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'তোমরা এসে পড়েছ, ভাল হয়েছে। জীবনে এই পথম এত

নার্ভাস ফীল করছি। যা ঘটেছে, এর চেয়ে বেশি কিছু ঘটলে আর থাকব না এ-বাড়িতে এবার ঠিক পালাব। রবার্টের কাছে বাড়ি বেচে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যাব।'

'এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই, মিস ভারনিয়া,' কোমল গলায় বলল কিশোর। 'আমরা তো আছি।'

কেমন এক ধরনের কাঁপা হাসি ফুটল লেখিকার ঠোঁটে। 'রাত বেশি হয়নি। মাঝরাতের আগে ওরা আসে না। এতক্ষণ কি করবে? বসে বসে টেলিভিশন দেখ।'

'বরং একটু ঘুমিয়ে নিই,' বলল কিশোর। 'এই সাড়ে এগারোটা নাগাদ উঠে পড়ব। তাজা শরীর নিয়ে খুব আরামে পাহারা দিতে পারব বাকি রাতটা।'

'আরাম! আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল মুসা।

সহকারীর কথায় কান না দিয়ে বলল কিশোর, 'টেবিল ঘড়ি আছে আপনার? অ্যালার্ম ক্লক?'

'আছে।'

সিঁড়ির মাথার ছোট ঘরটা দুই গোয়েন্দাকে দেখিয়ে দিলেন মিস ভারনিয়া। দুটো বিছানা করে রেখেছেন। টেবিলে ব্যাগ রেখে শুধু জুতো খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল কিশোর।

মুসাও শু'লো। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে এক সময় সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল। তার মনে হল, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠেছে হতচ্ছাড়া ঘড়ির বেল।

'ক'টা বাজল?' চোখ না খুলেই বিড়বিড় করল মুসা।

'সাড়ে এগারো,' চাপা গলায় বলল কিশোর। 'মিস ভারনিয়া শুয়ে পড়েছেন বোধহয়। তুমি আরও খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পার। আমি পাহারায় থাকছি।'

'পাহারা!' বিড়বিড় করল আবার মুসা, কয়েক সেকেণ্ডেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রবিনের মতই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল মুসা। স্বপ্নের মাঝেই কানে এল জানালায় টোকার শব্দ।

ঘুম ভেঙে গেল মুসার, পলকে পুরো সজাগ। টোকার শব্দ হচ্ছে এখনও। তালে তালে একটা বিশেষ ছন্দেঃ এক···তিন···দুই···তিন···এক। কোন রকম সঙ্কেত? নাকি জাদু করছে রক্তদানোরা···

বিছানায় সোজা হয়ে বসল মুসা। চোখ জানালার দিকে। গতি বেড়ে গেছে হৃদযন্ত্রের, গলার কাছে ঠেলে উঠতে চাইছে কি যেন।

জানালায় উঁকি দিল একটা মুখ!

খুদে একটা মুখ, লাল চোখ, রোমশ কান, সারকাসের ক্লাউনের মত চোখা লম্বা নাক। ছোট ছোট ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চোখা শ্বদন্ত, ভেঙচি কাটছে যেন।

হঠাৎ ঘরে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল, লাফিয়ে খাট থেকে নামল মুসা। চোখের পলকে নেই হয়ে গেল মুখটা।

'তুলেছি!' অন্ধকার কোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'মুসা, তুলে ফেলেছি!'

'ওই ব্যাটা রক্তদানো, কোন সন্দেহ নেই!' মুসাও চেঁচিয়ে বলল।

'ছবি তুলে ফেলেছি। এখন ধরতে হবে ব্যাটাকে!'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। চোখ মিটমিট করে তাকাল নিচে আঙিনার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদের ঘোলাটে আলোয় দেখা গেল, চারটে খুদে মূর্তি পাগলের মত নাচানাচি করছে। নাচছে কুদছে, এ-ওর ঘাড়ে পড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে, যেন সারকাসের কয়েকটা ক্লাউন।

ফ্ল্যাশগানের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে আবার আবছা অন্ধকার সয়ে এল দুই গোয়েন্দার চোখে। মূর্তিগুলোকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। দানোদের মুখের সাদা রঙও দেখতে পাচ্ছে। পরনে চামড়ার পোশাক, পায়ে চোখা জুতো।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আঙিনায় খেলা জুড়েছে কেন ব্যাটারা?'

'খুব সহজ কারণ,' জুতোর ফিতে বাঁধছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়।'

'ভয়? তা দেখাতে পেরেছে, অন্তত আমাকে তো বটেই। কিন্তু কেন? সুড়ঙ্গ খোঁড়া বাদ দিয়ে মানুষের পেছনে লেগেছে কেন?'

'ওদের ভাড়া করে আনা হয়েছে। কাজটা বোধহয় মিস ভারনিয়ার ভাইপোর।'

'বব!' জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে হাত থেমে গেল মুসার। 'কেন?'

'ভয় পেয়ে যাতে বাড়িটা বিক্রি করে দেন মিস ভারনিয়া। পটিয়েপাটিয়ে ফুফুর কাছ থেকে তখন প্রচুর নগদ টাকা আদায় করে নিতে পারবে বব।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ কিশোর। এখন বুঝতে পারছি সব ববের শয়তানি!'

'এবং সেটা প্রমাণ করা দরকার। অন্তত একটা দানোকে ধরতেই হবে।'

ব্যাগ থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করে কোমরে ঝোলাল কিশোর। একজোড়া দস্তানা মুসাকে দিয়ে আরেক জোড়া নিজে পরল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। যার যার কোমরের বেল্টে ঝুলিয়ে টর্চ নিল দুটো, হাত মুক্ত রাখল।

'কিন্তু জানালায় উঁকি দিল কি করে রক্তদানো?' প্রশ্ন করল মুসা। 'দোতলার জানালা...'

'ভালমত ভাব, বুঝে যাবে। এখন চল যাই। মিস ভারনিয়া হয়ত ঘুমিয়ে

আছেন, তাঁকে ডাকার দরকার নেই। চেঁচামেচি শুরু করলে দানোরা পালাবে।'

নিচতলার বারান্দায় বেরিয়ে এল দু'জনে। ছায়ার মত নিঃশব্দে চলে এল বাড়ির এক কোণে। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লেপটে থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

উঠনে এখনও লাফালাফি করছে চার দানো।

'ধর,' মুসার হাতে দড়ির এক প্রান্ত গুঁজে দিল কিশোর। আরেক মাথা নিজের কব্জিতে পেঁচিয়ে বাঁধল। 'দড়ি টান টান করে ধরে দৌড় দেবে, যার গায়েই দড়ি বাঁধুক পেঁচিয়ে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। দাও দৌড়!'

এক সঙ্গে দৌড় দিল দু'জনে। একটা ঝোপের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় ডালে আটকে গেল হঠাৎ কিশোরের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার বেল্ট, খাপসহ ছিঁড়ে পড়ে গেল ক্যামেরা, কিন্তু থামল না সে।

ছেলেদেরকে আসতে দেখল রক্তদানোরা। তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৌড় দিল দেয়ালের ছায়ার দিকে।

'থেম না, মুসা!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'একটাকে অন্তত ধরা চাই!'

একটা খুদে মূর্তির কাঁধ খামচে ধরল মুসা, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, ঝট করে বসে পড়েছে দানোটা। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কিশোরও ছুটে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ল মুসার গায়ের ওপর। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াল আবার দু'জনেই। চকিতের জন্যে দেখল, থিয়েটার বাড়ির দিকে ছুটে পালাচ্ছে দানোগুলো।

'গেট!' হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'খোলা!'

'বাড়িতে ঢুকে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, জলদি এস!'

'মুসা, দাঁড়াও!' ডাকল কিশোর। 'একটা ব্যাপার...' আর কিছু বলার আগেই হাতের দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ল, বাধ্য হয়েই তাকেও মুসার পিছু নিতে হল।

থিয়েটারে আগুন লাগলে কিংবা অন্য কোনরকম জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলে, বেরোনর জন্যে একটা ইমার্জেন্সী ডোর রাখা হয়েছিল, সেটা এখন খোলা। সেদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে দানোরা। মুসাও ঢুকে পড়ল সেই দরজা দিয়ে।

মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। গতি কমাতেও পারছে না, তাহলে টানের চোটে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পরতে হবে। মুসার পেছনে বাড়ির ভেতরের গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে-ও। পেছনে দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আটকা পড়ল দুই গোয়েন্দা।

মুহূর্ত পরেই চারপাশ থেকে আক্রান্ত হল ওরা। চোখা তীক্ষ্ণ অনেকগুলো নখ খামচে ধরল ওদেরকে।

এগারো

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচাতে লাগল মুসা। 'দানোরা মেরে ফেলল আমাকে!'

'আমাকেও ধরেছে!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। দু'হাতে মেরে গায়ের ওপর থেকে সরানর চেষ্টা করল খুদে মানুষগুলোকে। 'আমাকে আটকে ফেলেছে!'

এখনও দড়ি ধরে রেখেছে মুসা, কি ভেবে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল এক দানো, দড়িটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মেরেছে তার গলায়।

চমকে গেল দানোরা।

ক্ষণিকের জন্যে গায়ে চাপ কমে গেল, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল কিশোর। ঝাড়া মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে এল মুসার কাছাকাছি। হাতে একটা চামড়ার জ্যাকেট ঠেকতেই খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল, একটানে দানোটাকে সরিয়ে আনল মুসার গায়ের ওপর থেকে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। মেঝেতে পড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল দানোটা।

আরেকটা দানোকে ধরে মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলল মুসা।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা, দু'জনেই মুক্ত এখন। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কব্জি থেকে দড়ি খুলে নিয়ে গুটিয়ে আবার কোমরে ঝোলাল কিশোর।

'এখন কি করা, কিশোর?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

'দরজা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের পেছনেই বোধহয় ওটা, এই যে এদিকে,' মুসার হাত ধরে টানল কিশোর।

কয়েক পা এগোতেই দেয়াল ঠেকল হাতে। হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। দরজার হাতলে আঙুল ঠেকতেই চেপে ধরে টান দিল। খুলল না দরজা, তালা আটকানো।

'আটকা-ই পড়লাম,' বিষণ্ন শোনাল কিশোরের গলা। 'ওভাবে এসে ঢুকে পড়াটা উচিত হয়নি মুসা। উল্টে আমরাই ওদের ফাঁদে ধরা পড়লাম।'

'হ্যাঁ, কাজটা ঠিক হয়নি! তোমাকেও টেনে আনলাম এর মাঝে!'

'এটাই চাইছিল ওরা। যা হওয়ার হয়ে গেছে···ওই যে, শুনতে পাচ্ছ?'

না শোনার কোন কারণ নেই, তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে দানোরা। ডানেবাঁয়ে দু'দিকে।

'আবার আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে!' চাপা গলায় বলল মুসা।

'জলদি বেরোতে হবে এখান থেকে! আরও পথ থাকতে পারে।'

'থাকলেও অন্ধকারে খুঁজে বের করব কিভাবে?'

'আরে তাই তো, টর্চ! ভুলেই গিয়েছিলাম! ভয় এভাবেই আচ্ছন্ন করে মনকে···আছে, কোমরেই আছে।'

মুসার টর্চও ঝোলানো আছে কোমরের বেল্টে। খুলে নিয়ে সুইচ টিপতেই অন্ধকার চিরে দিল তীব্র আলোকরশ্মি। আধ সেকেণ্ড পর কিশোরের টর্চও জ্বলে উঠল।

গায়ে আলো পড়তেই ছুটোছুটি করে লুকিয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল খুদে মানুষগুলো। অদ্ভুত ভাষায় চিঁচিঁ করে কি সব বলছে। অনেক বেশি সতর্ক এখন রক্তদানোরা। বুঝে গেছে, সহজে ছেলেদুটোকে কাবু করা যাবে না।

থিয়েটার মঞ্চের পেছনে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। আয়তাকার কাঠের ফ্রেমে আটকানো ক্যানভাসের বড় বড় অসংখ্য 'ফ্ল্যাট' একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। নানারকম ছবি, সিনসিনারি আঁকা ওসব ফ্ল্যাটে। নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্যপট পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার হত ওগুলো। মই আর অন্যান্য কাজের জিনিস এখন পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে, পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অনেক বছর ধরে।

বাতাসে ডানা ঝাপটানর শব্দ, মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে গেল একটা বাদুড়।

'বাদুড়! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'বাদুড়ে কামড়ায় না। চেঁচিও না অযথা। ওই যে, দেখ, দানোরা আসছে!' চ্যালাকাঠকে লাঠির মত বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে খুদে মানুষেরা, সেদিকে দেখাল কিশোর। 'এখন যাই কোথায়?'

'এদিকে! ছোট!' বলেই দুই সারি ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে ছুটল মুসা।

কিশোরও ছুটল মুসার পেছনে। হঠাৎ থেমে মইটাকে এক টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার ছুটল। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক দানো, বোধহয় গায়ের ওপর মই পড়েছে, কিংবা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ওটা। সেসব দেখার সময় নেই এখন দুই গোয়েন্দার, ছুটছে প্রাণপণে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। 'সামনেও আছে দুটো। দু'দিক থেকে আক্রমণের তালে আছে!'

দ্রুত এপাশ-ওপাশ দেখে নিল কিশোর। সারি দিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ফ্ল্যাট। আঙুল তুলে দেখাল সে, 'ওগুলোর ভেতর দিয়ে যাব!'

জোরে লাথি মারল কিশোর। ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল পুরানো ক্যানভাস। মুসাকে নিয়ে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

একের পর এক দৃশ্যপট ছিঁড়ে আরও ভেতরে ঢুকে চলল দুই গোয়েন্দা। পেছনে দুলছে ছেঁড়া ক্যানভাস। ওপাশে রয়েছে রক্তদানোরা, ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না এখন, তবে চেঁচামেচি কানে আসছে।

কাঠের তৈরি বিশাল মঞ্চের কাছে চলে এল দু'জনে। লাফিয়ে উঠে পড়ল

তাতে। সামনে আলো ফেলল। পুরানো, ধুলোমাখা নোংরা সিটের সমুদ্র চোখে পড়ল। ওগুলোর পেছনে নিশ্চয় দরজা রয়েছে। থাকলেও খোলা না বন্ধ কে জানে!

পেছনে হালকা পায়ের শব্দ ছুটে আসছে। ঘুরে আলো ফেলল মুসা। পৌঁছে গেছে দানোরা।

'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'দুই সারির মাঝখানের পথ ধরে ঢুকে পড়ব!'

মঞ্চের এক পাশের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হলের মেঝেতে নেমে পড়ল ওরা। ঠিক এই সময় জ্বলে উঠল হলের আলো, মেইন সুইচ অন করে দিয়েছে কেউ।

পেছনে তাকাল একবার কিশোর। হাতে চ্যালাকাঠ নিয়ে ছুটে আসছে দুটো খুদে মানুষ। ঝাড়বাতির রঙিন আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে দানোদুটোকে।

ছুটতে ছুটতে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ ছাত থেকে ঝুলন্ত একটা দড়ি ধরে ফেলল এক দানো। জোরে এক দোল দিল দড়াবাজিকরের মত, চোখের পলকে উড়ে এসে পড়ল কিশোরের ঘাড়ে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কিশোর, হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ। খোঁজার সময় নেই, গায়ে চেপে বসেছে দানো, ওটাকে ছাড়াতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

টর্চটা একটা সিটের ওপর রেখে এগিয়ে এল মুসা। দানোর কোমড় আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল কিশোরের ওপর থেকে, গুঁজে দিল দুটো সিটের মাঝখানের ফাঁকে। অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে থেকে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল দানো, সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে লাগল।

সঙ্গীকে সাহায্য করতে ছুটে এল দ্বিতীয় দানোটা। এই সুযোগে ছুটে গিয়ে একটা পথে ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। ছুটল লবির দিকে।

বাইরে বেরোনর দরজার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জনে, ধাক্কা দিল। কিন্তু এক চুল নড়ল না বিশাল ভারি দরজা।

'বাইরে থেকে তক্তা লাগিয়ে পেরেক মেরে রেখেছে!' দমে গেল মুসা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। 'জানালা খুঁজে বের করতে হবে। কিশোর, এস।'

টর্চ হাতে এক পাশের করিডর ধরে ছুটল মুসা। এক সারি সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই পা রাখল সিঁড়িতে।

একেকবারে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে লাগল দু'জনে। ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পুরানো ধাঁচের সিঁড়ি, শেষ নেই যেন এর। কয়টা মোড় ঘুরল ওরা, বলতে পারবে না।

সিঁড়ি শেষ হল। ব্যালকনিতে উঠে এল ওরা। জিরিয়ে নেয়ার জন্যে থামল। একধারে ঘোরানো রেলিঙ, রঙিন মখমলে ঢাকা। টর্চ নিভিয়ে সেদিকে এগোল মুসা।

রেলিঙের ওপর দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল দুই গোয়েন্দা। অনেক নিচে হলের মেঝেতে চারটে খুদে মূর্তি এক জায়গায় জড়ো হয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

এক সময় আরেকটা মূর্তি এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বলিষ্ঠ দেহী স্বাভাবিক একজন মানুষ।

'বার্ট!' আঁতকে উঠল মুসা, চাপা কণ্ঠস্বর। 'দানোদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বার্ট!'

'তাইতো দেখছি!' ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। 'মস্ত একটা ভুল করেছি আমি, মুসা।...ওই যে, শোন।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, চামচিকের দল!' নিচে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে বার্ট। 'খোঁজ, খোঁজ! বিচ্ছুদুটোকে ধরতেই হবে! সব দরজা আটকানো, পালাতে পারবে না ওরা।'

ছড়িয়ে পড়ল চারটে খুদে মানুষ।

'আমরা কোথায়, বুঝতে পারছে না ব্যাটারা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের এখন। মিস ভারনিয়া জেগে উঠলেই আমাদের খোঁজ পড়বে...'

'ইয়াল্লা! ভুলেই গিয়েছিলাম! তাই তো, আমাদের না দেখলে পুলিশকে খবর পাঠাবেন তিনি! এ-বাড়িতে নিশ্চয় খুঁজবে পুলিশ,' আশায় দুলে উঠল মুসার বুক।

'ঝোপের ধারে আমার ক্যামেরাটা খুঁজে পাবে পুলিশ,' কিশোর বলল। 'ফিল্ম বের করে দেখলেই বুঝে যাবে, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়।'

'চল, কোথাও লুকিয়ে পড়ি,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল মুসা। 'শুনতে পাচ্ছ না, সিঁড়িতে শব্দ?'

বারো

পরিচিত একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল মিস ভারনিয়ার। গাঁইতি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কেউ! চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। হ্যাঁ, সেই শব্দ! তাঁর ঘরের ভিতের নিচে যেন মাটি কাটছে রত্নদানোরা!

ছেলেরা কি শুনতে পাচ্ছে? ওরা থাকায় ভালই হয়েছে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। কিন্তু কোনরকম সাড়াশব্দ নেই কেন ওদের? এখনও ঘুমিয়ে আছে।

'কিশোর! মুসা!' গলা চড়িয়ে ডাকলেন লেখিকা।

সাড়া এল না। উঠে গিয়ে ডেকে ওদের জাগাতে হবে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্লিপার গলালেন। একটা আলোয়ান গায়ে চড়িয়ে বেরোলেন ঘর থেকে। ছেলেদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

'কিশোর! মুসা!' আবার ডাকলেন মিস ভারনিয়া।

কোন সাড়া নেই। অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন তিনি। বিছানার দিকে চোখ পড়তেই দম আটকে গেল যেন। শূন্য বিছানা!

দুরুদুরু করতে লাগল বুকের ভেতর, সারা ঘরে চোখ বোলালেন মিস ভারনিয়া। চেয়ারের হেলানে রাখা আছে মুসার পায়জামা, ভাঁজও খোলা হয়নি। টেবিলে পড়ে আছে ছেলেদের ব্যাগ, অথচ ওরা নেই। এর মানে? পালায়নি তো! নিশ্চয় মাটি কাটার শব্দ শুনেছে, দানোদের দেখেছে, ব্যস ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে মুসা আর কিশোর।

'ঈশ্বর!' আপনমনেই বিড়বিড় করলেন লেখিকা, 'এখন আমি কি করি!'

আর থাকা যায় না এ-বাড়িতে, ভাবলেন মিস ভারনিয়া। মুসা আর কিশোরের মত ছেলেও যখন ভয় পেয়ে পালিয়েছে, তিনি আর থাকেন কোন ভরসায়? নাহ্, আর থাকবেন না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন লেখিকা।

আপাতত ববের ওখানে গিয়েই উঠবেন, ভেবে, তাকে টেলিফোন করার জন্যে নিচে নামলেন মিস ভারনিয়া। হাত কাঁপছে, ডায়াল করতে পারছেন না ঠিকমত। সঠিক নাম্বার পাওয়ার জন্যে তিনবার চেষ্টা করতে হল তাঁকে। অবশেষে রিসিভারে ভেসে এল ববের ঘুমজড়িত কণ্ঠ।

'বব!' ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন মিস ভারনিয়া। 'রক্তদানো! আবার এসেছে! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি মাটি কোপানর শব্দ! বব, আর এক মুহূর্তও এখানে না! তোমার ওখানে চলে আসছি এখুনি। কাল···হ্যাঁ, কালই বাড়ি বিক্রি করে দেব।'

'বাড়ি বিক্রির কথা পরে হবে ফুফু,' ঘুমের লেশমাত্র নেই আর ববের কণ্ঠে। 'জলদি তৈরি হয়ে নাও। আমি আসছি, এই বড় জোর দশ মিনিট।'

'পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে আমার,' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিস ভারনিয়া।

ববের গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করার পর শান্ত হলেন মিস ভারনিয়া। নেতিয়ে পড়লেন গাড়ির সিটে।

মুসা আর কিশোরের অস্বস্তি বাড়ছে। থিয়েটারের ওপরতলায় এখন রয়েছে ওরা। লুকানর জায়গা খুঁজে পায়নি। নিতান্ত দরকার না পড়লে টর্চ জ্বালছে না। বাতাসে যেন জমাট বেঁধে আছে পুরানো ভ্যাপসা গন্ধ। দানোরা আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কোনরকম সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

সরু করিডর ধরে একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে টর্চ জ্বালল মুসা।

ঘরের ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় দুটো মেশিন বসানো রয়েছে। প্রাচীন আমলের সিনেমা-প্রোজেক্টর, ধুলো-ময়লায় একাকার, মরচে পড়ে বাতিল লোহায় পরিণত হতে চলেছে।

'বাবি, সিনেমাও দেখানো হত নাকি! এহ্, যা মেশিন!' মুখ বাঁকাল মুসা, 'মিউজিয়মে রাখার উপযুক্ত!' কিশোরের দিকে ফিরল। 'এ-ঘরেই লুকিয়ে থাকা

যাক।'

'বড় বেশি খোলামেলা! কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে! বিপদে পড়ব শেষে।'

'পড়ব মানে কি? পড়েই তো আছি। বরং বল, বিপদ আরও বাড়বে।'

'চল, অন্য জায়গা খুঁজি। এখানে লুকানো যাবে না।'

প্রোজেকশন রুমের পাশে একটা হলে এসে ঢুকল ওরা। ঘরের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছোট একটা প্ল্যাটফরমে, ওটাতে উঠে এল দু'জনে। সামনে একটা দরজার গায়ে লেখাঃ

'মিনারেট'

প্রবেশ নিষেধ

'মিনারেট! কোনরকম দানব-টানব?' মুসা অবাক।

'তুমি বোধহয় মাইনোটারের কথা ভাবছ? গ্রীক মিথোলোজির ষাঁড়মাথা দানব,' কিশোর বলল। 'এটা মাইনোটার নয়, মিনারেট, টাওয়ারের ওপরের খোলা জায়গা। চল, ওখানেই উঠে পড়ি। একটা বুদ্ধি এসেছে,' দরজায় ঠেলা দিল কিশোর।

লোহার পাল্লা, মরচে পড়ে শক্ত হয়ে আটকে আছে। দু'জনে মিলে জোরে ধাক্কা দিতেই শব্দ করে খুলে গেল। খুব সরু একটা লোহার মই উঠে গেছে দরজার ওপাশ থেকে। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

মিনিটখানেক পরে টাওয়ারের চারকোণা একটা খোলা জায়গায় এসে উঠল ওরা। অনেক নিচে রাস্তা, নির্জন, শুধু পথের ধারের লাইটপোস্টগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

'মিনারেটে তো উঠলাম,' বলল মুসা, 'এবার? এখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আরও ভালমত আটকা পড়লাম।'

'আটকা আর পড়লাম কোথায়?' পথের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'নিচেই রাস্তা, ওখানে কোনমতে নেমে যেতে পারলেই হল। মাত্র পঁচাত্তর ফুট।'

'মাত্র পঁচাত্তর ফুট! লাফিয়ে নামব নাকি?'

'কেন, সঙ্গে দড়ি আছে না?' দড়ির বাণ্ডিল খুলে নিল কিশোর। 'পাকিয়ে মোটা করে নিয়েছিলাম। পাক খুললেই অনেক লম্বা হয়ে যাবে। হলেও তোমার ডবল ওজন সইতে পারবে।'

'আমার? আমার কেন? তোমার নয় কেন?'

'কারণ, তোমার মত ভাল অ্যাথলেট নই আমি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি চেষ্টা করলে বড়জোর পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারি, এর বেশি কিছু করতে পারব না, কিন্তু তুমি নিরাপদে নেমে যেতে পারবে। ওই যে, অনেক শিক বেরিয়ে আছে। ওগুলোর কোনটায় দড়ি বেঁধে দিচ্ছি, নেমে গিয়ে পুলিশ ডেকে

নিয়ে এস। মিস ভারনিয়ার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না।'

দ্রুত দড়ির পাক খুলে ফেলল কিশোর।

টেনেটুনে দড়িটা দেখল মুসা। 'বেশি সরু, পিচ্ছিল। ধরে রাখাই মুশকিল হবে। হাতে কেটে বসে যাবে।'

'যাবে না। দস্তানার তালুতে চামড়া রয়েছে, সহজে কাটবে না। হাতের কব্জিতে এক পাক দিয়ে ঝুলে পড়বে দড়ি ধরে, তারপর আস্তে আস্তে ছাড়লেই সরসর করে নেমে যেতে পারবে।'

হাতে দড়ি পেঁচিয়ে টেনেটুনে দেখল মুসা। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, পারব মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথার জবাব দেবে?'

'কি?' শিকে দড়ি বাঁধছে কিশোর।

'রক্তদানো আমরা সত্যি দেখলাম তাহলে?'

'খুদে মানুষ দেখলাম,' মুখ তুলল কিশোর। 'আমি একটা আস্ত গাধা! আমার ধারণা ছিল, মিস ভারনিয়াকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানর চেষ্টা করছে ওরা, যাতে উনি বাড়ি বিক্রি করে দেন। বুঝতেই পারিনি সত্যি সত্যি গুপ্তধনের জন্যে মাটি খুঁড়ছে ওরা।'

'গাধা! অযথা গালমন্দ করছ নিজেকে। তুমি কেন, কেউই বুঝতে পারত না তখন, মিস ভারনিয়ার বাড়ির তলায় গুপ্তধন খুঁজছে দানোরা।'

'মিস ভারনিয়ার বাড়ির তলায় নয়,' মুসা এখনও বুঝতে পারছে না দেখে বিরক্ত হল কিশোর। 'এখান থেকে সব চেয়ে কাছের গুপ্তধন কোথায়?'

'হবে হয়ত, পাহাড়ের তলায় কোথাও?'

'তোমার মাথা! কেন, ব্যাংকটা চোখে পড়ে না?'

'ব্যাংক?' বোকা হয়ে গেছে যেন মুসা। 'মানে?'

হাল ছেড়ে দিল কিশোর, 'এত কথা বলার সময় নেই এখন। যাও, নাম। যে-কোন সময় ব্যাটারা এসে পড়তে পারে। সাবধান, বেশি তাড়াহুড়ো কোরো না।'

কিশোর যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবে নামা সম্ভব হল না, দড়ি ধরে ঝুলে বাঁকা হয়ে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে নামতে লাগল মুসা। নিচের দিকে তাকাল না একবারও।

অর্ধেকটা মত নেমেছে মুসা, এই সময় ওপরে চিৎকার শুনল। একবার গুঙিয়ে উঠল কিশোর, তারপরেই চুপ হয়ে গেল। ধড়াস করে এক লাফ মারল মুসার হৃৎপিণ্ড। কিশোরকে কি ধরে ফেলেছে···প্রচণ্ড জোরে দড়িতে নাড়া লাগল, আরেকটু হলে হাতই ছুটে গিয়েছিল মুসার। শক্ত করে দড়ি আঁকড়ে ধরল সে।

'এই যে বিচ্ছু!' শোনা গেল বার্টের কর্কশ গলা। 'নিচে নামছে। হ্যাঁ, তোমাকে বলছি।'

ঢোক গিলল মুসা। আবার নাড়া লাগল দড়িতে। প্রাণপণে দড়ি ধরে রইল

সে। 'ব-বল!'

'উঠে এস।'

'নিচে নামছি তো!' নিজের কানেই বেখাপ্পা শুনাল মুসার কথা।

'হঠাৎ নেমে যাবে কিন্তু!' ধমকে উঠল বার্ট। দড়ি কেটে দেব।'

নিচে তাকাল মুসা। আর বড় জোর তিরিশ ফুট বাকি, ঘাস থাকলে লাফিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু কংক্রিটে বাঁধানো কঠিন পথ, দুই পায়ের হাড় কয়েক টুকরো হয়ে যাবে এখান থেকে লাফ দিলে।

'কি হল বিচ্ছু? নড়ছ না কেন? তিন পর্যন্ত গুনব, তারপর দেব দড়ি কেটে?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, গোনার দরকার নেই!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'আমি উঠে আসছি। দড়ি পিছলে যেতে চায়, শক্ত করে ধরে নিই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কোন রকম চালাকি চাই না।'

একটা বুদ্ধি এসেছে মুসার মাথায়। তেমন কিছুই নয়, তবে এতে কাজ হলেও হতে পারে। ডান হাতে দড়ি ধরে ঝুলে থেকে দাঁতে কামড়ে ডান হাতের দস্তানা খুলে ফেলল। পকেট হাতড়ে নীল চক বের করে ময়লা দেয়ালে বড়সড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল। নিচে ফেলে দিল বাকি চকটা।

'আরে অই বিচ্ছু!' অধৈর্য হয়ে পড়েছে বার্ট। 'উঠছ না কেন? দেব নাকি দড়ি কেটে?'

'এই যে আসছি, আসছি!'

নামার চেয়ে ওঠা অনেক বেশি কঠিন। অনেক কষ্টে মিনারেটের কাছাকাছি উঠে এল মুসা। তাকে ধরে তুলে নিল দুটো বলিষ্ঠ হাত।

বার্ট ছাড়াও আরও দু'জন রয়েছে মিনারেটে, কিশোরকে চেপে ধরে রেখেছে দু'দিক থেকে।

মুসার পিঠে কনুই দিয়ে গুতো মারল বার্ট। 'আগে বাড়।'

অনেক সিঁড়ি, অনেক মোড়, গলিঘুঁজি আর করিডর পার করে নিচের তলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হল দুই গোয়েন্দাকে। কংক্রিটের এবড়োখেবড়ো দেয়াল, এক পাশে বড় বড় দুটো মরচে-পড়া বয়লার পড়ে আছে। থিয়েটারের হল রুম গরম রাখার কাজে ব্যবহৃত হত নিশ্চয় ওগুলো, ভাবল মুসা।

একপাশের দেয়ালে কয়েকটা বন্ধ দরজা। প্রথম দরজাটার গায়ে লেখাঃ কোল বিন নং ১, তারপরে কোল বিন নং ২, এবং কোল বিন নং ৩। রঙ চটে গেছে, কোনমতে পড়া যায় শব্দগুলো। মুসা বুঝল, ওগুলো কয়লা রাখার ঘর।

এক নাম্বার ঘরের দরজা খুলে ছেলেদেরকে ভেতরে ঠেলে দিল বার্ট।

বিস্ময়ে ঘোঁৎ করে উঠল মুসা। এক কোণে বসে তাস খেলছে সেই চার রত্নদানো। একবার চোখ তুলে চেয়েই আবার খেলায় মন দিল ওরা। অনেকগুলো কোদাল, গাঁইতি আর শাবল ফেলে রাখা হয়েছে এক ধারে মেঝেতে। কয়েকটা

বড় বৈদ্যুতিক লণ্ঠনও আছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশি অবাক হল মুসা কংক্রিটের দেয়ালে একটা কালো ফোকর দেখে। নিশ্চয় মাটির নিচে রয়েছে দেয়ালের ওই অংশ, কারণ ফোকরটার ওপাশে কালো সুড়ঙ্গমত দেখা যাচ্ছে।

দ্রুত চিন্তা চলেছে মুসার মাথায়। তার মনে হল, সুড়ঙ্গটা গেছে মিস ভারনিয়ার বাড়ির দিকে। নাকি বাড়ির তলা দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে? চকিতে বুঝে গেল কিশোরের কথার মানে, গুপ্তধনের সন্ধানে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে...ব্যাংক...হ্যাঁ, ব্যাংকে গুপ্ত রয়েছে ওই ধন!

তিনজন লোক আর ওই চারটে অদ্ভুত জীব আসলে ডাকাত। ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে ওরা!

তেরো

কিংক্রিটের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একগাদা বস্তার ওপর বসেছে মুসা আর কিশোর। দু'জনেরই হাত-পা বাঁধা। মুখ খোলা, ইচ্ছে করলে কথা বলতে পারে, কিন্তু কথা বলার প্রবৃত্তি হচ্ছে না কিশোরের।

ডাকাতদের কাজকর্ম দেখছে মুসা। বার্টকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে, অন্য দু'জন, জিম আর রিক তার সহকারী। বেঁটে বলিষ্ঠদেহী লোকটার নাম জিম। রিকের ইয়া বড় গোঁফ, রোগাটে শরীর, কথা বললেই লণ্ঠনের আলোয় ঝিক করে উঠছে ওপরের পাটির একটা সোনায় বাঁধানো দাঁত।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বার্ট ব্যাংক ডাকাত, না? মিস্টার রবার্টের নাইটগার্ডের কাজ নিয়েছে সে ইচ্ছে করেই, ডাকাতি করার জন্যে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'শুরুতেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার। দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্রও ছিল। গাঁইতি দিয়ে মাটি কোপানর শব্দ আর কাছেই একটা ব্যাংক। অথচ কি করলাম? গাধার মত রত্নদানোর দিকে নজর দিয়ে বসলাম।'

'তোমার কি দোষ?' সান্ত্বনা দিল মুসা। 'স্বয়ং শার্লক হোমসও আগে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারত না। চমৎকার বুদ্ধি করেছে ব্যাটারা! রত্নদানোর দিকে নজর ফিরিয়ে রেখেছে আমাদের, বুঝতেই দেয়নি আসল কথা। আচ্ছা, কিশোর, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, দানো ব্যাটারা তাস খেলছে, ওদিকে তিন ডাকাত কাজ করতে করতে ঘেমে উঠেছে।'

'সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্যে ডাকা হয়নি ওদেরকে,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল কিশোরের কথায়। 'ওদেরকে ভাড়া করা হয়েছে মিস ভারনিয়াকে ভয় দেখানর জন্যে, যেন তাঁর কথা লোকে বিশ্বাস না করে সেজন্যে।'

'অ-অ, বুঝেছি। কিন্তু রত্নদানোদের খোঁজ পেল কি করে বার্ট আনল

কোত্থেকে? ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে?'

'হায়রে কপাল!' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। 'ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে আমদানি করতে যাবে কেন? ওদেরকে আনা হয়েছে রূপকথার পাতা থেকে। আঙিনায় ব্যাটাদেরকে নাচতে দেখেই সেটা অনুমান করেছিলাম।'

কিশোরের কথা আরও দুর্বোধ্য লাগল মুসার কাছে, কিন্তু বকা শোনার ভয়ে আর প্রশ্ন করল না, চুপ করে ভাবতে লাগল। মিস ভারনিয়ার লেখা বইয়ের পাতা থেকে? কি মানে এর?

ডাকাতদের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথা কাটা চলছে এখন। আলগা মাটি ঝুড়িতে করে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গমুখের বাইরে।

'আর মাত্র ফুট দশেক, রিক,' জিমকে বলতে শুনল মুসা।

'ওই দশ ফুটেই তো জান বের করে ছাড়বে!' বলল রিক।

মাটি ফেলতে এসেছিল, ঝুড়ি নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল দু'জনে।

আরেকটা প্রশ্ন জাগল মুসার মনে। 'কিশোর...' বলতে বলতেই থেমে গেল সে। বস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে গোয়েন্দাপ্রধান। ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেখ, কাণ্ড কিশোরের!—অবাক হয়ে ভাবল মুসা। কোথায় মগজ খাটিয়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবে, তা না, ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপরই মনে হল মুসার, সামনে রাতের অনেকখানি পড়ে আছে। পালানর চেষ্টা করতে হলে শক্তি সঞ্চয় করা দরকার তাদের। যেইমাত্র সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হবে, ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা নিয়ে পালাবে ডাকাতেরা। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি? ঠিক কাজই করেছে কিশোর।

মুসাও শুয়ে পড়ল। মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতেই ঘুম এসে গেল তার চোখেও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, বলতে পারবে না মুসা, কিন্তু এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। তবে হাত-পায়ের যেখানে যেখানে দড়ি বাঁধা, সেখানে টনটন করছে।

কাছেই কথা বলছে কেউ। উঠে বসে ফিরে চেয়ে দেখল মুসা, কিশোরের হাতে এক কাপ সুপ। তার পাশে একটা বাক্সের ওপর বসে আছে বার্ট। কিশোরের চেহারায় কেমন একটা খুশি খুশি ভাব।

মাটি কোপানর শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর, বোধহয় সুড়ঙ্গ খোঁড়া শেষ হয়ে গেছে। ঘরের কোণে বসে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে রত্নদানোরা। রিক আর জিমকে দেখা যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গের দিকে তাকাতেই মোটা বৈদ্যুতিক তারটা চোখে পড়ল মুসার, সাপের মত এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতরে। মোটরের আবছা গুঞ্জন কানে আসছে: ও, বোঝা গেছে, মেশিন দিয়ে ভল্টের কংক্রিটের দেয়ালে ছিদ্র করছে জিম আর রিক।

'গুড মর্নিং, মুসা,' হেসে বলল কিশোর। 'ঘুম ভাল হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, স্বপ্নে এক রাজকুমারীকে বিয়েও করে ফেলেছি।' ব্যঙ্গ ঝরল মুসার কথায়। এই বিপদের সময়ে কিশোরের হাসি আসছে কিভাবে বুঝতে পারছে না সে। কিশোরের কাপের দিকে আবার চোখ পড়তেই স্বর নরম করে ফেলল, 'কিশোর, আর কাপ নেই? মানে, সুপ দেয়া হবে না আমাকে?'

মুসার কথার ধরনে হো হো করে হেসে উঠল বার্ট। মুসাকেও এক কাপ সুপ দিল। 'বিচ্ছু ছেলে! তবে এখানে আর ইবলিসগিরি করতে পারবে না, ভালমত আটকেছি।'

'তোমরাও কম ইবলিস নাকি?' যেন ঘরোয়া আলাপ-সালাপ করছে কিশোর, এমনি ভাব। 'প্রথমে তো পুরো বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে আমাদেরকে। আঙিনায় তোমার পাঠানো দানোগুলোকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটা ববের কাজ। ফুফুকে ভয় পাইয়ে বাড়ি থেকে তাড়ানর জন্যে ওই ফন্দি করেছে। তারপরে, ওরা যখন থিয়েটারের ভেতরে এসে ঢুকল, তখন বুঝলাম আসল ঘটনাটা!'

'আরেকটু হলেই দিয়েছিলে আমাদের বারোটা বাজিয়ে,' দু'আঙুলে চুটকি বাজাল বার্ট। 'পুলিশ তো প্রায় নিয়েই এসেছিলে,' মুসার দিকে ফিরে বলল, 'চেহারা হাবাগোবার মত করে রাখলে কি হবে, ভীষণ চালাক তোমার বন্ধু। তবে এই অভিনয়টা খুব কাজে লাগবে। লোকে সন্দেহই করতে পারবে না। ওকে আমি ভালমত ট্রেনিং দিয়ে দেব। দশ বছরেই দুনিয়ার সেরা ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠবে ও।'

'ধন্যবাদ, ক্রিমিন্যাল হতে চাই না আমি,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর। 'ক্রিমিন্যালদের পরিণতি খুব খারাপ হয়।'

'বলে কি ছেলে! আরে খোকা, তুমি জান, কার সঙ্গে কথা বলছ? দেশের সবচেয়ে ঝানু ক্রিমিন্যালদের একজনের সঙ্গে। মাথায় ঘিলু থাকলে সারা জীবন অপরাধ করে বেড়াতে হয় না। প্রচুর পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে ভালমত একটা দান মেরে দিতে পারলেই বাকি জীবন বসে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে। আমার সঙ্গে থাকতে না চাইলে কি আর করব? খারাপ কাজটাই করতে হবে আমাকে।'

বার্টের কথার মানে বুঝতে পারল না মুসা, কিন্তু কেন যেন শিরশির করে উঠল তার মেরুদণ্ডের ভেতরটা।

'অনেক কথা জানার আছে মুসার,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর। 'মিস্টার বার্ট, এই ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা কি করে করলেন, খুলেই বলুন না সব ওকে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সুপের জগ তুলল বার্ট। 'আরেক কাপ নেবে?'

'আমার আর লাগবে না। মুসাকে দিন।'

মুসার কাপ ভরতি করে সুপ ঢেলে দিল বার্ট। 'হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বলি,' জগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল সে। 'এই ব্লকের পাশের ব্লকটাতেই আমার বাড়ি।

বছর চল্লিশেক আগে মিস ভারনিয়ার এক রক্তদানো ছিলাম আমিও।' দাঁত বের করে হাসল বার্ট। 'আমাকে দানো কল্পনা করতে কেমন লাগছে?' প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'হপ্তায় একবার করে পাড়ার যত ছেলেমেয়েকে নিয়ে পার্টি দিত মিস ভারনিয়া। আইসক্রীম খাওয়াত, কেক খাওয়াত, তারপর তার বই থেকে গল্প পড়ে শোনাত।'

বার্টের কাছে জানা গেল, তার বাবা ছিল রাজমিস্ত্রী, এই মুরিশ থিয়েটার আর পাশের ব্যাংকটা বানাবার সময় এখানে কাজ করেছিল। বাবার কাছেই ব্যাংকের ভল্টের কথা শুনেছে বার্ট। ওটার দরজা ইস্পাতের, কিন্তু দেয়াল তৈরি হয়েছে ক্রংক্রীট দিয়ে। মাটির অনেক গভীরে তৈরি হয়েছে ভল্ট, তাই ইস্পাতের দেয়াল দেয়ার কথা ভাবেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এই সুযোগটাই নিয়েছে বার্ট।

'ওরা ভাবেনি, কিন্তু আমি ভেবেছি,' বলল বার্ট। 'ইচ্ছে করলেই ওই ভল্ট থেকে টাকা লুট করা যায়। মিস ভারনিয়ার ভাঁড়ার থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়া শুরু করলে মাটির তলা দিয়েই পৌঁছে যাওয়া যায় ভল্টের কাছে। তারপর কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে ফেলাটা কোন কাজই না।

'তখন এই এলাকায় ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বসতবাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকে। আমি ভাবলাম, মিস ভারনিয়াও চলে যাবে, কিন্তু গেল না সে। অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। এই সময়েই একদিন শুনলাম, থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মালিকানা হাত বদল হয়ে গেছে। নতুন আইডিয়া এল মাথায়। থিয়েটার-হাউসের নিচতলার কোন একটা ঘর থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মিস ভারনিয়ার বাড়ির নিচ দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় ব্যাংকের ভল্টে। তখুনি কাজে লেগে যেতাম, কিন্তু একটা অপরাধের জন্যে ধরা পড়লাম পুলিশের হাতে, কয়েক বছর জেল হয়ে গেল।

'জেলে বসে একের পর এক প্ল্যান করেছি। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই কাজে নেমে পড়লাম। খুঁজে খুঁজে লোক জোগাড় করে একটা দল গড়লাম। থিয়েটার হাউসে তখন দু'জন নাইটগার্ড। রাতে বিচিত্র শব্দ করে ভয় দেখিয়ে ওদেরকে তাড়ালাম। নতুন নাইটগার্ড দরকার মিস্টার রবার্টের। তার কাছে গিয়ে চাকরি চাইতেই চাকরি হয়ে গেল।'

কি করে রাতের পর রাত দুই সঙ্গীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে বার্ট, সব বলল। আলগা মাটি ঝুড়িতে করে বয়ে এনে ফেলেছে কয়লা রাখার ঘরগুলোতে। কয়লার ঘরে কয়লা কিংবা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে, ভাবেনি মিস্টার রবার্ট, তাই ওই ঘরগুলোতে ঢোকেনি। ফলে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি তার।

'অ। মিস্টার রবার্ট তাহলে নেই এসবে,' বলল কিশোর। 'আমি ভেবেছিলাম সে-ও জড়িত।'

'না, সে নেই এতে। একমাত্র সমস্যা হল মিস ভারনিয়াকে নিয়ে। রাতে মাটি

কোপানর শব্দ তার কানে যাবেই। পুলিশকে গিয়ে বলে দিতে পারে। তাই কয়েকটা রত্নদানো আমদানি করতে হল। পুলিশকে বলল মিস ভারনিয়া, রাতে রত্নদানোরা মাটি কোপায়। তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল পুলিশ। আর বেশি চাপাচাপি করলে হয়ত মানসিক হাসপাতালেই পাঠাত,' হা হা করে হাসল বার্ট। 'ভাবলাম, এরপর ভয়ে বাড়ি ছেড়ে দেবে মিস ভারনিয়া। ভয় পেল ঠিকই, কিন্তু বাড়ি ছাড়ল না। তোমাদের সাহায্য চেয়ে বসল। আমার সবকিছু প্রায় ভেঙে দিয়েছিলে তোমরা, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

'যদি মিস ভারনিয়ার ভাইপো বব বিশ্বাস করে বসত?' প্রশ্ন রাখল কিশোর। 'যদি সে রাতে ফুফুর বাড়িতে থাকত, মাটি কোপানর শব্দ শুনত? দু'জনের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারত না পুলিশ।'

মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসল বার্ট। 'এত কাঁচা কাজ কি আমি করি? ববের সঙ্গে আগেই ভাব করে নিয়েছি।'

'ভাব!' বুঝতে পারছে না মুসা

'হ্যাঁ। ওকে বলেছি, মিস্টার রবার্ট মিস ভারনিয়ার বাড়িটা কিনতে চায়, কিন্তু মহিলা বেচতে রাজি নয়। তাই ভয় দেখানর ছোট্ট একটা ব্যবস্থা করেছে মিস্টার রবার্ট। বব যেন তার ফুফুকে সাহায্য না করে, এমন ভাব দেখায়, যেন ফুফুর মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। বব তো এক পায়ে খাড়া। ফুফু বাড়ি বেচলে তার লাভ। পটিয়ে মোটা টাকা নিয়ে নিতে পারবে ফুফুর মৃত্যুর আগেই।' হাসল বার্ট।

'ইয়াল্লা, কিশোর।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বব সত্যিই তাহলে আছে এর মাঝে!'

'আগেই সন্দেহ করেছ নাকি তোমরা?' ভুরু কোঁচকাল বার্ট। 'চালু ছেলে। আবার বলছি, আমার দলে চলে এস। পুলিশের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারব আমরা তাহলে।'

'কিন্তু...,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। ভয় পেয়ে গেল মুসা, সুপার ক্রিমিন্যাল হওয়ার লোভ না আবার পেয়ে বসে গোয়েন্দাপ্রধানকে। তার ভয়কে সত্য প্রমাণ করার জন্যেই যেন কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, আরও ভেবে দেখতে হবে আমাকে। সামান্য সময় দরকার।'

'আরে নিশ্চয়, নিশ্চয় সময় দেয়া হবে,' হেসে বলল বার্ট। 'যাই দেখি, জিম আর রিক কতদূর কি করল।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বার্ট, ডেকে তাকে ফেরাল মুসা। 'একটা কথা। ওই রত্নদানো আমদানি করা হল কোত্থেকে? মানুষের কথা শুনতে রাজি হল কি করে ওরা?'

শব্দ করে হাসল বার্ট। 'সেটা ওদেরকেই জিজ্ঞেস কর।' হাত তুলে ডেকে বলল, 'এই বিচ্ছুরা, এদিকে এস। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায় এরা,' বলে

আর দাঁড়াল না।

উঠে দাঁড়াল একটা দানো। লাল জ্বলজ্বলে চোখ, ময়লা দাড়ি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে এসে দাঁড়াল সে ছেলেদের সামনে। 'কি হে ইবলিসেরা, কি বলবে? এহ্, মেলা জ্বালান জ্বালিয়েছ। হাতটা প্রায় ভেঙেই দিয়েছিলে আমার। কিন্তু মাপ করে দিয়েছি, জানি তো কপালে অনেক দুঃখ আছে তোমাদের। লম্বা সাগরপাড়ি দিতে হবে।'

ভাল ইংরেজি বলে দানোটা। ম্লান আলোয় যতখানি সম্ভব ভাল করে ওটাকে দেখল মুসা। লাল চোখ, চোখা রোমশ কান, কুচকুচে কালো রোমশ বড় বড় হাত, পৃথিবীর ওপরে থাকলে এই জীব মানুষের অগোচরে থাকতে পারত না কিছুতেই। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকে বলেই লোকের চোখে পড়ে না।

'তুমি কি সত্যিই রক্তদানো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসল দানোটা। 'খুব জানতে ইচ্ছে করছে, না?' টান দিয়ে রোমশ একটা কান খুলে আনল সে। অবাক হয়ে দেখল মুসা, কানটা নকল, আসল কানের ওপর বসানো ছিল।

এরপর টান মেরে রোমশ বিশাল একটা হাত খুলে আনল দানো। বেরিয়ে পড়ল ছোট একটা হাত, বাচ্চাছেলের হাতের চেয়েও ছোট। আসল পাটির ওপর থেকে খুলে আনল নকল দাঁত। তারপর চোখে হাত দিল। সাবধানে এক চোখের ওপর থেকে সরাল পাতলা একটা জিনিস। হেসে বলল, 'দেখলে তো খোকা, লাল চোখও নেই, চোখা দাঁতও নেই।' লোকটার একটা চোখের মণি এখন স্বাভাবিক নীল। চোখের ওপর থেকে সরানো জিনিসটা দেখিয়ে বলল, 'টিনটেড কনট্যাক্ট লেন্স।' নাকে আঙুল ছোঁয়াল। 'নকল নাক।' দাড়িতে হাত দিল, 'নকল দাড়ি। রক্তদানোর ছবি দেখে তৈরি করা হয়েছে প্রতিটা জিনিস। আসলে আমি একজন বামন, খোকা।'

'অনুমান করেছি,' বলল কিশোর। 'তবে দেরিতে।'

'হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে ফেলেছ। আজ আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আগামীকাল রোববার, সোমবারের আগে কেউ কিছু জানতে পারবে না।'

'মিস ভারনিয়া আমাদেরকে না দেখলে পুলিশে খবর দেবেন,' গলায় জোর পাচ্ছে না কিশোর।

'দেবে না,' মাথা নাড়ল বামন। 'এতক্ষণে তার ভাইপোর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কাঁচা কাজ করি না আমরা, খোকা। আগামী চব্বিশ ঘন্টার আগে কেউ জানতেই পারবে না ব্যাংকটা লুট হয়েছে।'

কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার। কিছু একটা বলতে মুখ খুলল, কিন্তু বলা হল না, ঘরে এসে ঢুকল বার্ট। 'ভল্টে ঢোকার পথ হয়ে গেছে।' বামনদের সর্দারকে বলল, 'তুমি এখানে থাক।' অন্য তিন বামনকে দেখিয়ে বলল, 'ওদেরকে

নিয়ে ভল্টে যাচ্ছি আমি, কাজ আছে।'

'আমিও সঙ্গে আসব?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কি করে কাজ সারেন আপনারা, দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এস। কাজ দেখার পর ভক্তি এসেও যেতে পারে। হয়ত তখন আমাদের দলে যোগ দিতে আর দ্বিধা থাকবে না।'

কিশোরের পায়ের বাঁধন কেটে দেয়া হল। বার্ট আর তিন বামনের পিছু পিছু সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকল সে। মুসা বসে রইল আগের জায়গায়।

'খুব বোকা বানিয়েছি তোমাদের!' হাসল বামনটা। 'জানালায় টোকা দিলাম, যাতে আমার দিকে ফিরে চাও। জানতাম তাড়া করবে, করলেও, থিয়েটার হাউসে তোমাদেরকে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধে হল না।'

'কিন্তু এখানে আনার কোন দরকার ছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ শুনে সন্দেহ জাগতই তোমাদের, পুলিশ ডেকে নিয়ে আসতে হয়ত। অহেতুক কেন ঝুঁকি নিতে যাব? তার চেয়ে তোমাদেরকে আটকে ফেলাটাই কি ভাল হয়নি?'

'কিন্তু তাতেই কি ঝুঁকি চলে গেল? পুলিশ কি পরেও ধরতে পারবে না তোমাদেরকে? বামনদের সহজেই খুঁজে বের করা যাবে। পুলিশকে গিয়ে সব বলব আমরা, তারা তোমাদেরকে খুঁজে বের করবেই।'

'যদি গিয়ে বলতে পার তবে তো?' রহস্যময় হাসি হাসল বেঁটে মানুষটা। 'আর পুলিশ এলেই বা কি? ওটা হলিউড, ওখানে ছবি বানানো হয়।

'তাতে কি?'

'তাতে অনেক কিছু। সারা দুনিয়ায় যত বামন আছে, তার অর্ধেক রয়েছে ওই হলিউডে। ওখানকার অনেকেই সিনেমা কিংবা টেলিভিশনে অভিনয় করে, ডিজনিল্যাণ্ডে কাজ করে। বেকারও রয়েছে অনেক। আমিও বেকার. বামনদের একটা বোর্ডিং হাউসে থাকি। ওখানে আরও তিরিশ-বত্রিশ জন থাকে। বেকারদেরও পেট আছে, তাদেরও বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাই সব সময়ই নানারকম কাজের ধান্ধায় থাকি আমরা। লোকের বাড়ির স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে কিংবা জানালা খুলে ঢুকে যাই ভেতরে, টুকটাক জিনিস নিয়ে কেটে পড়ি। বড় ধরনের কাজও মিলে যায় মাঝে মাঝে, এখন যা করছি। আকার ছোট হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধে। এমন অনেক কাজ আমরা অনায়াসেই করতে পারি, স্বাভাবিক মানুষ যা পারে না।'

'স্বাভাবিক মানুষ আমাদের সম্পর্কে যা খুশি ভাবে ভাবুক, কিন্তু আমরা সুখেই আছি। এক বোর্ডিং হাউসে অনেকে মিলে এক পরিবারের মত থাকি, কেউ কারও বিরুদ্ধে কিছু করি না। বাইরের কেউ আমাদের কারও সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু দেখিনি, শুনিনি, কিচ্ছু অনুমান করতে পারি

না।' নকল কানটা আবার জায়গামত বসিয়ে দিল বামনটা। 'কাজেই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না পুলিশ। তোমরাও আমাদের আসল চেহারা দেখনি, চিনিয়ে দিতে পারবে না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'যাই, দেখি, ওদিকে কদ্দূর হল।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল বামনটা।

কংক্রিটের দেয়ালের বাইরে একটা গুহায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। দেয়ালে একটা ফোকর করা হয়েছে, ছোট একটা ছেলে ঢুকতে পারবে ওই পথে। দরদর করে ঘামছে শ্রান্ত জিম আর রিক। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে।

'ফোকরটা আরও বড় করা যায়,' বার্টের দিকে ফিরে বলল জিম। 'কিন্তু তাতে সময় লাগবে। তাছাড়া দরকার কি? বামনরা তো ঢুকতে পারবে এর ভেতরে।'

'হ্যাঁ, তা পারবে,' এক বামনকে ইশারা করল বার্ট।

একের পর এক বামন ঢুকে গেল ভল্টে। ওদের টর্চের আলোয় চারকোণা একটা ঘর দেখা গেল। দেয়ালের তাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে কাগজের নোট, গহনার বাক্স। মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে মুদ্রার বস্তা।

'দশ লাখ ডলারের বেশি!' নোটগুলোর দিকে চেয়ে আছে বার্ট, জ্বলছে চোখের তারা। 'সোমবার অ্যারোপ্লেন কোম্পানির বেতনের দিন। তাই হেড অফিস থেকে এত টাকা তুলে এনে রাখা হয়েছে।' কিশোরকে জানাল সে।

গভীর আগ্রহ নিয়ে বামনদের কাজ দেখছে কিশোর। তাক থেকে নোটের তাড়া নামিয়ে ছোট ছোট বস্তায় ভরল ওরা। অলঙ্কারের বাক্সগুলো ভরল আলাদা একটা বস্তায়।

'পয়সার বস্তা নিয়ো না,' বামনদেরকে বলল জিম। 'বেশি ভারি।'

'শুধু দুটো বস্তা নিয়ে এস,' হাত নাড়ল বার্ট। 'দরকার আছে।'

নোট আর গহনার বস্তা এপাশে পাচার করে দিল বামনরা। মুদ্রার ভারি বস্তা পার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

জুড়িতে বস্তাগুলো সব তুলে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল সুড়ঙ্গের বাইরে, কয়লা রাখার ঘরে। একটা বস্তা খুলে নোটের বাণ্ডিল বের করল বার্ট। বামন সর্দারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও, এক লাখ। চারজনে ভাগ করে নিয়ো। সাবধানে খরচ কোরো, নইলে বিপদে পড়বে। যাও এখন। তোমাদের কাজ শেষ। আমরাও এখুনি যাব।'

'অত তাড়াহুড়ো নেই,' বলল রিক। 'অনেক আগেই কাজ শেষ করে ফেলেছি।'

রিকের কথার কোন জবাব না দিয়ে কিশোরের দিকে ঘুরল বার্ট। 'খোকা, আমাদের কাজ তো দেখলে, কি ঠিক করলে? আমাদের সঙ্গে থাকবে? আমি বলি থাক, কাজ কর, প্রচুর টাকা কামাই করতে পারবে। তোমার যা ব্রেন, খুব

গ্যাঙ-লীডার হতে পারবে একদিন।'

কি জবাব দেবে কিশোর?-ভাবল মুসা। কিশোর কি রাজি হবে?

'আরও ভাবতে হবে আমার,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'আসলে অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে তোমাদের, কঠিন কাজটাই বাকি রয়ে গেছে এখনও। অপরাধ করা সহজ, কিন্তু করে পার পাওয়া খুব কঠিন। বেশির ভাগ অপরাধীই সেটা পারে না।'

কিশোরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল বার্টের, হাসল। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'বলেছি না, ছেলেটার বুদ্ধি আছে।' কিশোরকে বলল, 'একটু কষ্ট করতে হবে তোমাদের। রিক…,' মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল সে।

বড় বড় দুটো চটের বস্তা নিয়ে এল রিক। কিশোর আর মুসাকে বস্তায় ভরে বস্তার মুখ বেঁধে ফেলা হল।

'ট্রাকে তুলে দাও,' বলল বার্ট।

'খামোকা ঝামেলা,' বলল রিক। 'ওরা আমাদের কথা শুনবে বলে মনে হয় না।'

'তাই মনে হচ্ছে, না? পয়সার বস্তা দুটো কেন নিয়েছি? তেমন বুঝলে পায়ে বেঁধে পানিতে ফেলে দিলেই হবে,' শব্দ করে হাসল বার্ট।

চোদ্দ

রোববার সকাল।

জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ঘুম ভাঙল রবিনের, কিন্তু চুপচাপ বসে রইল অলস কয়েকটা মুহূর্ত। মুসা আর কিশোরের কথা মনে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। রাতে কতখানি কি করেছে ওরা? কিছু দেখেছে? রত্নদানো ধরতে পেরেছে? ফোন করেছে?

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল রবিন। ওয়াকি-টকিটা পকেটে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল। রান্নাঘর থেকে গরম কেকের গন্ধ আসছে। ম্যাপল গুড়ের তাজা সুগন্ধ সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন নাকে।

'মা, কিশোর ফোন করেছে?' রান্নাঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না।'

তারমানে, রাতে তেমন কিছু ঘটেনি, ভাবল রবিন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরেসুস্থে নাস্তা সারল সে। তারপর সাইকেল বের করে নিয়ে রওনা হল স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

খোলা সদর দরজা দিয়ে ইয়ার্ডের আঙিনায় ঢুকে পড়ল রবিন।

হাফ-ট্রাকটা ধোয়া-মোছায় ব্যস্ত বোরিস। তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন, এলে অ…শারের কোন খবর আছে?'

'না,' মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল বোরিস।

ভাঁজ পড়ল রবিনের কপালে। ইয়ার্ডের অফিসে ঢুকল। মিস ভারনিয়ার বাড়িতে ফোন করল। রিঙ হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না ওপাশ থেকে। কেন? আবার ডায়াল করল সে। এবারেও ধরল না কেউ। কি ব্যাপার? চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। অফিস থেকে বেরিয়ে এল। 'বোরিস, কেউ রিসিভার তুলছে না! মনে হচ্ছে কেউ বাড়িতে নেই।'

ফিরে তাকাল বোরিস। 'রক্তদানোদের শিকার হয়ে গেল না তো?'

'জলদি চলুন! একটা কিছু ঘটেছে!'

'চল!'

ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন.

'নিশ্চয় কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। ছুটে এসে আবার ঢুকল অফিসে, প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যাল্লো! পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।'

'কিশোর স্যান আছে?' মিরোর গলা চিনতে পারল রবিন। বলল, 'না, বাইরে গেছে। আমি রবিন।'

'ও, রবিন স্যান। কিশোরের জন্যে একটা মেসেজ আছে। আবার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে মিউজিয়মে, ছবিগুলোর পেছনেও দেখা হয়েছে।'

'গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া গেছে?' সিরিসভার জোরে কানে চেপে ধরল রবিন।

'নাহ্! বাবা খুব রেগে গেছে আমার ওপর। অযথা হয়রানি করা হয়েছে বলে। আমার কিন্তু এখনও পুরোমাত্রায় বিশ্বাস রয়েছে কিশোর-স্যানের ওপর। গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া যায়নি, বল তাকে।'

'বলব,' রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে রেখেছে বোরিস, রবিন এসে তার পাশে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছবির পেছনে গোল্ডেন বেল্ট পাওয়া যায়নি! কিশোরের জন্যে একটা বড় দুঃসংবাদ, ভাবল রবিন। এমন তো সাধারণত করে না কিশোর! তাহলে?

একে রোববার, তার ওপর খুব সকাল, রাস্তায় গাড়ির ভিড় কম। সাংঘাতিক স্পীড দিয়েছে বোরিস, থরথর করে কাঁপছে ট্রাক। পয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় মিস ভারনিয়ার গেটে এসে পৌঁছুল ওরা।

ইঞ্জিন থামার আগেই দরজা খুলে লাফিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রবিন। ছুটে এসে বেলের বোতাম টিপে ধরল। ধরেই রাখল, কিন্তু কোন সাড়া এল না বাড়ির ভেতর থেকে। পুরোপুরি শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। বোরিসকে ডাকল।

ট্রাক থেকে নামছে বোরিস, এই সময় রবিন লক্ষ্য করল মিস ভারনিয়ার বাড়ির গেট পুরোপুরি বন্ধ নয়। ঠেলে পাল্লা আরও ফাঁক করে ঢুকে পড়ল আঙিনায়। তার পেছনেই ঢুকল বোরিস। বারান্দায় এসে উঠল দু'জনে।

দরজার পাশে আরেকটা বেলের বোতাম, টিপে ধরল রবিন, কিন্তু এবারও সাড়া দিল না, কেউ।

'নিশ্চয় পাথর বানিয়ে ফেলেছে দানোরা!' নিচু গলায় বলল বোরিস।

দরজায় ঠেলা দিল রবিন। হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে কিশোর আর মুসার নাম ধরে কয়েকবার ডাকল সে, জবাব এল না। ঘরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তার চিৎকার।

পুরো বাড়ি খুঁজে দেখল রবিন আর বোরিস, ভাঁড়ারও বাদ দিল না। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। সিঁড়ির মাথার ঘরে কিশোরের ব্যাগ, মুসার পাজামা আর হাতব্যাগ পড়ে রয়েছে।

'নিশ্চয় কিছু দেখেছে মুসা আর কিশোর!' দ্রুত চিন্তা চলছে রবিনের মাথায়। 'হয়ত আরও কাছে থেকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছে! দুজনের পিছে পিছে গিয়েছেন মিস ভারনিয়া, তিনিও ধরা পড়েছেন!'

'রক্তদানোরাই ধরেছে!' মুখ শুকিয়ে গেছে বোরিসের।

'বাইরে খুঁজে দেখি, চলুন!' গলা কাঁপছে রবিনের। তিনজন জলজ্যান্ত মানুষকে দানোরা পাথর বানিয়ে ফেলেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার ধারণা, অন্য কিছু ঘটেছে। 'আঙিনা থেকে শুরু করব।'

কিশোরের ক্যামেরাটা খুঁজে পেল রবিন। ঝোপের একটা সরু ডালে বেল্ট পেঁচিয়ে আছে। হ্যাঁচকা টান মেরে ডাল থেকে বেল্ট ছাড়িয়ে দিল সে। 'এখান দিয়ে গেছে কিশোর! নিশ্চয় কোন কিছুর ফটো তুলেছে!'

ক্যামেরা থেকে ছবি বের করল রবিন। দেখার জন্যে ঝুঁকে এল বোরিস।

ছবি দেখে থ হয়ে গেল দু'জনেই। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর চেহারার রক্তদানো!

'কি...কি বলেছিলাম!' তোতলাতে শুরু করল বোরিস। 'ওদেরকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'পুলিশকে খবর দিতে হবে...,' বলতে বলতে থেমে গেল রবিন। এই ছবি পুলিশকে দেখালে তাদের কি প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবে, দ্বিধা করল। না, আগে সে আর বোরিস খুঁজে দেখবে। না পাওয়া গেলে তখন অন্য কথা। 'বোরিস, এ-বাড়িতে নেই ওরা। যাওয়ার সময় কোন সূত্র রেখে গেছে হয়ত। আরও ভালমত খুঁজতে হবে আমাদের। এখানে না পেলে পুরো ব্লকটা খুঁজে দেখব।'

আরও একবার খোঁজা হল মিস ভারনিয়ার বাড়ি। কিছু পাওয়া গেল না। বেরিয়ে পড়ল ওরা ও-বাড়ি থেকে।

আগে আগে পথে এসে নামল রবিন, তার পেছনে বোরিস। কাউকে দেখা গেল না রাস্তায়; একেবারে নির্জন। গলিপথ ধরে থিয়েটার-বাড়ির পেছনে চলে এল ওরা।

নীল চকটা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল রবিন। অর্ধেক ক্ষয় হয়ে গেছে, তারমানে কিছু লিখেছে মুসা। এখানে এল কি করে এটা? মুসা ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেল? নাকি কোনভাবে তার পকেট থেকে পড়ে গেছে।

তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশটা পরীক্ষা করে দেখল রবিন। আর কোন রকম চিহ্ন নেই। বাড়ির দেয়াল দেখল, ধীরে ধীরে তার নজর উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল চিহ্নটা। নীল চক দিয়ে মস্ত বড় করে আঁকা হয়েছে একটা প্রশ্নবোধক। কোন সন্দেহ নেই, মুসাই এঁকেছে! কিন্তু খাড়া দেয়াল, ওখানে উঠল কি করে সে? ভেবে যেন কূলকিনারা পেল না রবিন।

'বোরিস,' হাত তুলে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দেখাল রবিন। 'ওটা মুসা এঁকেছে! আমার মনে হয় এই বাড়ির ভেতরেই আছে ওরা!'

'দরজা ভাঙতে হবে!' বন্ধ পাল্লার দিকে চেয়ে বলল বোরিস। পা বাড়াল দরজার দিকে।

খপ করে বোরিসের হাত চেপে ধরল রবিন। 'না না, ভাঙতে গেলে শব্দ হবে। অনেক দরজা আছে, একটা না একটা খোলা পাওয়া যাবেই।'

মিস ভারনিয়ার বাড়ির পেছনের গলি পথটার কাছে বোরিসকে নিয়ে এল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'সাবধানে এগোতে হবে!'

পকেটে থেকে ছোট গোল একটা আয়না বের করল রবিন। কিশোরের ধারণা, তিন গোয়েন্দার কাজে লাগবে এই জিনিস, তাই তিনজনেই একটা করে সঙ্গে রাখে।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। গলি পথটার মোড়ে এসে থামল, পাঁচ আঙুলে আয়নাটা ধরে হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। আয়নার ভেতরে দেখা যাচ্ছে পথটা। ইমার্জেন্সী ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা সবুজ ভ্যান। আগেরদিন ওখানে ওটা ছিল না।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তাকে দেখেই চমকে উঠল রবিন। বার্ট ইঅং, হাতে একটা বস্তা, ভেতরে ঠাসাঠাসি করে ভরা হয়েছে কিছু। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ইঅং, যেন ভয় করছে, কেউ তাকে দেখে ফেলবে।

'রবিন, কিছু দেখেছ মনে হচ্ছে?' পেছন থেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'নাইটগার্ড! নিশ্চয় কিছু চুরি করছে ব্যাটা! আর কোন সন্দেহ নেই, ভেতরেই আছে মুসা আর কিশোর।'

'তাহলে চল ঢুকে পড়ি! গার্ড ব্যাটা কিছু বললে...' শার্টের হাতা গোটাল বোরিস।

'না না, এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না,' বাধা দিল রবিন। 'নিশ্চয় ভেতরে গার্ডের আরও সাঙ্গোপাঙ্গো রয়েছে।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আরও দু'জন বেরোচ্ছে,

হাতে বস্তা! বোরিস, পুলিশ ডাকতে হবে! জলদি যান! আমি আছি এখানে!'

বোরিসের ধারণা, তিন চোরকে সে একাই সামলাতে পারবে। বলল, 'পুলিশ ডাকার কি দরকার? আমিই...'

'না, ঝুঁকি নেয়া উচিত না! শিগগির যান!'

আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে চলে গেল বোরিস।

হাত মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে রবিন, তাই তার হাত কিংবা আয়নাটা চোখে পড়ছে না তিন চোরের। একের পর এক বস্তা এনে গাড়িতে তুলছে ওরা।

সময় যাচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছে রবিন। এখনও আসছে না কেন বোরিস?

গাড়িতে বস্তা তোলা বোধহয় শেষ হয়েছে চোরদের। গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে কি যেন পরামর্শ করল ওরা। একসঙ্গে তিনজনেই আবার গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতরে। খানিক পরে বেরিয়ে এল, দু'জনের কাঁধে দুটো বড় বস্তা, ভেতরে ভারি কিছু রয়েছে।

হঠাৎ নড়ে উঠল যেন একটা বস্তার ভেতরে কিছু! চোখের ভুল? আরও ভাল করে তাকাল রবিন। না না, ঠিকই নড়ছে। বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন ভেতরের 'কিছু'টা! ভ্যানের ভেতরে অন্যান্য বস্তার ওপর নামিয়ে রাখা হল বড় বস্তাদুটো।

বোরিসের দেরি দেখে হতাশ হয়ে পড়ছে রবিন, ঘামছে দরদর করে। বুঝতে পারছে, দুটো বস্তার ভেতরে রয়েছে কিশোর আর মুসা। বোরিস থাকলে দু'জনে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত লোকগুলোর ওপর, মুক্ত করতে পারত দুই বন্ধুকে। একাই যাবে কিনা ভাবল রবিন, পরক্ষণেই নাকচ করে দিল চিন্তাটা। সে গিয়ে একা কিছুই করতে পারবে না, বরং ধরা পড়বে।

ভ্যানের পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল এক চোর। তিনজনেই উঠে বসল সামনের সিটে। মুহূর্ত পরেই ইঞ্জিন স্টার্ট নিল, চলতে শুরু করল গাড়ি।

রবিনের চোখের সামনে দিয়ে বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিশোর আর মুসাকে, অথচ কিছুই করতে পারছে না সে! রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল সে।

পনেরো

বড় বেকায়দা অবস্থায় রয়েছে মুসা আর কিশোর। হাত-পা বাঁধা, বস্তার পাটের আঁশ সুড়সুড়ি দিচ্ছে নাকে মুখে। টাকা-পয়সার উঁচু নিচু বস্তার ওপর পড়ে আছে, তার ওপর অমসৃণ পথে গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, ব্যথা হয়ে গেছে দু'জনের পিঠ।

টেনে হাতের বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিশোর।

সঙ্গীকে নড়তে দেখে মুসা বলল, 'কিশোর, আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে

ওরা?'

'বোধহয় কোন জাহাজে,' ফিসফিস করে জবাব দিল কিশোর। 'সাগর পাড়ি দেয়ার কথা বলছিল, মনে আছে?'

'শেষে পানিতে ডুবেই মরণ ছিল কপালে!' বিষণ্ন শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'বার্ট কি বলল শুনলে না? পয়সার বস্তা পায়ে বেঁধে ছেড়ে দেবে।'

'শুনেছি,' বলল কিশোর। 'মুসা, হ্যারি হুডিনির নাম শুনেছ? ওই যে সেই বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান, হাত-পা বেঁধে ড্রামে ভরে পানিতে ফেলে দিলেও যিনি বেঁচে ফিরতেন?'

'তাঁর মত জাদুকর হলে মোটেই ভাবতাম না,' গোঁ গোঁ করে বলল মুসা। 'কিন্তু আমি হুডিনি নই, মুসা আমান। বড় জোর মিনিট খানেক কোনমতে টিকে থাকতে পারব পানির তলায়, তারপরই জারিজুরি খতম।'

মুসার কথার ধরনে হেসে উঠল এক বামন। বন্দিদের সঙ্গে ওরা চারজনও চলেছে ভ্যানের পেছনে বসে।

'যদি পানিতে না ফেলে?' যে বামনটা হেসেছে, সে বলল। 'যদি কোন আরব শেখের কাছে বেচে দেয়? শুনেছি, আরবের কোন কোন আমির নাকি এখনও গোলাম কিনে রাখে।'

ব্যাপারটা ভেবে দেখল মুসা। সিনেমায় দেখেছে, গোলামদের ওপর কি রকম অকথ্য অত্যাচার করে মনিবেরা। কোনটা বেছে নেবে? পানিতে ডুবে মৃত্যু? নাকি শেখের গোলাম হওয়া? দুটোর কোনটাই পছন্দ হল না তার।

ছেলেদের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে চুপ করে গেল বামনটা।

ভ্যানের গতি কমতে শুরু করল, ঝাঁকুনিও কমে এল।

বার্টের গলা শোনা গেল, বামনদেরকে বলছে, 'বাস ধরে চলে যাবে হলিউডে। আবার বলছি, বুঝেশুনে টাকা খরচ কর। লোকের চোখে যাতে না পড়ে।'

'আর বলতে হবে না,' বলল বামন। 'টাকা এখন খরচই করব না আমরা।'

'আরেকটা কথা, মুখ বন্ধ রাখবে!'

'রাখব।'

থেমে দাঁড়াল ভ্যান। পেছনের দরজা খুলে নেমে গেল বামনরা। দড়াম করে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, আবার ছুটল গাড়ি। কোনরকম ঝাঁকুনি নেই আর এখন, নিশ্চয় মসৃণ হাইওয়েতে উঠে এসেছে। কয়েক মাইল দূরেই রয়েছে সাগর। সেখানে ডাকাতদের অপেক্ষায় রয়েছে কোন একটা জাহাজ, ভাবল কিশোর।

প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, এইবার আমাদের খেল খতম! ইস্‌স্‌, কেন যে এই গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা শুরু করেছিলাম!'

'আমাদের মেধাকে কাজে লাগানর জন্যে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'মেধা জমে বরফ হয়ে গেছে আমার!' ঝাঁঝাল গলায় বলল মুসা। 'রবিনটাও

যদি সময়মত আসত! চিহ্নটা দেখত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কিশোর, দোহাই তোমার, চুপ করে থেক না! কিছু অন্তত বল! বল, বাঁচার আশা আছে আমাদের!'

'নেই,' সত্যি কথাটাই বলল কিশোর। 'বার্ট খুব চালাক। কোনরকম ফাঁক রাখেনি।'

ভ্যানকে অনুসরণ করে চলেছে ট্রাক। রবিন উত্তেজিত, বোরিস গম্ভীর।

বোরিস যখন ফিরেছিল, সবুজ ভ্যানটা তখন মাত্র গলির মোড় পেরিয়ে গেছে। পুলিশ আনতে পারেনি সে, রাস্তায় পুলিশ ছিল না। রবিন একবার ভেবেছে, কোন পুলিশ স্টেশনে ফোন করবে। কিন্তু পরে ভেবেছে, আজ রোববার, দোকান পাট সব বন্ধ, টেলিফোন করবে কোথা থেকে? কাজেই তখন যা করা উচিত, ঠিক তাই করেছে, বোরিসকে নিয়ে ট্রাকে উঠে পড়েছে, পিছু নিয়েছে ভ্যানের।

রোববার সকালে গাড়ির ভিড় কম, পথ প্রায় নির্জন, গতি বাড়াতে কোন অসুবিধে নেই। তীব্র গতিতে ছুটেছে ভ্যান, ওটার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে ইয়ার্ডের পুরানো ট্রাকের পক্ষে। বার বার পিছিয়ে পড়ছে।

'দেব নাকি বাড়ি লাগিয়ে!' আপনমনেই বলল বোরিস। 'কোন ভাবে আটকে দিতে পারলে...'

'...না না, এতবড় ঝুঁকি নেয়া যাবে না! ভ্যান উল্টে যায় যদি? যেভাবে যাচ্ছেন, যেতে থাকুন।'

চলতে চলতে এক সময় গতি কমে গেল ভ্যানের, থামল। পেছনের দরজা খুলে টপাটপ লাফিয়ে নামল চারটে 'ছেলে'। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বাস স্টপের দিকে।

'ধরব নাকি পিচ্চিগুলোকে!' ভুরু কুঁচকে গেছে বোরিসের। 'গোটা কয়েক চড়থাপ্পড় দিলেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।'

'কি বলবে?' হাত তুলল রবিন। 'না, ভ্যানটা হারাব তাহলে!'

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আবার চলতে শুরু করল ভ্যান। মোড় নিয়ে পুরানো রাস্তা ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে গেল। এগিয়ে চলল নাক বরাবর পশ্চিমে, উপকূলের দিকে।

পেছনে ট্রাক নিয়ে আঠার মত লেগে রইল বোরিস। কিন্তু আর বেশিক্ষণ লেগে থাকা বোধহয় সম্ভব না। ভ্যানটা নতুন, ওটার সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পুরানো ট্রাক।

নড়েচড়ে বসল রবিন। পকেটে টান পড়তেই গায়ে শক্ত চাপ অনুভব করল সে, মনে পড়ল ওয়াকি-টকিটার কথা। তাই তো? যোগাযোগ করা যায়। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ছোট্ট রেডিওটা বের করল সে। একটা বোতাম টিপে

দিয়ে কানের কাছে ধরল যন্ত্রটা। এক মুহূর্ত বিচিত্র গুঞ্জন উঠল স্পীকারে, পরক্ষণেই তাকে অবাক করে দিয়ে ভেসে এল একজন মানুষের গলা। কেমন পরিচিত। জোরাল, স্পষ্ট কথাঃ 'হাল্লো, হারবার! হাল্লো হারবার! অপারেশন থিয়েটার কলিং! শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ?'

টানটান হয়ে গেছে রবিনের সমস্ত স্নায়ু, উৎকর্ণ হয়ে আছে সে। জবাব এল অতি মৃদু গলায়ঃ 'হালো অপারেশন থিয়েটার। হারবার বলছি। কাজ শেষ? কোন গোলমাল?'

'হাল্লো, হারবার!' আরে, বার্ট ইঅং-এর কণ্ঠ। 'শেষ। কোন গোলমাল হয়নি। তবে দু'জন যাত্রী নিয়ে আসছি সঙ্গে। ডকের কাছাকাছি পৌঁছে আবার কথা বলব। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

চুপ হয়ে গেল স্পীকার।

হঠাৎ বুম্‌ম্‌ করে কান ফাটানো শব্দ উঠল। নিজের অজান্তেই মাথা নিচু করে ফেলল রবিন। ভ্যান থেকে বোমা ছুঁড়ল না তো!

থরথর করে কেঁপে উঠল ট্রাক, নাক সোজা রাখতে পারছে না যেন কিছুতেই। স্টিয়ারিঙে চেপে বসেছে বোরিসের আঙুল, ফুলে উঠেছে হাতের শিরা। অনেক কষ্টে ট্রাকটাকে সাইডরোডে নামিয়ে আনল সে, থামিয়ে দিল।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে বোরিস। 'টায়ার ফেটে গেছে!'

ঢিল হয়ে গেল রবিনের স্নায়ু। হেলান দিয়ে বসল, দু'হাত ছড়িয়ে পড়ল দু'দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবুজ ভ্যানটার দিকে, দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে ওটা।

ষোলো

যত তাড়াতাড়ি পারল, টায়ার বদলে নিল বোরিস। কিন্তু তাতেও দশ মিনিটের বেশি লেগে গেল। ইতিমধ্যে নিশ্চয় কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে ভ্যানটা।

অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভব করছে রবিন। কেন যেন তার মনে হল, কিশোর আর মুসাকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না।

'রবিন, এখন কি করা?' ড্রাইভিং সিটে রবিনের পাশে উঠে বসেছে আবার বোরিস। 'পুলিশের কাছে যাব?'

'কি হবে? ভ্যানের লাইসেন্স নাম্বার নিতে ভুলে গেছি আমি,' একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে রবিন। 'পুলিশকে কি বলব?'

কি যেন ভাবল বোরিস। 'সোজা পথ। ভ্যানটা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাই,' বলতে বলতেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গিয়ার দিল সে। নির্জন হাইওয়ে ধরে ট্রাক ছোটাল আবার পশ্চিমে।

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা ম্যাপ বের করল রবিন। তাতে দেখল, কয়েক মাইল সামনে এক জায়গায় পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা শাখা চলে গেছে সুন্দর সৈকত শহর লং বীচ-এর দিকে। আরেকটা শাখা গেছে স্যান পেড্রোতে।

রেডিওতে একটা বন্দরের কথা বলা হয়েছে। লং বীচে বন্দর নেই, স্যান পেড্রোতে আছে। তারমানে ওদিকেই গেছে ভ্যানটা।

'বোরিস, স্যান পেড্রোর দিকে যেতে হবে,' বলল রবিন।

'হোকে,' একমনে গাড়ি চালাচ্ছে ব্যাভারিয়ান।

পুরানো ইঞ্জিনের শক্তি নিঙড়ে যত জোরে সম্ভব ছুটে চলেছে ট্রাক। মগজে ভাবনার ছুরি চালাচ্ছে রবিন, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না রক্তদানো খুঁজতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে পড়ল কি করে মুসা আর রবিন! তাদেরকে বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে কেন মরিশ থিয়েটারের দারোয়ান বার্ট ইঅং! বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তার সময় পেল না সে, দুই রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল ট্রাক।

স্যান পেড্রোর রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনল বোরিস। গতি সামান্য শিথিল করতে হয়েছিল, আবার বাড়িয়ে দিল।

শিগগিরই স্যান পেড্রোর সীমানা দেখা গেল দূর থেকে। রাস্তার দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠে কালো কালো অসংখ্য বিন্দু দেখা যাচ্ছে। কাছে এলে বোঝা গেল ওগুলো কি। ডেরিক। কুৎসিত দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কালো যন্ত্রগুলো, মাটির তলা থেকে তেল তোলার জন্যে বসানো হয়েছে।

বন্দরে এসে ঢুকল ট্রাক। তেলমেশানো ঘোলা পানিতে গাদাগাদি করে ভাসছে ছোট-বড় মাঝারি অগুনতি জলযান। নানারকম জাহাজের মাঝে মাঝে রয়েছে মাছ ধরার নৌকা আর লঞ্চ। প্রায় প্রতি মুহূর্তে বন্দরে ঢুকছে কিংবা বন্দর ত্যাগ করছে একের পর এক বোট, জাহাজ, ফ্রেইটার।

ট্রাক থামাল বোরিস। কোন্‌দিকে যাবে এবার? কোথাও দেখা যাচ্ছে না সবুজ ভ্যানটা। হাজারো জলযানের যে-কোনটাতে থাকতে পারে মুসা আর কিশোর। কোন্‌টাতে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে ওদেরকে, কি করে বোঝা যাবে?

'রবিন, কিছু ভাবতে পারছি না আমি!' তিক্ত কণ্ঠে বলল বোরিস। 'আর কোন আশা নেই!'

'কি জানি!' কপালে আঙুল ঘষছে রবিন। 'রেডিওতে বলল...,' হঠাৎ এমনভাবে লাফিয়ে উঠল সে, যেন বোলতা হুল ফুটিয়েছে। চাঁদিতে কেবিনের ছাতের বাড়ি লাগতেই ধুপপ্ করে বসে পড়ল আবার। চেঁচিয়ে উঠল, 'রেডিও! হ্যাঁ, রেডিও! বন্দরে ঢুকে আবার কথা বলবে বলেছিল!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে সে।

বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলল রবিন।

পকেটের এখানে ওখানে বেধে গেল ওয়াকি-টকি, কিন্তু হাতে বেরিয়ে এল অবশেষে।

বোতাম টিপে ওয়াকি-টকি অন করে দিল রবিন, কানের কাছে নিয়ে এল যন্ত্রটা। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কথা বলবে তো? নাকি এতক্ষণে বলে ফেলেছে?

রবিনকে চমকে দিয়ে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকারঃ 'অপারেশন থিয়েটার! বোট নামিয়ে দিয়েছি। সাঁইত্রিশ নাম্বারে থাক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তুলে নেব। মালপত্রসহ যাত্রীদেরকে তৈরি রাখ। সঙ্গে সঙ্গেই যাতে বোটে তুলে নেয়া যায়।'

'অপারেশন থিয়েটার বলছি,' বার্টের গলা শোনা গেল স্পীকারে। 'বোটটা দেখতে পাচ্ছি। যাত্রী আর মালপত্র ট্রাকে তৈরিই আছে। তুলতে দেরি হবে না।'

'গুড। আমরা আরও কাছে এলে একটা সাদা রুমাল নাড়বে, তাহলে বুঝব কোন গোলমাল নেই। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

চুপ হয়ে গেল স্পীকার। রবিন চেঁচিয়ে উঠল, 'বোরিস, জলদি, সাঁইত্রিশ নাম্বার জেটি! মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে!'

'কিন্তু সাঁইত্রিশ নাম্বার কোনটা? স্যান পেড্রোতে আসিনি আগে কখনও,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বোরিস।

'কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। জলদি!'

ধীরে এগোল ট্রাক। একটা লোকও চোখে পড়ছে না। রোববারের এই সকালে নির্জন হয়ে আছে এলাকাটা, মৃত বন্দর যেন। সামনে একটা বাঁক। মোড় নিয়েই পুলিশের গাড়িটা দেখতে পেল ওরা।

'ওই গাড়িটার পাশে, জলদি!' আঙুল তুলে দেখাল রবিন।

জোরে ছুটে এসে পুলিশের গাড়ির পাশে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল বোরিস।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে বলল রবিন, 'এই যে, স্যার, সাঁইত্রিশ নাম্বার জেটিটা কোথায়, বলবেন?'

'সাঁইত্রিশ?' বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছন দিকে দেখাল অফিসার, রবিনরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। 'তিনটে ব্লক পেছনে। না না, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এটা ওয়ান ওয়ে। সামনে চার ব্লক যেতে হবে সোজা, ডানে মোড় নিয়ে...'

অফিসারের কথা শেষ হওয়ার আগেই এক কাণ্ড করল বোরিস। গ্যাস প্যাডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল। প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন, দুই চাকার ওপর ভর দিয়ে আধ চক্কর ঘুরে গেল গাড়ি, টায়ার ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ উঠল, পরক্ষণেই খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ট্রাকটা। তীব্র গতিতে ছুটে চলল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'হেইই! বেআইনী...' চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, মাত্র দুটো শব্দ রবিনের কানে

ঢুকল, বাকিটা ঢাকা পড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দে।

দেখতে দেখতে তিনটে ব্লক পেরিয়ে এল ট্রাক।

'মোড় নিন! মোড় নিন!' আঙুল তুলে দেখাল রবিন। পথের মোড়ে খাটো একটা সাইনবোর্ড, তাতে '৩৭' নাম্বার লেখা, তলায় তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন্‌দিকে যেতে হবে।

আবার টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে মোড় নিল ট্রাক। সামনে জেটিতে ঢোকার গেট। ভারি লোহার পাতের ফ্রেমে মোটা তারের জাল লাগিয়ে তৈরি হয়েছে পাল্লা।

সবুজ ভ্যানটা পানির প্রায় ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের বাম্পারের ঠিক পেছনে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সাদা রুমাল নাড়ছে একজন লোক। জেটি থেকে মাত্র শ'খানেক গজ দূরে একটা লঞ্চ, দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকেই।

'দরজায় তালা!' ট্রাকের গতি কমাল বোরিস।

পেছনে সাইরেনের শব্দ। ট্রাকের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে কয়েক গজ সামনে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিশের গাড়িটা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। রিভলভার হাতে লাফিয়ে নেমে এল পুলিশ অফিসার। ছুটে এল ট্রাকের দিকে।

ট্রাক থামিয়ে দিয়েছে বোরিস। তার পাশে এসে হাত বাড়াল অফিসার, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট! ওয়ান ওয়েতে ইউ টার্ন নিয়েছ, বেআইনীভাবে গতি বাড়িয়েছ। দেখি, লাইসেন্স দেখি?'

'সময় নেই, অফিসার, আপনি বুঝতে পারছেন না!' চেঁচিয়ে বলল বোরিস। 'জলদি সাঁইত্রিশ নাম্বারে ঢুকতে হবে...'

'...লোডিং আজ বন্ধ,' বোরিসকে থামিয়ে দিয়ে বলল অফিসার। 'ধানাই পানাই বাদ দাও। লাইসেন্স দেখি।'

বোরিসের কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল রবিন। 'অফিসার, সত্যিই বুঝতে পারছেন না আপনি! ওই ভ্যানে দুটো ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে! প্লীজ, সাহায্য করুন আমাদেরকে!'

'ওসব কিচ্ছা-কাহিনী বাদ দাও, খোকা,' সবুজ ভ্যানটার দিকে একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল অফিসার। 'ওসব অনেক শোনা আছে,' বোরিসের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'কই, লাইসেন্স কই?'

প্রতিটি সেকেণ্ড এখন মূল্যবান, দ্রুত এগিয়ে আসছে লঞ্চ, কিন্তু অফিসারকে বোঝানো যাচ্ছে না সেটা। মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'বোরিস, গেট ভেঙে ঢুকে যান! যা হয় হবে!'

এমন কিছুই একটা বোধহয় ভাবছিল বোরিস, রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই সামনে লাফ দিল ট্রাক। পেছনে চেঁচিয়ে উঠল অফিসার, কানেই তুলল না

ব্যাভারিয়ান।

ভয়ঙ্কর গতিতে এসে গেটের পাল্লায় সামনের বাম্পার দিয়ে আঘাত হানল ট্রাক। তীক্ষ্ণ বিচিত্র শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাল যেন পাল্লা, পরক্ষণেই বাঁকাচোরা হয়ে ছিঁড়ে ভেঙে খুলে এল কব্জা থেকে, ট্রাকের বাম্পারে আটকে থেকে কয়েক গজ এগোল, তারপর খসে পড়ল পথের ওপর। পাল্লা মাড়িয়েই এগোনর চেষ্টা করল ট্রাক, কিন্তু পারল না। তারের জাল আর বাঁকাচোরা ইস্পাতের পাত জড়িয়ে ফেলল সামনের দুই চাকা। কান-ফাটা শব্দ করে ফেঁসে গেল একটা টায়ার। এখনও সবুজ ভ্যানটা রয়েছে পঞ্চাশ ফুট দূরে।

'রবিন, এস!' বলতে বলতেই এক ঝটকায় কেবিনের দরজা খুলে লাফিয়ে পথে নামল বোরিস। ছুটল।

দড়ি ছেঁড়া পাগলা ষাঁড়ের মত এসে বার্টের ঘাড়ে পড়ল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। চমকে উঠে পকেটে হাত দিতে গেল ডাকাতটা, বোধহয় পিস্তল বের করার জন্যে, কিন্তু পারল না। তার আগেই দু'হাতে ধরে তাকে মাথার ওপর তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল বোরিস।

দ্রুত সামলে নিল বার্ট। গতিক সুবিধের নয় বুঝে গেছে, সোজা লঞ্চের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল সে।

ভ্যান থেকে বেরিয়ে এল রিক আর জিম, একজনের হাতে একটা রেঞ্চ, আরেকজনের হাতে টায়ার খোলার লীভার। একই সঙ্গে আক্রমণ চালাল বোরিসের ওপর।

ঝট করে বসে দু'জনের আঘাত প্রতিহত করল বোরিস, আবার সোজা হয়ে উঠে খপ করে ধরে ফেলল দুই ডাকাতের অস্ত্র ধরা দুই হাত, প্রায় একই সঙ্গে।

কব্জিতে প্রচণ্ড মোচর খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রিক আর জিম। হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র। ঘাড় ধরে জোরে দু'জনের মাথা ঠুকে দিল বোরিস। তারপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পানিতে।

রবিন বসে নেই। ভ্যানের পেছনের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মুসাআ! কিশোরও!'

'রবিন!' বস্তার ভেতর থেকে শোনা গেল কিশোরের ভোঁতা কণ্ঠ। 'জলদি বের কর আমাদেরকে!'

'রবিন! জলদি, আর পারছি না! ওফ, বাবারে!' প্রায় কেঁদে ফেলল মুসা। কি ভাবে যেন গড়িয়ে এসে তার পেটের ওপরে পড়েছে কিশোর।

ওদিকে, জিম আর রিকও বার্টের পিছু নিয়েছে। তিনজনকেই তুলে নিয়ে নাক ঘোরাল লঞ্চ। দ্রুত ছুটল কয়েকশো গজ দূরের বড় একটা মাছধরা জাহাজের দিকে।

পুলিশও পৌঁছে গেছে। বোরিসের ক্ষমতা দেখেছে ওরা, কাজেই সাবধানে

এগোচ্ছে। হাতে রিভলভার।

বোরিসের হাতের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে রিভলভার নাচাল অফিসার। 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট! খবরদার, নড়বে না! গুলি খাবে!'

'আরে, আমাকে পরে ধরতে পারবেন!' লঞ্চটার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল বোরিস, 'ওদেরকে ধরুন! পালাচ্ছে তো!'

ইতিমধ্যে কিশোর আর মুসার বস্তার বাঁধন কেটে দিয়েছে রবিন। দ্রুতহাতে বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল কিশোরকে। দু'জনে মিলে মুক্ত করল মুসাকে।

ছেলেদেরকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে অফিসারের। 'আরে, কি কাণ্ড! তোমরা বস্তার ভেতরে কি করছিলে?'

রবিনের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে একটা ছোট বস্তার বাঁধন কেটে ফেলল কিশোর। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করল একমুঠো নোট। ছুঁড়ে দিল অফিসারের দিকে। 'এই হল কাণ্ড! ব্যাংক ডাকাতি!'

কিছুই বুঝতে পারল না যেন অফিসার। হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

ভ্যান থেকে নামল কিশোর। অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল। 'জলদি করুন! নইলে পালিয়ে যাবে ডাকাতেরা! জলদি ধরুন ওদের!'

'ইয়ে, মানে তোমরা কারা!...মানে...' এখনও কিছু বুঝতে পারছে না অফিসার।

বুঝিয়ে বলতেই হল অফিসারকে। মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হল তাতে।

সতেরো

পাঁচ দিন পর, শনিবার। হেডকোয়ার্টারে বসে আলাপ আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা।

'ওই অফিসারটা একটা আহম্মক!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা। 'তাড়াতাড়ি করলে ধরতে পারত ব্যাটাদের, কিন্তু ওকে বোঝাতেই তো সময় গেল।'

'ইন্টারপোল দায়িত্ব নিয়েছে,' বলল কিশোর। 'ধরেও ফেলতে পারে।'

'কি জানি! তবে, রিকের সোনার দাঁত ভরসা। ওটাই চিনিয়ে দেবে ওকে। ধরা পড়লে ওই দাঁতের জন্যেই পড়বে।'

'আরে না-আ!' হাত নাড়ল রবিন। 'সোনার দাঁত অনেকেই বাঁধায় ওরকম। এই তো, সেদিন পিটারসন মিউজিয়মেও তো একজনের দেখলাম। একটা ছেলে...'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রবিনের মুখের দিকে, যেন তাকে আর কখনও দেখেনি। 'পিটারসন মিউজিয়মে

সোনার দাঁত!' উত্তেজনায় রক্ত জমছে তার মুখে। 'রবিন! আগে বলনি কেন? কেন বলনি আগে?'

'একটা কাব স্কাউটের মুখে সোনার দাঁত, এতে অবাক হওয়ার কি আছে?' কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন। 'বলারই বা কি আছে? ভুলেই গিয়েছিলাম...এখন কথা উঠল...'

'ইস্‌স্‌, আরও আগে যদি বলতে!' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, আছিস ওখানে? মিরো এসেছে।'

মুসা গিয়ে মিরোকে নিয়ে এল।

অবাক চোখে হেডকোয়ার্টারের জিনিসপত্র দেখল মিরো। তারপর একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'কিশোর স্যান, তোমাদেরকে বিদায় জানাতে এলাম। আগামীকালই জাপানে ফিরে যাচ্ছি আমরা।'

'এত তাড়াতাড়ি?' টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'প্রদর্শনী শেষ?'

'না, প্রদর্শনী চলবে,' বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ল মিরো। 'শুধু বাবা আর আমি ফিরে যাচ্ছি। বাবাকে বরখাস্ত করেছে কোম্পানি। আর একদিন মাত্র চাকরি আছে তার।'

আন্তরিক দুঃখিত হল তিন গোয়েন্দা।

কি যেন ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'মিরো, পিটারসন মিউজিয়মে আর মাত্র একদিন প্রদর্শনী চলবে, না?'

'হ্যাঁ। আগামীকাল চলে বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য শহরে চলে যাবে।'

'কাগজে পড়লাম, কালও চিলড্রেনস ডে।'

'হ্যাঁ। আগেরবার গণ্ডগোলের জন্যে ঠিকমত দেখতে পারেনি ছোটরা, তাই আরেক দিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'তারমানে সময় বেশি নেই হাতে। মিরো, তোমার বাবা শেষমেষ একবার সাহায্য করবেন আমাকে? বলে দেখবে?'

'সাহায্য?' ভুরু কোঁচকাল মিরো।

'আমার কথামত কাজ করবেন?'

'হয়ত করবে! গোল্ডেন বেল্ট ফিরে পেলে এখনও সম্মান রক্ষা হয়, চাকরি থাকে বাবার। বলে হয়ত রাজি করাতে পারব তাকে।'

'তাহলে চল যাই,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'গাড়ি নিয়ে এসেছ?'

'কোম্পানির গাড়ি।'

'গুড। রবিন, মুসা, তোমরা থাক। রবিন, রত্নদানোর কেসটা লিখে ফাইল করে ফেল, মিস্টার ক্রিস্টোফারকে দেখাতে হবে। মুসা, ছাপার মেশিনের একটা

রোলার ঠিকমত ঘুরছে না, দেখবে ওটা? আমি আসছি। কাল নাগাদ গোল্ডেন বেল্ট রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা আর রবিন। তাদেরকে ওই অবস্থায় রেখেই মিরোকে নিয়ে দুই সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল কিশোর।

সামলে নিতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল রবিন আর মুসার।

'রবিন,' অবশেষে বলল মুসা। 'কি করে কিনারা হবে?'

'জানি না!' দুই হাত নাড়ল রবিন, মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। কাগজ-কলম টেনে নিল।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে শেষে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল মুসা। অযথা ভেবে লাভ নেই। তারচেয়ে মেশিনটা সেরে ফেললে একটা কাজ হয়ে যায়।

শেষ বিকেলে রহস্য আরও জমাট হল। কিশোরের কাছ থেকে ফোন এল হেডকোয়ার্টারে। দুই সহকারীর জন্যে নির্দেশঃ হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সব ক'টা পথ ভাল মত পরীক্ষা করে দেখ। 'জরুরি এক' আর 'গোপন চার'-এ যেন কোন গোলমাল না থাকে। বার বার বেরিয়ে দেখ, কোনরকম অসুবিধে হয় কিনা। 'সবুজ ফটক এক', 'দুই সুড়ঙ্গ', 'সহজ তিন' আর 'লাল কুকুর চার' দিয়েও বেরোও বার বার। দেখ, ছয়টার মধ্যে কোন্ পথটা দিয়ে সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে কম সময়ে ঢোকা যায়।

মুসা কিংবা রবিন কোন প্রশ্ন করার আগেই লাইন কেটে গেল ওপাশ থেকে।

রবিনের নোট লেখা শেষ, মুসারও মেশিন সারানো হয়ে গেছে। কেন গোপন পথগুলো দিয়ে ঢুকতে-বেরোতে বলেছে কিশোর, কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। তবু দেরি না করে কাজে লেগে গেল। কিশোর যখন করতে বলেছে, নিশ্চয় কোন না কোন কারণ আছে।

গোপনপথগুলো দিয়ে বার বার ঢুকল বেরোল দুই সহকারী গোয়েন্দা। দু'জনেই একমত হল, সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে কম সময়ে ঢোকা কিংবা বেরোনো যায় 'সহজ তিন' দিয়ে।

আঠারো

রাতের খাবারের সময় হল, কিশোরের দেখা নেই। আরও এক ঘন্টা দেরি করে ফিরল সে, উত্তেজিত কিন্তু হাসি হাসি চেহারা। রবিন আর মুসা দেখে অবাক হল, সুকিমিচি কোম্পানির গাড়িতে করে নয়, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে গোয়েন্দাপ্রধান। গাড়ি থেকে মিরোকে চুপিচুপি নামতে দেখে আরও অবাক হল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

মিরোকে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল কিশোর, কেউ দেখে ফেলবে এই ভয় যেন করছে।

'এই যে, এসেছ!' বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, এত দেরি করলি কেনরে? আমরা এদিকে ভেবে মরি। দেখ, চেহারার কি ছিরি করে এসেছে! আরে, এই কিশোর, জ্যাকেটের বোতাম লাগাতেও তোর কষ্ট হয় নাকি? কোমরের কাছে লাগাস না কেন? বিচ্ছিরিভাবে ঝুলে আছে।'

মিরোকে একটা চেয়ার দেখিয়ে নিজে আরেকটাতে বসে বলল কিশোর, 'আস্তে, চাচী, আস্তে। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে কোন্‌টার জবাব দেব?'

'এই যে, বসে পড়লি তো? কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে কে জানে! হাতে-মুখে ময়লা...যা, জলদি ধুয়ে আয় ভাল করে।'

মিরোকে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এল কিশোর।

খেতে খেতে মুখ তুললেন রাশেদ চাচা। 'কিশোর, আবার কিসে জড়িয়েছ? তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও ডাকাতদের সঙ্গে মিশবে না। বস্তায় ভরে একবারই তো দিয়েছিল সাগরে ফেলে। ভাগ্যিস রবিন গিয়েছিল...খবরদার, ডাকাতির কেস আর কখনও নেবে না।'

'গেছিলাম তো রত্নদানো ধরতে, ডাকাতের পাল্লায় পড়ব তা কি আর জানি?' বসতে অসুবিধে হচ্ছে যেন কিশোরের। খালি নড়ছে, একবার এভাবে বসছে, একবার ওভাবে।

'হুঁমম!' জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না রাশেদ চাচা। ভাজা গরুর মাংসে ছুরি চালালেন, কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো মুখে ফেলে চিবাতে চিবাতে বললেন, 'তা এখন আবার কি ধরে এলে? জিন, না পরী?'

'মিরোকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম,' জাপানী কিশোরের কাঁধে হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বড় বিপদে পড়েছেন ওর বাবা। একটা বেল্ট চুরি হয়েছে, ওটার খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম।'

'গোল্ডেন বেল্টের কথা বলছ?' চিবানো থেমে গেছে রাশেদ চাচার। 'পারবে বের করতে? আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনি কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে ওটা বের করে নিয়ে গেল চোরেরা।'

মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর, কি বোঝাতে চাইল সে-ই জানে।

এরপর আর বেশি কথাবার্তা হল না। খাওয়া শেষ হল।

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আছে রবিনের মনে, কিন্তু কিশোরকে জিজ্ঞেস করার সুযোগই পেল না। কেমন যেন ঝিম মেরে বসে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। আরেকটা ব্যাপার, এই গরমের বিকেলে জ্যাকেট পরে আছে কেন সে? মেরিচাচী বলায় কোমরের কাছের বোতাম লাগিয়েছে, টান টান হয়ে আছে জায়গাটা। হঠাৎ কি করে এত চর্বি জমে গেল তার পেটে!

অন্ধকার নামতে শুরু করতেই উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'রবিন, মুসা, চল হেডকোয়ার্টারে যাই।'

ম্যাগাজিন পড়ছেন রাশেদচাচা, ডিশ-প্লেট ধুচ্ছেন চাচী। চুপচাপ বেরিয়ে এল ছেলেরা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'যা বলেছিলাম করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা আর রবিন।

'করা উচিত হয়নি,' বলল মুসা। 'রাস্তার ওপাশে কয়েকটা ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, আমাদেরকে দেখেছে। গোপন পথগুলো দেখে ফেলেছে ওরা।'

'আমাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে শুঁটকিই হয়ত পাঠিয়েছে,' রবিন বলল। 'আমারও মনে হয় কাজটা উচিত হয়নি, তুমি বললে বলেই করলাম।'

'ঠিকই করেছ,' সন্তুষ্ট মনে হল কিশোরকে। 'আমারও সময় খুব ভালই কেটেছে, পরে বলব সব। এস, এখন আমাদের কোন একটা অভিযানের কথা শোনাও মিরোকে। ও শুনতে চায়।'

আগ্রহী শ্রোতা পাওয়া গেছে, খুশি হয়েই গল্প শুরু করল রবিন।

বাইরে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। মাথার ওপরের স্কাইলাইটের ঢাকনা হাঁ করে খুলে দিয়েছে কিশোর, তারাজ্বলা কালো আকাশ চোখে পড়ছে।

ফিসফিস-করে-কথাবলা-মমির গল্প সবে মাঝামাঝি এসেছে, এই সময় নড়েচড়ে উঠল কিশোর। এক এক করে বোতাম খুলল, গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেট। শার্টের নিচের দিকটা তুলে দেখাল দুই সহকারীকে।

'প্রফেসর' বলতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু 'প্রফে' বলেই থেমে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা। দু'জনেরই চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

কিশোরের কোমরে সম্রাটের সোনার বেল্ট!

বড় বড় চারকোনা সোনার টুকরো, তাতে উজ্জ্বল পাথর বসানো। না, কোন ভুল নেই, গোল্ডেন বেল্টই পরে আছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'ভীষণ ভারি!' নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'প'রে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে।' কোমর থেকে বেল্ট খুলে টেবিলে রাখল সে।

মুখে খই ফুটল দুই সহকারীর। নানা প্রশ্ন। বেল্টটা কোথায় পেয়েছে কিশোর? পরে রয়েছে কেন? কেন কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেয়নি? কেন...

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা। খুদে কুৎসিত একটা মানুষের মুখ দেখা দিল। পরক্ষণেই ভেতরে উঠে এল মানুষটা। হাতে ইয়াবড় এক ছুরি। জ্বলন্ত চোখে ছেলেদের দিকে চেয়ে ভয়াবহ ভঙ্গিতে ছুরি নাচাল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল 'লাল কুকুর চার'-এর-দরজা। ছুরি হাতে ঢুকল আরেকজন খুদে মানুষ। খুলে গেল 'সহজ তিন', দেখা গেল আরেকটা মুখ, সেটার পেছনে

আরেকটা।

'বিচ্ছুরা,' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল এক আগন্তুক, 'এবার ভালয় ভালয় বেল্টটা দিয়ে দাও তো!'

পায়ে পায়ে চারপাশ থেকে এগিয়ে আসতে শুরু করল চার বামন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কিশোরের দেহে। ছোঁ মেরে বেল্টা তুলে নিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টেবিলে। স্কাইলাইটের ওপাশে আটকানো দড়ির সিঁড়ি টেনে নামাল। চেঁচিয়ে বলল, 'মিরো, জলদি!'

বানরের মত দাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ট্রেলারের ছাতে উঠে গেল মিরো। বেল্টটা তার হাতে দিয়ে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমরাও ওঠ!'

বিনা প্রতিবাদে ছাতে উঠে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তাদের ঠিক পর পরই উঠে পড়ল কিশোরও।

টেবিলে উঠে পড়ছে দুই বামন, একজন ইতিমধ্যেই সিঁড়ি ধরে ফেলেছে।

ট্রেলারের ছাতে আটকা পড়েছে চার কিশোর। কোনদিকে যাওয়ার পথ দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে ছুরি হাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে এক বামন।

কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে সরে যাবে, আগেই ভেবে রেখেছে যেন কিশোর। ট্রেলারের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে পুরানো একটা স্লিপার, বাচ্চাদের কোন পার্ক থেকে কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা। লোহার কয়েকটা মোটা মোটা কড়ি আড়াআড়ি পরে আছে স্লিপারের ওপর।

একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না কিশোর। নিচের দিকে পা দিয়ে উপুড় হয়ে স্লিপারে শুয়ে পড়ল। শাঁ করে কড়ির তলা দিয়ে নেমে চলে এল কাঠের গুঁড়োয় ঢাকা মাটিতে। ডেকে সঙ্গীদেরকেও নামতে বলল। কিশোরের মতই একে একে নেমে এল মিরো, রবিন, মুসা। জঞ্জালের ভেতর দিয়ে পথ করা আছে, তাতে ঢুকে পড়ল চারজনে।

স্লিপারে আড়াআড়ি করে কড়ি রাখা আছে, এটা জানে না বামনেরা। অন্ধকারে ভাল দেখতেও পেল না। তাই শুয়ে না নেমে স্লিপারে বসে পড়ল এক বামন। শাঁ করে খানিকটা নেমেই থ্যাক্ করে বাড়ি খেল কড়িতে, আটকে গেল তার শরীরে, রাতের অন্ধকার চিরে দিল তার তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'এদিক দিয়ে নয়!' চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল বামনটা। 'বেরিয়ে যাও! ঘুরে এসে ধর বিচ্ছুগুলোকে! ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে!'

ছাতে হুড়োহুড়ির শব্দ হল। স্কাইলাইট দিয়ে টপাটপ আবার ট্রেলারের ভেতরে লাফিয়ে নামল বামনগুলো। সবচেয়ে সহজপথ 'সহজ তিন' দিয়ে বেরোবে।

'ওদের ধরতেই হবে!' চেঁচিয়ে বলল আবার কড়িতে আটকাপড়া বামনটা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার স্লিপার বেয়ে ছাতে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে। 'বেল্টটা নিয়ে গেছে বিচ্ছুগুলো!'

অনেকগুলো কাঠের গুঁড়িতে ঘেরা ছোট্ট একটুখানি খোলা অন্ধকার জায়গায় গাদাগাদি করে বসেছে ছেলেরা।

তীক্ষ্ণ হুইসেল বেজে উঠল হঠাৎ। সে-রাতে দ্বিতীয়বার চমকাল রবিন আর মুসা। পুলিশের হুইসেল। মাথা তুলে দেখল, প্রায় আধডজন ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে ইয়ার্ডের আঙিনা ধরে।

মিনিটখানেক হুটোপুটির শব্দ হল, পুলিশের উত্তেজিত কণ্ঠ আর বামনদের তীক্ষ্ণ চেঁচামেচি শোনা গেল। ইতিমধ্যে তিন সঙ্গীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিশোর।

চার বামনকেই ধরে ফেলেছে পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে মিস্টার টোহা মুচামারুও রয়েছেন।

বন্দীদেরকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলা হল।

বাবার কাছে এসে দাঁড়াল মেরো। 'দেখলে তো, বাবা, কিশোর স্যানের বুদ্ধি? তুমি তো পাত্তাই দিচ্ছিলে না, অথচ গোল্ডেন বেল্ট খুঁজে বের করল সে, অপরাধীদের ধরিয়েও দিল।'

'আয়্যাম সরি, কিশোর,' লজ্জিত কণ্ঠে বললেন মুচামারু। 'তোমাদেরকে…'

'আরে না না, কি যে বলেন, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর।

'যা-ই বল, কিশোর, অসাধ্য সাধন করেছ তোমরা। পুলিশই হাল ছেড়ে দিয়েছিল…মিরোর কথা না শুনলে যে কি ভুল করতাম! এক ভুল তো করেছিলাম তোমাদেরকে মিউজিয়ম থেকে বের করে দিয়ে!'

'এই যে, বাবা, বেল্টটা নাও,' মুচামারুর হাতে গোল্ডেন বেল্ট তুলে দিল মিরো।

তিন গোয়েন্দাকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে মিরোকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন মিস্টার মুচামারু।

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের চীফ ইয়ান ফ্লেচার আরও কিছুক্ষণ দেরি করলেন, কিছু প্রশ্ন করলেন কিশোরকে। তারপর তিনিও গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। চলে গেল পুলিশের গাড়ি।

'কিশোর!' এইবার ধরল মুসা। 'কি করে এসব ঘটল কিছুই তো বুঝতে পারছি না! ওই বামনগুলোই তো রক্তদানো সেজেছিল, না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ইবলিস একেকটা।'

'গোল্ডেন বেল্ট কি ওরাই চুরি করেছিল?'

'তো আর কারা? কাব স্কাউট সেজে ঢুকেছিল মিউজিয়মে। রবিন সোনার দাঁতটার কথা না বললে কিছুই বুঝতে পারতাম না। গোল্ডেন বেল্ট নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত ব্যাটারা।'

উনিশ

অনেকদিন পর আবার মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে আছেন বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক। আগের মতই রয়েছে ঘরের পরিবেশ, কোন কিছু বদলায়নি এতটুকু।

মোটাসোটা ফাইলটা পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।

ফাইলে ডুবে গেলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বললেন, 'চমৎকার! আবার কৃতিত্ব দেখালে তোমরা।'

লজ্জিত হাসি হাসল রবিন আর মুসা। কিশোরের মুখ লালচে হয়ে উঠল।

'বামনরাই তাহলে রক্তদানো সেজেছিল,' আপনমনেই বললেন পরিচালক। 'ওদের সঙ্গে ভাব করেছে বব, এটা জানার পর ভারনিয়ার চেহারা কেমন হয়েছিল দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন,' বলল কিশোর। 'বব অবশ্য জানত না, তাকেও ফাঁকি দিয়েছে বর্ট। ব্যাংক ডাকাতির ব্যাপারটা জানলে বব রাজি হত না কিছুতেই। খুব লজ্জা পেয়েছে সে, হাতে-পায়ে ধরে মাপ চেয়েছে ফুফুর কাছে। মাপ করে দিয়েছেন মিস ভারনিয়া। তিনি ঠিক করেছেন, বাড়ি বেচে দিয়ে সাগরের পারে কোথাও একটা ছোট কটেজ কিনবেন। পুরানো বাড়িতে আর থাকবেন না।'

'ভালই করেছে,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'আচ্ছা, এবার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও তো! নোটে লেখনি। গোল্ডেন বেল্ট চুরি করল কিভাবে? কোথায় লুকিয়ে রাখল? বামনরা কি করে জানল তোমার কাছে বেল্টটা আছে?'

লম্বা শ্বাস নিল কিশোর। 'পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম প্রথমে। রবিন সোনার দাঁতটার কথা বলার পর বুঝলাম সব কিছু।'

'শুধু একটা সোনার দাঁত!' ভুরু সামান্য কুঁচকে গেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের। 'শার্লক হোমসও পারত কিনা সন্দেহ!'

'সহজ ব্যাপার তো, স্যার,' বলল কিশোর। 'ছোট ছেলেদের দাঁত একবার পড়লে দ্বিতীয়বার গজায়, বাঁধানো সোনার দাঁত লাগানর দরকার পড়ে না। তারমানে মিউজিয়মের "বাচ্চা ছেলেটা" আসলে বয়স্ক মানুষ। আর ওই আকারের বয়স্ক মানুষ একমাত্র বামনই হতে পারে।'

'ঠিকই অনুমান করেছিলে।'

'যখনই বুঝে গেলাম, বামনরা গিয়েছিল কাব স্কাউট সেজে, দুয়ে দুয়ে চার যোগ করে নিতে অসুবিধে হল না। হলিউডে ওদের বাস, সিনেমা টেলিভিশনে ওরা অভিনয় করে, দড়াবাজিতে ওস্তাদ, চুরিচামারিতেও পিছিয়ে নেই ওদের অনেকেই। পিটারসন মিউজিয়মে অলঙ্কারের প্রদর্শনী শুরু হল, চোরডাকাতের

রক্তদানো

ভিড় জমল শহরে। রক্ত-চুরির ফন্দি করল ইঅং। বামনদেরকে দলে টানল। সুন্দর প্ল্যান করেছে সে। এক মহিলা অপরাধীকে ডেন মাদার সাজিয়ে বামনদের কাব স্কাউটের পোশাক পরিয়ে পাঠানো হল মিউজিয়মে। টোড মার্চকে ভাড়া করা হল মিউজিয়মের ভেতরে বিশেষ একটা সময়ে সামান্য অভিনয় করার জন্যে। অভিনয় শুরু করল মার্চ, লোকের চোখ তার দিকে আকৃষ্ট হল, এই সুযোগে ব্যালকনির সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেলেন চার বামন। বাইরে থেকে কানেকশন কেটে আলো নিবিয়ে দিল বার্ট, মেকানিক সেজে গিয়েছিল সে-ই। দ্রুত ব্যালকনিতে উঠে গেল চার বামন। ওদিকে অন্ধকার হলঘরে তখন নরক গুলজার শুরু হয়ে গেছে।'

'তারপর?' কিশোরের দিকে ঝুঁকে এসেছে মুসা।

'বামনরা সঙ্গে করে দড়ি নিয়েছিল,' বলল কিশোর। 'তিনজন দড়ি ধরে রইল ওপর থেকে, চতুর্থজন দড়ি ধরে নেমে এল বেল্টের বাক্সের ওপর। বাক্স ভেঙে বেল্টটা বের করে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। দড়ি ধরে টেনে আবার তাকে ব্যালকনিতে তুলে নিল তার সঙ্গীরা।'

'হুঁম্‌ম্‌!' আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'ওরা দক্ষ দড়াবাজিকর, আমার ধারণা, কাজটা করতে তিরিশ সেকেণ্ডও লাগেনি। এখন বুঝতে পারছি, কেন নেকলেস চুরি না করে বেল্ট চুরি করেছে ওরা। নেকলেসের বাক্সের ওপর নামার কোন উপায় ছিল না।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'বেল্টটা বাক্স থেকে সরাল বটে, কিন্তু জানে এত ভারি একটা জিনিস তখন হল থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই লুকিয়ে ফেলল।'

'হলের ভেতরেই লুকিয়েছে? কিন্তু পুরো মিউজিয়ম তো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, পাওয়া যায়নি বেল্ট।'

'আসল জায়গাতেই খোঁজেনি ওরা। খুব মাথা খাটিয়ে লুকানর জায়গা ঠিক করেছে বামনরা। বেল্ট লুকিয়ে ফেলল, পরে সুযোগমত একদিন এসে নিয়ে যাবে বলে। সেদিন রাতে যদি ব্যাটাদের না ধরা যেত, পরের দিনই চিলড্রেনস ডে-তে আবার কাব স্কাউট সেজে গিয়ে বেল্ট বের করে নিয়ে যেত ওরা, কোন একটা সুযোগ সৃষ্টি করে।'

'হুঁম্‌ম্‌!' মাথা দোলালেন পরিচালক।

'ব্যাংক ডাকাতি হয়ে গেল, বার্টকে ধরতে পারল না পুলিশ। চার বামনকেও ধরতে পারল না। বোর্ডিং হাউসে খোঁজখবর করতে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু মুখে তালা এঁটেছিল বামনের গোষ্ঠী। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, ফাঁদ পেতে ওদেরকে ধরতে হবে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'অ, এই ব্যাপার!' মুখ গোমড়া করে ফেলেছে রবিন। 'আমাকে আর মুসাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলে!'

'রাগ কোরো না, রবিন, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পথগুলো বামনদেরকে দেখানর দরকার ছিল, নইলে ঢুকত কি করে ওরা?' পরিচালকের দিকে ফিরল কিশোর। 'হ্যাঁ, রবিন সোনার দাঁতটার উল্লেখ করতেই সব বুঝে গেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিউজিয়মে। মিস্টার মুচামারুকে সব খুলে বললাম, তারপর দু'জনে মিলে খুঁজে বের করলাম সোনার বেল্টটা...'

'কোন্ জায়গা থেকে?' কথার মাঝে প্রশ্ন করল মুসা।

'আসছি সে-কথায়। বেল্টটা কোমরে পরে চলে গেলাম বামনদের বোর্ডিং হাউসে। রক্তদানো সেজেছিল যে চারজন, তাদের নেতাকে ডেকে আনতে অসুবিধে হল না। গোল্ডেন বেল্ট আমি পেয়ে গেছি, সেকথা বললাম তাকে। জ্যাকেট তুলে এক পলক দেখলামও জিনিসটা। বললাম, চল্লিশ হাজার ডলার নগদ দিলে বেল্টটা তাকে দিয়ে দিতে পারি। টাকাটা কোথায় হাতবদল করতে হবে, সেকথাও বললাম। ইয়ার্ডের ঠিকানা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বোর্ডিং হাউস থেকে।'

'তারমানে,' পরিচালক বললেন, 'তুমি ধরেই নিয়েছিলে, ওরা তোমার কাছ থেকে বেল্টটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেই।'

'হ্যাঁ। ওরা যদি টাকা নিয়েও আসত, তাহলেও কেস ওদের বিরুদ্ধে চলে যেত। এত টাকা ওরা পেল কোথায়, জানতে চাইত পুলিশ। বেল্ট চুরির কেসে না জড়ালেও তখন ডাকাতির কেসে ফেঁসে যেত ওরা।'

'রাস্তার পাশের ছেলেগুলো তাহলে ছেলে নয়!' বিড়বিড় করল রবিন। 'বামনরাই ছেলে সেজে আমার আর মুসার ওপর চোখ রেখেছিল।' বিরক্তি ঝরল তার কণ্ঠে। 'ওদেরকে জানাতে চেয়েছিলে, কোন্ পথে হেডকোয়ার্টারে ঢোকা সহজ হবে।'

'হ্যাঁ,' চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'মিস্টার মুচামারুকে সব বুঝিয়ে বলেছি, কি করে কি করতে হবে। ঠিক সময়ে দলবল নিয়ে এসে ট্রেলারের আশেপাশে লুকিয়ে রইলেন চীফ ইয়ান ফ্লেচার। সঙ্গে মিস্টার মুচামারুও এলেন। বামনরা আক্রমণ করল আমাদের, ধরা পড়ল।

'একটা কথা বারবার এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি,' হাসলেন চিত্র-পরিচালক। 'আমাদেরকে টেনশনে রাখার জন্যেই বুঝি? কোথায় লুকানো হয়েছিল গোল্ডেন বেল্ট?'

'যেখানে কেউ খুঁজবে না,' কিশোরও হাসল। 'মিস ভারনিয়ার বাড়িতে জানালায় উঠে ভয় দেখিয়েছিল রক্তদানো, ওরফে বামনেরা। কি করে? হিউম্যান-ল্যাডার, স্যার। একজনের কাঁধে আরেকজন উঠে একটা জ্যান্ত মই বানিয়ে ফেলত ওরা সহজেই...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুললেন পরিচালক। 'বোধহয় বুঝতে পারছি, কোথায় লুকানো ছিল গোল্ডেন বেল্ট।' ফাইলের পাতা উল্টে গেলেন দ্রুত হাতে। একটা

জায়গায় এসে থামলেন, 'হ্যাঁ, এই যে, পেয়েছি। স্পষ্ট করে লিখেছে সব রবিন। মিউজিয়মের ছাত গম্বুজ আকৃতির, তারমানে দেয়াল গোল। দেয়ালের মাথায় খাঁজ, গম্বুজটা তার ওপর বসানো, অনেকটা ঢাকনার মত করে। ছবি ঝোলানর জন্যে ওরকম খাঁজ রাখা হয়েছে। ওই খাঁজেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গোল্ডেন বেল্ট।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্যার,' হাসছে কিশোর। 'কিন্তু মই লাগিয়ে উঠে দেখলাম, পিঠ-বাঁকা খাঁজ, ওখানে বেল্ট রাখার উপায় নেই, পড়ে যাবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল চিত্র-পরিচালকের। সামান্য হাঁ হয়ে গেছে মুখ। শব্দ করে মুখ দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বের করে দিলেন। 'তাহলে কোথায় ছিল বেল্টটা?'

'খাঁজে চ্যাপ্টা জায়গা নেই,' বলল কিশোর। 'বোকা বনে গেলাম। কোথায় আছে গোল্ডেন বেল্ট, কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। ভাবছি, এই সময় গালে এসে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ। চকিতে বুঝে গেলাম...'

'এয়ার কণ্ডিশনিং!' স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে বসলেন পরিচালক, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, স্যার, এয়ার কণ্ডিশনিং। বাতাস চলাচলের জন্যে সরু যে চ্যানেল করা হয়েছে, তারই একটার মুখের জালি খুলে নিয়েছে চোর, কালো সুতো দিয়ে জালির সঙ্গে বেল্টটা বেঁধেছে। বেল্ট সুড়ঙ্গের ভেতরে ঝুলিয়ে দিয়ে আবার জায়গামত লাগিয়ে দিয়েছে জালিটা। ওখানে খুঁজতে যায়নি কেউ, কারণ মই ছাড়া ওখানে পৌঁছানো অসম্ভব। হিউম্যান-ল্যাডার বানিয়ে বামনেরা এই কাজ করেছে, কল্পনাও করতে পারেনি কেউ।'

'এক্সেলেন্ট, মাই বয়েজ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচালকের চেহারা। 'ভারনিয়ার কাছে আমার মুখ রেখেছ তোমরা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আমরা তাহলে আজ আসি, স্যার,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন আর মুসাও উঠল।

'আরে বস, বস,' হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আইসক্রীমের অর্ডার দিচ্ছি।' এত সুন্দর একটা কাহিনী নিয়ে এলে, আর খালি মুখে চলে যাবে?'

হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার। বন্ধুদের আগেই ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে।

'রত্নদানোর এই ছবিটায় শিগগিরই হাত দিতে চাই,' বললেন পরিচালক। 'নাম কি রাখা যায়, বলত? ফোর লিট্‌ল্ নোমস হলে কেমন হয়?'

'চারটে খুদে রত্নদানো,' বিড়বিড় করল কিশোর বাংলায়। ইংরেজিতে বল 'লিটল নয়, স্যার, ডেভিল রাখুন। ফোর ডেভিল নোমস।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ,' একমত হলেন পরিচালক।

– ০ –